বিশেষ সংখ্যা
মে ২০০৬ ● পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ ফেলুদা-কাহিনি (পুনর্মুদ্রণ)

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

সত্যজিৎ রায়

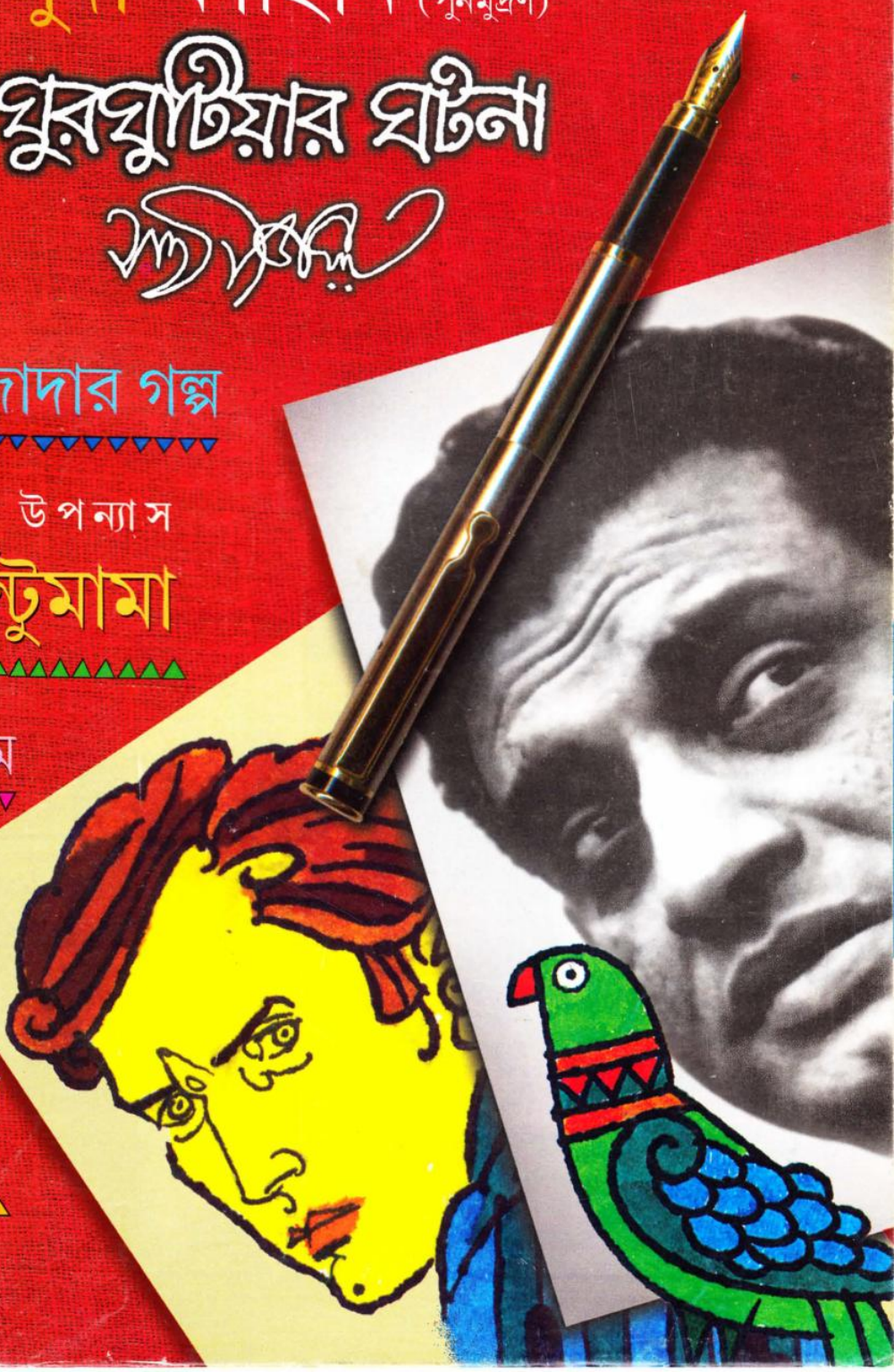

হাফ ডজন মজাদার গল্প

আস্ত একটি রহস্য উপন্যাস

ভেনিসে পিন্টুমামা

ব্যবসায়ী বেকহ্যাম

অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

রাপ্পা রায়ের কাণ্ড

(পঞ্চম কিস্তি)

সম্মোহনের সাহায্যে ব্যথাহীন অপারেশন

প্রতিদিন এক ঘন্টাই যথেষ্ট।

6 লাখেরও বেশি মানুষ লাভবান হয়েছেন।

আর আপনি ?

K.V.R. B.Com.,B.L., (Director)

শুধু বাংলা জানলেই চলবে

ইংরেজি

শিখুন

সহজেই ইংরেজি বলুন

আপনি আপনার ঘরে বসে অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই প্রতিদিন ১ ঘন্টা নিজে নিজে শিখলেই যথেষ্ট। আপনি সহজেই ইংরেজি শিখে নিতে পারবেন। আমাদের কোর্স বিশেষরূপে সোজা উদাহরণ সহযোগে সহজ ভাবে তৈরি। এই জন্য নিঃসন্দেহে আপনি ইংরেজিতে সহজেই কথা বলতে পারবেন। এই কোর্সের বর্তমান খরচ **500** টাকা। নীচের কুপন পূরণ করে আমাদের কাছে পাঠান। আপনার পোস্টম্যানের কাছে টাকা দিয়ে কোর্স নিয়ে নিন। এর পরে আর একটি কোর্স আছে যা চার মাসের কোর্স। এর খরচ অনেক কম, নামমাত্র। ইচ্ছে হলে এই কোর্স নিতে পারেন তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

---

6 লাখেরও বেশি মানুষের শেখা ইংরেজি কোর্স।

এক দিনের ইংরেজি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন কে.ভি.আর. (পুরস্কারবিজয়ী)

এই কুপন পূরণ করে পাঠান

3680

SINCE 1990

KVR INSTITUTE
AWARD WINNER

বিনামূল্যে
১০০ টাকা মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স
(সহজ ইংরেজিতে)

New No.203(BEN), Habibullah Road, T.Nagar, Chennai - 600 017.

আমাকে কে.ভি.আর. (1 মাসের) ইংরেজি কোর্স এবং মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ডাকে পাঠান। আমি পোস্টম্যানকে **500/-** টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব।

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন।

Name: .....

Address: .....

.....

.....Pin Code: | | | | | | |

* SERVICE TAX INCLUDED

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৪১৩ মে ২০০৬

বিশেষ সংখ্যা

সম্পূর্ণ ফেলুদা কাহিনি ৬

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা (পুনর্মুদ্রিত)
সত্যজিৎ রায়

কালীকিঙ্কর মজুমদারের আমন্ত্রণে নদিয়ার ঘুরঘুটিয়া গ্রামে পৌঁছে গেল ফেলুদা ও তোপসে। কালীকিঙ্করবাবুর পোষা টিয়াপাখি পরিষ্কার উচ্চারণে বলে 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।' কালীকিঙ্করবাবু বললেন যে, এই কথাগুলোর মধ্যে নাকি তাঁর সিন্দুক খোলার সংকেত আছে। খুঁজে বের করার জন্য ফেলুদাকে বারো ঘণ্টা সময় দিলেন।
কী হল তারপর?

আস্ত একটি রহস্য উপন্যাস

ভেনিসে পিন্টুমামা ৩২

ঋতা বসু

পিন্টুমামা গল্প বলছিলেন ঝন্টে আর তুলিকে। ইতালির ভেনিসে পিন্টুমামা জড়িয়ে পড়ছিলেন আশ্চর্য সব ঘটনার মধ্যে। হোটেলে বিড়াল 'মাসি'র মৃত্যু হল রহস্যজনকভাবে। মার্কো আর কাতিয়ার পুতুল চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেয় বোতলের দুধ। পুতুলটা কি জীবন্ত? দানিশা নাকি ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্রের অপব্যবহার করে ভয়ংকর সব কাণ্ড করতে পারে। প্রেতসিদ্ধের আস্তানায় গিয়ে অদ্ভুত সব ঘটনার মুখোমুখি হলেন পিন্টুমামা। দানিশাকে কি কব্জা করতে পারলেন তিনি?

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪
পাঠকের পাতা ৫
ক্যাম্পাস ২৫
কুইজ ৭৭
বিচিত্র পৃথিবী ৮২
বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৯১
অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৯২
হাসছি দ্যাখো ৯২
অর্থ শেখো, শব্দসন্ধান ৯৩

ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স:
রাপ্পা রায়ের কাণ্ড
গল্প ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫

প্রচ্ছদ: সমীর সরকার

খেলাধুলো

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০০ জনের মধ্যে ৯৬ পরমা সেন
সোনা জয়ের স্বপ্নে পিঙ্কি ৯৭ চন্দন রুদ্র
ফ্রিস্টাইল ৯৮ চন্দন রুদ্র

হাফ ডজন গল্প

ছেলেধরাদের মুখোমুখি ১৬ অশোক বসু
বান্টির বন্ধুরা ২৬ অনুপ ঘোষাল
সত্যি হিরো ২৯ সুকুমার রুজ
হারানো হিরের আংটি ৭৮ দেবব্রত পাল
গল্পবলিয়ে ভুলুমামা ৮৩ সুদীপ দে
ডাকাতের চিঠি ৮৭ রজত ঘোষ

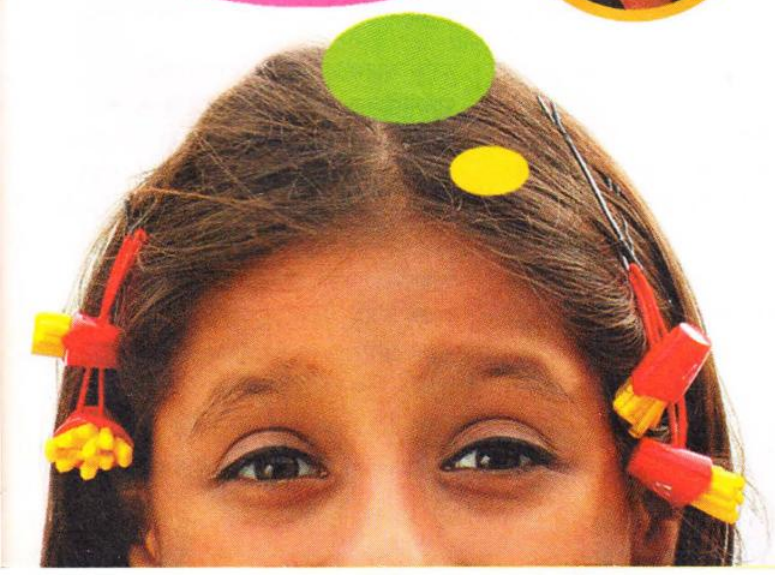

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর ২ টাকা ৫০ পয়সা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

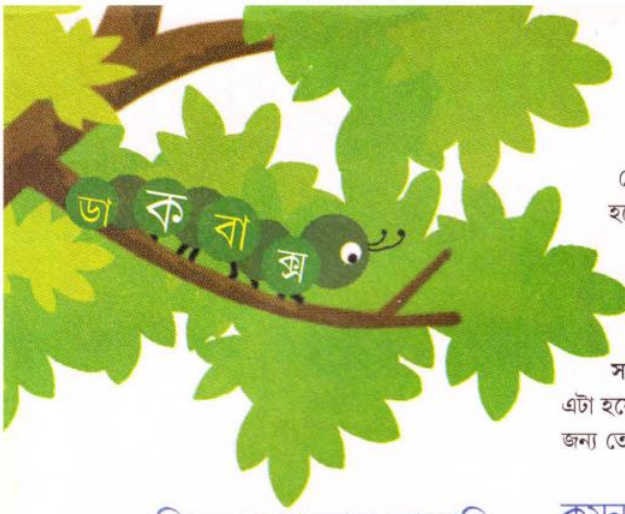

এপ্রিল সংখ্যা ভাল লাগেনি

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। এপ্রিল মাসের আনন্দমেলা মোটেও ভাল লাগেনি। 'রজনীবাবু ভাল আছেন' গল্পটি নিম্নমানের। 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি', 'নানারঙের রামধনু', 'রিপ্পির আজব কিন্তু সত্যি' বিভাগগুলো ছাড়া অন্য বিভাগগুলো তেমন আকর্ষক নয়। 'ওলটপালট' বিভাগটি আবার ফিরিয়ে আনলে ভাল হয়। মার্চ সংখ্যায় ভূতের গল্পগুলো খুব ভাল লেগেছে। এই ধরনের গল্পসংখ্যা আরও চাই।

সুমন চট্টোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি, বাঁকুড়া জিলা স্কুল

গল্পে ভুল

মার্চ মাসের 'আনন্দমেলা'য় ভূতের গল্পগুলো পড়ে ভাল লাগল। তবে অশোক বসুর লেখা 'চৌধুরীবাড়ির অয়েল পেন্টিং' গল্পটিতে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গের লোকটিকে প্রথমে 'ব্রিজমোহন' বলা হয়েছে। কিন্তু ওই গল্পের অন্য জায়গায় 'ব্রজমোহন' বলা হয়েছে।

কাশ্মীরা দাস
সাঁতরাগাছি, হাওড়া

সম্পাদকীয় উত্তর: ছাপার ভুলের জন্যই এটা হয়েছে। আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

কমনওয়েল্থ তারকারা উপেক্ষিত কেন?

এপ্রিল মাসের 'আনন্দমেলা' পড়ে অবাক হলাম। সদ্য শেষ হওয়া কমনওয়েল্থ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে কোনও লেখা বা তাঁদের পদকপ্রাপ্তির হিসেব চোখে পড়ল না। একজন ভাল ক্রিকেটার বা ফুটবলারের চেয়ে তাঁরাও তো কোনও অংশে কম যান না। তা হলে তাঁদের প্রতি এই অবহেলা কেন? আশা করি, আগামী কোনও সংখ্যায় এই বিষয়ে কিছু লেখা ছাপা হবে।

শুভদীপ লায়েক
ইন্দপুর, বাঁকুড়া

অস্কারজয়ী টম অ্যান্ড জেরি

মার্চ সংখ্যায় 'আনন্দমেলা'য় টম অ্যান্ড জেরি সম্পর্কে লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। অস্কারজয়ী টম অ্যান্ড জেরি সম্পর্কে ইন্টারনেটে সার্চ করে কোনও তথ্য পাইনি। এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি বিশদ জানতে চাই। ইন্টারনেটে কোন ওয়েবসাইটে খোঁজ করব, দয়া করে জানাবেন।

বাবু বন্দ্যোপাধ্যায়
ই-মেলের মাধ্যমে

প্রতিবেদকের উত্তর: এই বিষয়ে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। টম অ্যান্ড জেরির অস্কার মনোনয়নের বিষয়ে বিশদ জানতে http//www.tomandjerryonline.com/oscars.cfm,http//en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Animated_Short_Film, এই ওয়েবসাইট দু'টি দেখতে পার।

মজাদার গল্প আরও চাই

এপ্রিল সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় প্রচেত গুপ্তর বড়গল্প 'রজনীবাবু ভাল আছেন' পড়ে খুব ভাল লেগেছে। এই রকম মজাদার গল্প ভবিষ্যতে আরও বেশি করে আনন্দমেলায় দেখতে চাই।

নির্ঝর দাশগুপ্ত
ট্যাংরা, কলকাতা

ভূতের গল্প ভাল

মার্চ সংখ্যায় ভূতের গল্পগুলো পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। এপ্রিল সংখ্যায় 'ডাকবাক্স' পড়ে জানতে পারলাম যে, ভূতের গল্প অনেকের ভাল লাগেনি। আমার দাবি, প্রতি সংখ্যায় অন্তত দু'টি করে ভূতের গল্প ছাপা হোক। আর-একটা অনুরোধ, পাঠকের পাতায় প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ করার বয়ঃসীমা অষ্টম শ্রেণি থেকে বাড়িয়ে দশম শ্রেণি করে দেওয়া হোক। আশা করি, ফেব্রুয়ারি সংখ্যার মতো জোক্স সংখ্যা আগামী দিনে আবার দেখতে পাব।

কৃতী ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, বারাসাত কালীকৃষ্ণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

চাই হ্যারি পটারের কমিক্স

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। আনন্দমেলায় অ্যাডভেঞ্চার সংক্রান্ত কয়েকটি লেখা ছাপলে ভাল লাগবে। এ ছাড়া হাসির গল্প, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে লেখা থাকলে ভাল হয়। হ্যারি পটারকে নিয়ে কমিক্স করলে কেমন হয়? প্রতি সংখ্যায় নতুন ধরনের লেখা ছাপলে আমাদের সবারই খুব ভাল লাগবে।

অতনু দলুই
পঞ্চম শ্রেণি, বেহালা আর্য বিদ্যামন্দির

'আমার জানা সেরা জোক' প্রতিযোগিতার ফলাফল।

১

এক মন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। মঞ্চে উঠে বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পর কোনও এক প্রসঙ্গে হঠাৎই জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি করে বলুন তো, আমার রাজ্যে কারা অনাহারে রয়েছেন? যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা উঠে দাঁড়ান।"
সবাই বসে। কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছেন না। এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রীমশাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রেগেও গেলেন বেশ। তারপর কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, "সে কী? আপনি অনাহারে রয়েছেন?"
ভদ্রলোক শান্ত গলায় বললেন, "না স্যার, আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন, খারাপ লাগল। তাই আপনার পাশে এসে দাঁড়ালাম।"

প্রিয়ঞ্জনা দাশগুপ্ত
ষষ্ঠ শ্রেণি
সেন্ট জন্‌স ডায়োসেশন গার্লস এইচ এস স্কুল, কলকাতা

২

তিন বন্ধু একদিন পার্কে বসে গল্প করছিল। নানারকম গল্প। প্রত্যেকে নিজের জীবনের অদ্ভুত সব গল্পের কথা বলছিল। এক সময় তারা আলোচনা করতে আরম্ভ করল কে কত গরম জিনিস খেতে পারে! প্রথম বন্ধুটি বলল, "আমি খুব গরম চা খেতে পারি। কেটলি থেকে ঢেলেই একেবারে চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নিই।"
দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল, "এ আর এমন কী ব্যাপার! তুই তো ঠান্ডা চা-ই খাস। আমি চা খাই যখন উনুনে চা ফুটতে থাকে, তখন মুখে কেটলির নল লাগিয়ে।"
তৃতীয় বন্ধু বলল, "আমি করি কী, মুখের মধ্যে চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ নিয়ে উনুনের উপর গিয়ে বসি।"

অনন্যা চক্রবর্তী
সপ্তম শ্রেণি
গুপ্তিপাড়া গার্লস হাইস্কুল, হুগলি

৩

আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ চলছিল। কোন দেশ আগে চাঁদে অভিযাত্রী পাঠাবে? জানা গেল, রাশিয়া চাঁদে অভিযাত্রী পাঠিয়ে দিয়েছে, তারা প্রতিদিন খবরও পাঠাচ্ছে। কিন্তু চাঁদে তো কলম ব্যবহার করা যায় না! রাশিয়া কি নতুন কোনও কলম আবিষ্কার করেছে, যা দিয়ে চাঁদে লেখা সম্ভব! অনেক মাথা খাটিয়ে একজন মার্কিন বিজ্ঞানী একটি কলম আবিষ্কার করলেন, যা দিয়ে চাঁদে লেখা সম্ভব। কিন্তু রাশিয়া কী কলম ব্যবহার করছে, তা জানতেই হবে। কিছুদিন পর জানা গেল, রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা পেনসিল ব্যবহার করছে।

তনুশ্রী সরকার
পঞ্চম শ্রেণি
বৈদ্যবাটি চারুশীলা বোস বালিকা বিদ্যালয়

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

গরমের ছুটি মানেই আনন্দ আর হুটোপাটি। তাই দশটি বাক্যে লিখে পাঠাও 'ছুটিতে ছুটোছুটি'। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে ২০ মে তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যয়িত করিয়ে দিও। সেরা কয়েকটা লেখা আমরা জুন সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।
ঠিকানা: **পাঠকের পাতা**
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

এ ছাড়া যাদের জোক ভাল হয়েছে

এক মানসিক চিকিৎসালয়ে একজন মানসিক রোগী অপর এক রোগীকে জলে ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় সেখানকার চিকিৎসকরা খুবই আনন্দিত হয়ে বললেন, "তোমার মধ্যে মানুষকে উদ্ধার করার যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি ভাল হয়ে গিয়েছে। তো, জল থেকে তোলার পর তুমি কী করলে? "
মানসিক রোগীটি খুব বিনীতভাবে বলল, "আর কী করব? দেখলাম, খুব ভিজে গিয়েছে, যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তাই গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলাম!"

দিবাকর ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণি
রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

সকলে মিলে চাকরি করবেন বলে এসেছেন। মা, বাবা, ছেলে। যাঁর কোম্পানি, তিনি বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার যোগ্যতা?"
বাবার উত্তর, "এফ এস সি, স্যার।"
কর্মদাতা বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল। আপনার স্ত্রী ও ছেলের যোগ্যতা কী?"
"আজ্ঞে, আমার স্ত্রী এম এস সি। আমার ছেলে বি এস সি," উত্তর দিলেন বাবা।
কর্মদাতা বললেন, "বাঃ, বেশ শিক্ষিত পরিবার তো!"
বাবা বললেন, "আসলে আমি এফ এস সি, তার মানে, ফাদার অফ সেভেন চিলড্রেন। স্ত্রী এম এস সি। অর্থাৎ মাদার অফ সেভেন চিলড্রেন। ছেলে বি এস সি। মানে, ব্রাদার অফ সিক্স চিলড্রেন।

সেমন্তী ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি
কিউ এম এস গার্লস স্কুল, কলকাতা

সম্পূর্ণ ফেলুদা-কাহিনি

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

সত্যজিৎ রায়

গ্রাম-ঘুরঘুটিয়া
পোঃ-পলাশী
জেলা-নদীয়া
৩রা নভেম্বর ১৯৭৪

শ্রী প্রদোষচন্দ্র মিত্র মহাশয়
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই। সেটি আপনি আসিলে জানিতে পারিবেন। আপনি যদি তিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পত্র মারফত জানাইলে বাধিত হইব।

ঘুরঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশী স্টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছ'টা এগারো মিনিটে পলাশী পৌঁছায়। স্টেশনে আমার গাড়ি থাকিবে। আপনি রাত্রে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটায় একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন।

ইতি আশীর্বাদক
শ্রীকালীকিঙ্কর মজুমদার

চিঠিটা পড়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, 'পলাশী মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশী?'

'আর ক'টা পলাশী আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?' বলল ফেলুদা। 'তবে তুই যদি ভাবিস যে সেখানে এখনও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তা হলে খুব ভুল করবি। কিস্যু নেই। এমন কী সিরাজদ্দৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশীর নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।'

'তুমি কি যাবে?'

ফেলুদা চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'বুড়ো মানুষ ডাকছে এভাবে!—তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা জানারও একটা কৌতূহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পাড়াগাঁয়ে শীতকালের সকাল-সন্ধেতে মাঠের উপর কেমন ধোঁয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর গুঁড়ি আর মাথার উপরটা খালি দেখা যায়। আর সন্ধেটা নামে ঝপ্ করে, আর তারপরেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আর—নাঃ, এ সব কতকাল দেখিনি। —তোপ্‌সে, দে তো একটা পোস্টকার্ড।'

চিঠি পৌঁছতে তিন-চার দিন লেগে যেতে পারে হিসেব করেই ফেলুদা যাবার তারিখটা জানিয়েছিল কালীকিঙ্কর মজুমদারকে। আমরা সেই অনুযায়ী ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে পলাশী পৌঁছলাম বারোই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। ট্রেনের কামরা থেকেই ধান ক্ষেতের উপর ঝপ্ করে সন্ধে নামা দেখছি। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বাতিটাতি জ্বলে গেছে, যদিও আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। কালেক্টরবাবুর কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যে গাড়িটা চোখে পড়ল সেটাই যে মজুমদার মশাইয়ের গাড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম গাড়ি আমি কখনও দেখিনি; ফেলুদা বলল ছেলেবেলায় এক-আধটা দেখে থাকতে পারে, তবে নামটা শোনা এটুকু বলতে পারে। কাপড়ের হুডওয়ালা, অ্যাম্বাসাডরের চেয়ে দেড়া লম্বা আমেরিকান গাড়ি, নাম হাপমোবিল। গায়ের গাঢ় লাল রং এখানে ওখানে চটে গেছে, হুডের কাপড়ে তিন জায়গায় তাপ্পি, তাও কেন জানি গাড়িটাকে দেখলে বেশ সমীহ হয়।

এমন গাড়ির সঙ্গে উর্দিপরা ড্রাইভার থাকলে মানাত ভাল; যিনি রয়েছেন তিনি পরে আছেন সাধারণ ধুতি আর সাদা শার্ট। তিনি গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মজুমদার বাড়িতে আপনারা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা, 'ঘুরঘুটিয়া।'

'আসুন।'

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলেন, আমরা চল্লিশ বছরের পুরনো গাড়ির ভিতর ঢুকে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। ড্রাইভার হ্যান্ডল মেরে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরঘুটিয়ার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

রাস্তা ভাল নয়, গাড়ির স্প্রিংও

পুরনো, তাই আরাম বেশিক্ষণ টিকল না। তবুও, পলাশীর বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি গ্রামের খোলা রাস্তায় পড়তেই চোখ আর মন এক সঙ্গে জুড়িয়ে গেল। ফেলুদা ঠিকই বলেছিল; ধানে ভরা ক্ষেতের ওপরে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আর তারই আশেপাশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মাটি থেকে আট-দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধ হয় বলে ছবির মতো সুন্দর।

এরকম একটা জায়গায় যে আবার একটা পুরনো জমিদার বাড়ি থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না; কিন্তু মিনিট দশেক চলার পর রাস্তার দুপাশের গাছপালা দেখে বুঝতে পারলাম আম জাম কাঁঠাল ভরা একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তারপর রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে একটা পোড়ো মন্দির পেরোতেই সামনে দেখতে পেলাম নহবৎখানা সমেত একটা শেওলাধরা প্রকাণ্ড সাদা ফটক। আমাদের গাড়িটা তিনবার হর্ন দিয়ে ফটকের ভিতরে ঢুকতেই সামনে বিশাল বাড়িটা বেরিয়ে পড়ল।

পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে লালটাল উবে গিয়ে এখন শুধু গাঢ় বেগুনি ভাব রয়েছে। অন্ধকার বাড়িটা আকাশের সামনে একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার অবস্থা যে প্রায় যাদুঘরে রাখার মতো সেটা কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম। দেয়ালে স্যাঁতা ধরেছে, সর্বাঙ্গে পলেস্তারা খসে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, সেই ইঁটের মধ্যেও আবার ফাটল ধরে তার ভিতর থেকে গাছপালা গজিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এদিকে ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই বোধহয়?' 'আজ্ঞে না' বলল ড্রাইভার, 'তিন বছর থেকে শুনছি আসবে আসবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে উপর দিকে চাইলে দোতলার অনেকগুলো ঘরের জানালা দেখা যায়; কিন্তু তার একটাতেও আলো আছে বলে মনে হল না। ডান দিকে কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাচ্ছে, যাতে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বোধহয় মালী বা দারোয়ান বা ওইরকম কেউ থাকে ঘরটাতে। মনে মনে বললাম, ফেলুদা ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে এ কোথায় এসে হাজির হল কে জানে।

একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাইরের জমিতে। তারপরেই একজন বুড়ো চাকর এসে দরজার মুখটাতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ড্রাইভার গাড়িটাকে নিয়ে গেছে বোধহয় গ্যারেজের দিকে। চাকরটা ভুরু কুঁচকে একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভিতরে আসুন।' আমরা দুজনে তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

লম্বায়-চওড়ায় বাড়িটা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আর সবই কেমন যেন ছোট ছোট। দরজাগুলো বেঁটে বেঁটে, জানালাগুলো কলকাতার যে কোনও সাধারণ বাড়ির জানালার অর্ধেক, ছাতটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল দেড়শো-দুশো বছর আগের বাংলা দেশের জমিদার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই নাকি এই রকমই ছিল।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই একটা আশ্চর্য নতুন জিনিস দেখলাম। ফেলুদা বলল, 'একে বলে চাপা-দরজা। ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরি হত। এ দরজা বন্ধ করলে আর খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে না ভাঁজ হয়ে মাথার উপরে সিলিং-এর মতো টেরচাভাবে শুয়ে পড়ে। দরজার গায়ে যে ফুটোগুলো দেখছিস, সেগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ানো হত।'

দরজা পেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা, তার শেষ মাথায় কুলঙ্গিতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা তিনজনে।

এ ঘরটা বেশ বড়। আরও বড় মনে হত যদি এত জিনিসপত্র না থাকত। একটা প্রকাণ্ড খাট ঘরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে আছে। তার মাথার দিকে বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে তিনটে, একটা এমনি আলমারি, আর মেঝে থেকে ছাত অবধি বইয়ে ঠাসা বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে আর রয়েছে খাটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। টেবিলের উপর রাখা একটা মোমবাতির আলো তাঁর মুখে পড়েছে, আর সেই আলোতে বুঝতে পারছি সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন।

'বসুন', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাকি বোসো বলব? তুমি তো দেখছি বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছোট। তুমিই বলি, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই!'

ফেলুদা আমার কথা চিঠিতেই লিখে দিয়েছিল, এখন আলাপ করিয়ে দিল। একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে আমাদের দুজনেরই নমস্কারের উত্তরে উনি কেবল মাথা নাড়লেন।

খাটের সামনেই দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসলাম আমরা দুজনে।

'চিঠিটা পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল নিশ্চয়ই,' ভদ্রলোক হালকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'না হলে আর অ্যাদ্দুর আসি?'

'বেশ, বেশ।' মজুমদার মশাই সত্যিই খুশি হয়েছেন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। 'না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তা ছাড়া তুমিও একটা পাওনা থেকে

বঞ্চিত হতে। অবিশ্যি জানি না এ সব বই তোমার আছে কি না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি টেবিলের দিকে ঘুরে গেল। চারটে মোটা মোটা বই রাখা রয়েছে মোমবাতির পাশেই। ফেলুদা উঠে গিয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সর্বনাশ, এ যে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই। আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোনওকালে—?'

'না', ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুবাবয়সের একটা শখ বা "হবি"। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগানো হয়। ম্যালকম বলে এক সাহেব-গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়। সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতূহল হয়। তখনই এইসব বই কিনি। সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব শখ হয়। এমিল গ্যাবেরিও-র নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল ফেলুদা, 'ফরাসি লেখক, প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।'

'হুঁ', মাথা নেড়ে বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার, 'তার সব ক'টা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া এডগার অ্যালেন পো, কোনান ডয়েল, এ তো আছেই। বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর বা তারও বেশি আগে। তার চেয়ে বেশি আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজকাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে, অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয় যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ। আর বেশি সাক্সেস্‌ফুলি করছ। —কথাটা ঠিক বলেছি কি?'

'সাক্সেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।'

'সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। মোমবাতির স্থির শিখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে তা নয়, আমার শরীরও ভাল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না; তাই ভাবলাম অন্তত এই ক'টা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগুলোর যত্ন হবে, কদর হবে।'

ফেলুদা অবাক হয়ে তাকের বইগুলোর দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সবই কি আপনার নিজের বই?'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আর নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'তা তো বটেই। আর্কিয়লজির বই রয়েছে, আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী...এমন কী থিয়েটারের বইও তো দেখছি। তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?'

'তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে, তাকে মাসে দু-তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়, তখন লিস্ট করে দিই, ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।'

ফেলুদা টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর দিকে দেখে বলল, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইগুলো নিজের হাতে করে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম, কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে।'

আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। উনি হাত দুটো কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটার যে কোনও বিশেষ কারণ আছে সেটা বুঝতে পারিনি।

'আরথ্রাইটিস জানো তো? যাকে সোজা বাংলায় বলে গেঁটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না। এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে, নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়ে-টাইয়ে দেয়।'

'আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?'

'না, ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশীতে ভাল ডাক্তার নেই।'

লক্ষ করছিলাম ফেলুদার দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে ঘরের কোনায় রাখা সিন্দুকটার দিকে। ও বলল, 'আপনার সিন্দুকটার একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। তালা-চাবির ব্যবস্থা নেই দেখছি। কম্বিনেশনে খোলে বুঝি?'

কালীকিঙ্করবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে; সেই অনুযায়ী নবটা ঘোরালে তবে খোলে। এ সব অঞ্চলে এককালে ডাকাতদের খুব উপদ্রব ছিল, জানো তো। আমার পূর্বপুরুষই তো ডাকাতি করে জমিদার হয়েছে। তারপর আবার আমরাই ডাকাতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। তাই মনে হয়েছিল তালার বদলে কম্বিনেশন করলে হয়তো আর একটু নিরাপদ হবে।'

কথাটা শেষ করে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর চাকরের নাম ধরে একটা হাঁক দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো গোকুল এসে হাজির হল। কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'একবার খাঁচাটা আন তো গোকুল। এঁদের দেখাব।'

গোকুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা খাঁচায় একটি টিয়া নিয়ে এসে হাজির। মোমবাতির আলোয় টিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কালীকিঙ্করবাবু পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলো তো মা,—ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন—বলো তো।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর আশ্চর্য পরিষ্কার গলায় পাখি বলে উঠল, 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন!'

আমি তো থ। পাখিকে এত পরিষ্কার কথা বলতে কখনও শুনিনি। কিন্তু ওখানেই শেষ না। সঙ্গে আরও দুটো কথা জুড়ে দিল টিয়া—'একটু জিরো!'

তারপর আবার পুরো কথাটা পরিষ্কার করে বলে উঠল টিয়া—'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, 'ত্রিনয়ন কে?'

কালীকিঙ্করবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'সেটি বলব না তোমাকে। শুধু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে সেটা হল একটা সংকেত। বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখো তো তুমি সংকেতটা বার করতে পার কি না। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না সেটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পার', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্মরণশক্তি কমে আসে সেটা জানো তো? বছর তিনেক আগে একদিন সকালে হঠাৎ দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে?—সারাদিন চেষ্টা করেও নম্বরটা মনে করতে পারিনি। শেষটায় মনে পড়ল মাঝরাত্তিরে! নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয় সেটা তো বলা যায় না। তাই মনে হয়েছিল ওটা মাথায় রাখাই ভাল। এক আমার ছেলে জানত, কিন্তু সে থাকে বাইরে বাইরে। তাই পরদিনই একটি টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটা একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটাকে পড়িয়ে দিই। এখন ও মাঝে মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে—অন্য পাখি যেমন বলে "রাধাকিষণ" বা "ঠাকুর ভাত দাও"।

ফেলুদা সিন্দুকটার দিকে দেখছিল। হঠাৎ ভ্রূকুটি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আবার গেল সিন্দুকটার দিকে।

'কী দেখছ ভাই?' বললেন কালীকিঙ্করবাবু। 'তোমার ডিটেকটিভের চোখে কিছু ধরা পড়ল নাকি?'

ফেলুদা সিন্দুকের সামনেটা পরীক্ষা করে বলল, 'আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধহয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।'

কালীকিঙ্করবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?'

ফেলুদা মোমবাতিটা আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

কালীকিঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মণিলাল ঠাকুর আর মালী। আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিন পাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবারে এসেছে—ওই যা বললাম—আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার সকালে আমার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে আবার বেঞ্চিতেই পড়ে যাই। রাজেন পলাশী থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। ও পরদিনই ডাক্তার নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে একটা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। যাই হোক—আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই সেটা আমি জানি। এই শেষ ক'টা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্দুক ভাঙবে?'

ফেলুদা কালীকিঙ্করবাবুকে আশ্বাস দিল।

'আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে

পারে। হয়তো সিন্দুকটা যখন প্রথম বসানো হয়েছিল তখন ঘষাটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরনো সেটা এই মোমবাতির আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আর একবার দেখব। আপনার চাকরটি বিশ্বাসী তো?'

'গোকুল আছে প্রায় ত্রিশ বছর।'

'আর রাজেনবাবু?'

'রাজেনও পুরনো লোক। মনে তো হয় বিশ্বাসী। তবে ব্যাপারটা কী জান—আজ যে বিশ্বাসী, কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'যাই হোক, গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয় না চিন্তার কোনও কারণ আছে।'

'যাক!'

কালীকিঙ্করবাবুকে খানিকটা আশ্বস্ত বলে মনে হল। আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, 'গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। লেপ কম্বল তোশক বালিশ মশারি—সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুরে গেছে—এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ো। কাল সকালে যাবার আগে যদি চাও তো আমার গাড়িতে করে আশেপাশে একটু ঘুরে দেখে নিয়ো। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।'

ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে বইগুলো নিয়ে এল। গুড নাইট করার আগে কালীকিঙ্করবাবু আর একবার হেঁয়ালির কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। —

'ওটার সমাধান করতে পারলে তোমাকে আমার গ্যাবোরিওর সেটটা উপহার দেব।'

গোকুল আমাদের সঙ্গে নিয়ে দুটো বারান্দা পেরিয়ে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল।

আগে থেকেই ঘরে একটা লণ্ঠন রাখা ছিল। সুটকেস আর হোল্ডঅলও দেখলাম ঘরের এক কোণে রাখা রয়েছে। কালীকিঙ্করবাবুর ঘরের চেয়ে এ ঘরটা ছোট হলেও, জিনিসপত্র কম থাকাতে হাঁটাচলার জায়গা এটাতে একটু বেশিই। ফরসা চাদর পাতা খাটের উপর বসে ফেলুদা বলল, 'সংকেতটা মনে পড়ছে, তোপ্‌সে?'

এইরে! ত্রিনয়ন নামটা মনে আছে, কিন্তু সমস্ত সংকেতটা জিজ্ঞেস করে ফেলুদা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

'পারলি না তো? ঝোলা থেকে আমার খাতাটা বার করে সংকেতটা লিখে ফেল। গ্যাবোরিওর বইগুলোর ওপর বেজায় লোভ হচ্ছে।'

খাতা পেনসিল নিয়ে বসার পর ফেলুদা বলল, আর আমি গোটা গোটা অক্ষরে লিখে ফেললাম—

'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

লিখে নিজেরই মনে হল এ আবার কীরকম সংকেত। এর তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। ফেলুদা এর সমাধান করবে কী করে?

ফেলুদা এদিকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে দেখছে। জ্যোৎস্না রাত। বোধহয় পূর্ণিমা। আমি ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা বাড়ির পিছন দিক। ফেলুদা বলল, 'একটা পুকুর-টুকুর গোছের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে ডান দিকটায়।' ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে জল চিক্‌মিক্‌ করছে সেটা আমিও দেখেছি।

একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। তার সঙ্গে এই মাত্র যোগ হল শেয়ালের ডাক। আমার মনে হল এত নির্জন জায়গায় এর আগে কখনও আসিনি।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, ফেলুদা পাল্লা দুটো বন্ধ করতেই একটা মটোরের আওয়াজ পেলাম। এটা অন্য গাড়ি, সেই বিশাল প্রাচীন আমেরিকান গাড়ি নয়।

'বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে,' ফেলুদা মন্তব্য করল। তার মানে এবার খেতে ডাকবে। সত্যি বলতে কী, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটায় ট্রেন ধরব বলে সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। পথে রাণাঘাট স্টেশনে অবিশ্যি মিষ্টি আর চা খেয়ে নিয়েছিলাম। হয়তো এমনিতে খিদে পেত না, কারণ ঘড়িতে বলছে সবেমাত্র আটটা বেজেছে, কিন্তু এখানে তো আর কিছু

করার নেই—এমন কী লণ্ঠনের আলোতে বইও পড়া যাবে না—তাই মনে হচ্ছিল খেয়ে-দেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকতে পারলে মন্দ হয় না।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি রয়েছে, আর ফেলুদা সেটার দিকে চেয়ে আছে। ফোটো নয়; আঁকা ছবি আর বেশ বড়। সেটা যে কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খালি গায়ে বসে আছেন বাবু চেয়ারের উপর; পাকানো গোঁফ, কাঁধ অবধি লম্বা চুল, টানাটানা চোখ, আর বিরাট চওড়া কাঁধ।

'মুগুর ভাঁজা কুস্তি করা শরীর,' ফিস্ ফিস্ করে বলল ফেলুদা। 'মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।'

বাইরে পায়ের শব্দ। আমরা দুজনেই দরজার দিকে চাইলাম। গোকুল বাইরে একটা লণ্ঠন রেখে গিয়েছিল, তার আলোটা ঢেকে প্রথমে একটা ছায়া ঘরের মেঝেতে পড়ল, আর তারপর একটা অচেনা মানুষ চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ইনিই কি বিশ্বনাথ মজুমদার? না, হতেই পারে না। খাটো করে পরা ধুতি, গায়ে ছাই রঙের পাঞ্জাবি, ঝুঁপো গোঁফ আর চোখে পুরু চশমা। ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বোধহয় আমাদের খুঁজছেন।

'কিছু বলবেন রাজেনবাবু?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেলেন। এবার সর্দি-বসা গলায় কথা এল—

'ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি; গোকুল আপনাদের খবর দেবে।'

রাজেনবাবু চলে গেলেন।

'কীসের গন্ধ বলো তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে।

'বুঝতে পারছিস না? ন্যাফথ্যালিন। গরম পাঞ্জাবিটা সবেমাত্র বার করেছে ট্রাঙ্ক থেকে।'

রাজেনবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝতে পারলাম আমরা কী আশ্চর্য থমথমে পরিবেশের মধ্যে রয়েছি। এরকম জায়গায় দিনের পর দিন মানুষ থাকে কী করে? ফেলুদা পাশে থাকলে সাহসের অভাব হবে না জানি, কিন্তু না থাকলে এই আদ্যিকালের পোড়ো জমিদার বাড়িতে পাঁচ মিনিটও থাকার সাধ্যি হত না আমার। কালীকিঙ্করবাবু আবার নিজেই বললেন এ বাড়িতে নাকি এককালে খুন হয়েছিল। কোন্ ঘরে কে জানে।

ফেলুদা এর মধ্যে লণ্ঠন সমেত টেবিলটাকে কাছে টেনে এনে খাটে বসে খাতা খুলে সংকেত নিয়ে ভাবা শুরু করে দিয়েছে। দু-একবার যেন ত্রিনয়ন বলে বিড়বিড় করতেও শুনলাম। আমি আর কী করি, দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওটা কী? বুকটা ধড়াস করে উঠল। কী জানি একটা নড়ে উঠেছে বারান্দার ওদিকটায়—যেখানে লণ্ঠনের আলো অন্ধকারে মিশে গেছে।

দাঁত দাঁতে চেপে রইলাম অন্ধকারের দিকে। এবার বুঝলাম ওটা একটা বেড়াল। ঠিক সাধারণ সাদা বা কালো বেড়াল নয়; এটার গায়ে বাঘের মতো ডোরা। বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটা হাই তুলে উলটো দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছু পরেই শুনলাম কর্কশ গলায় টিয়ার ডাক। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। বিশ্বনাথ বাবুর ঘরটা কোথায় কে জানে। তিনি কি দোতলায় থাকেন না একতলায়? রাজেনবাবুই বা কোথায় থাকেন? আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন যেখান থেকে কারুর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না?

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ফেলুদা খাটের উপর পা তুলে দিয়ে খাতা হাতে নিয়ে ভাবছে। আর না পেরে বললাম, 'এরা এত দেরি করছে কেন বলো তো?'

ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল।' বলেই আবার খাতার দিকে মন দিল।

আমি ফেলুদার পাওয়া বইগুলো উলটে-পালটে দেখলাম। একটা বই আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে, একটার নাম 'ক্রিমিনলজি', আর একটা 'ক্রাইম অ্যান্ড ইটস ডিটেকশন'। চার নম্বর বইটার নামের মানেই বুঝতে পারলাম না। তবে এটায় অনেক ছবি রয়েছে, তার মধ্যে পর পর দশ পাতায় শুধু বিভিন্ন রকমের পিস্তল আর বন্দুক। ফেলুদা রিভলভারটা সঙ্গে এনেছে কি?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে পড়ল ফেলুদা তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি, আর সেটার কোনও প্রয়োজনও নেই। কাজেই রিভলভারেরই বা দরকার হবে কেন?

বইগুলো সুটকেসে রেখে খাটে বসতে যাব, এমন সময় আচমকা অচেনা গলার আওয়াজ পেয়ে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল।

এবারের লোকটিকে চেনায় কোনও অসুবিধা নেই। ইনি গোকুল নন, রাজেনবাবু নন; গাড়ির ড্রাইভার নন, আর রান্নার ঠাকুর তো ননই। কাজেই ইনি বিশ্বনাথবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

'আপনাকে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম', ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন। 'আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।'

সেটা আর বলে দিতে হয় না। বাপের সঙ্গে বেশ মিল আছে চেহারায়। বিশেষ করে চোখ আর নাকে। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, মাথার চুল এখনও সবই কাঁচা, গোঁফ-দাড়ি নেই, ঠোঁট দুটো অসম্ভব রকম পাতলা। ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না সেটা

অবিশ্যি বলা মুশকিল। একটা কারণ বোধহয় উনি আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন, আর আরেকটা কারণ—যদিও এটা ভুল হতে পারে—ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেও সে হাসিটা কেন জানি খাঁটি বলে মনে হল না। যেন আসলে সত্যি করে আমাদের দেখে খুশি হননি; সেটা হবেন আমরা চলে গেলে পর।

ফেলুদা আর আমি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে নীচে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম খাবার ঘরে। আমি ভেবেছিলাম মাটিতে বসে খেতে হবে—এখন দেখছি বেশ বড় একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে, আর তার উপরে রুপোর থালা বাটি গেলাস সাজানো রয়েছে।

যে-যার জায়গায় বসার পর বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'আমার আবার কি শীত কি গ্রীষ্ম দুবেলা চান করার অভ্যাস, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

ভদ্রলোকের গা থেকে দামি সাবানের গন্ধ পেয়েছি আগেই; এখন মনে হচ্ছে বোধহয় সেন্টও মেখে এসেছেন। বেশ শৌখিন লোক সন্দেহ নেই। সাদা সিল্কের শার্টের উপর গাঢ় সবুজ রঙের হাত কাটা কার্ডিগ্যান, আর তার সঙ্গে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট।

বাটি চাপা ভাত ভেঙে মোচার ঘন্ট দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম। থালার চারপাশে গোল করে সাজানো বাটিতে রয়েছে আরও তিন রকমের তরকারি, সোনা মুগের ডাল, আর রুই মাছের ঝোল।

'বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

'হ্যাঁ', বলল ফেলুদা। 'উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।'

'বই উপহার দিয়ে?'

'হ্যাঁ। আজকের বাজারে ওই বই যদি পাওয়াও যেত, তা হলে দাম পড়ত কমপক্ষে পাঁচ-সাত শো টাকা।'

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেবার কোনও মানে হয় না।'

ফেলুদা কথাটার প্রতিবাদ করল।

'কী বলছেন মিস্টার মজুমদার। আমার তো এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।'

বিশ্বনাথবাবু ফেলুদার কথায় তেমন আমল না দিয়ে বললেন, 'আমার তো এই চার দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।'

'বাইরে একবারেই যান না?'

'শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর এই অন্ধকার ঘরে খাটের উপর শুয়ে থাকেন। দিনে কেবল দুবার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন। এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।'

'আপনি আর ক'দিন আছেন?'

'আমি? আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই। আপনারা তো বোধহয় সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরোব।'

ফেলুদা ভাতে ডাল ঢেলে বলল, 'আপনার বাবার তো নানারকম শখ দেখলাম; আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?'

'হ্যাঁ মশাই। কাজকম্ম করে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।'

বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন বেজেছে প্রায় সাড়ে নটা। এখানে ঘড়ির টাইমের আর কোনও মানে নেই আমার কাছে, কারণ সাতটা থেকেই মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির।

ফেলুদাকে বললাম, 'বালিশগুলোকে উলটো দিকে করে শুলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?'

'কেন বল্ তো?'

'তা হলে আর চোখ খুললেই ডাকাতবাবুটিকে দেখতে হবে না।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমার কোনও আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের চাহনিটা যে আমারও খুব ভাল লাগছিল তা বলতে পারি না।'

শোবার আগে ফেলুদা লণ্ঠনের আলোটাকে কমিয়ে দিল, আর তার ফলে ঘরটাও যেন আরও ছোট হয়ে গেল।

চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে, তখন হঠাৎ ফেলুদার মুখে ইংরিজি কথা শুনে অবাক হয়ে এক ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। স্পষ্ট শুনলাম ফেলুদা বলল—

'দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো।'

আমি কনুইয়ের ভর করে উঠে বসলাম, 'ব্রাউন ক্রো? কাক আবার ব্রাউন হয় নাকি? এ সব কী আবোল-তাবোল বকছ ফেলুদা?'

'গ্যাবোরিওর বইগুলো বোধহয় পেয়ে গেলাম রে তোপ্‌সে।'

'সে কী? সমাধান হয়ে গেল?'

'খুব সহজ। ...এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতগুলো কায়দা বার করেছিল। দেয়ার ওয়জ এ ব্রাউন ক্রো—এই কথাটার সঙ্গে কিন্তু বাদামি কাকের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে—দরওয়াজা বন্‌ধ্ করো। এই ত্রিনয়নের ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম। গোড়ায় ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।'

'সে কী? ওটা তিন নয় বুঝি? আমিও তো ওটা তিন ভাবছিলাম।'

'উঁহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। "ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন হল ত্রি-নাইন-ও-থ্রি-নাইন। এখানে "ও" মানে "জিরো" অর্থাৎ শূন্য।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'তা হলে একটু জিরো মানে—'

'এইট-টু-জিরো। জলের মতো সোজা। —সুতরাং পুরো সংখ্যা হচ্ছে—থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। কেমন, ঢুকল মাথায়? এবার ঘুমো।'

মনে মনে ফেলুদার বুদ্ধির তারিফ করে আবার বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজতে যাব, এমন সময় আবার বারান্দায় পায়ের আওয়াজ।

রাজেনবাবু।

এত রাত্রে ভদ্রলোকের কী দরকার?

আবার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'কিছু বলবেন রাজেনবাবু?'

'ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের আর কিছু দরকার লাগবে কি না।'

'না না, কিচ্ছু না। সব ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই আবার চলে গেলেন।

চোখ বন্ধ করার আগে বুঝতে পারলাম জানালার খড়খড়ি দিয়ে আসা চাঁদের আলোটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন। তারপর বেড়ালটা কোত্থেকে জানি দুবার ম্যাও ম্যাও করে উঠল। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি ফেলুদা ঘরের জানালাগুলো খুলছে। বলল, 'রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?'

রাত্রে যাই হোক, এখন যে মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে সেটা খাটে শোয়া অবস্থাতেও বাইরের গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারছি।

আমরা ওঠার আধ ঘণ্টার মধ্যে চা এনে দিল বুড়ো গোকুল। দিনের আলোতে ভাল করে ওর মুখ দেখে মনে হল গোকুল যে শুধু বুড়ো হয়েছে তা নয়; তার মতো এমন ভেঙে পড়া দুঃখী ভাব আমি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

'কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

গোকুল কানে কম শোনে কি না জানি না; সে প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন ফ্যাল-ফ্যাল মুখ করে ফেলুদার দিকে দেখল; তারপর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাত আমরা কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক ঠিক কালকেরই মতো বিছানায় শুয়ে আছেন কম্বলের তলায়। তাঁর পাশের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে বলেই বোধহয় উনি সেটাকে বন্ধ করে রেখেছেন। ঘরটা তাই সকাল বেলাতেও বেশ অন্ধকার। যেটুকু আলো আছে সেটা আসছে বারান্দার দরজাটা দিয়ে। আজ প্রথম লক্ষ করলাম ঘরের দেয়ালে কালীকিঙ্করবাবুর একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে তোলা, কারণ তখনও ভদ্রলোকের গোঁফ-দাড়ি পাকতে শুরু করেনি।

ভদ্রলোক বললেন, 'গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বার করে রেখেছি, কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।'

ফেলুদা বলল, 'হয়েছি কি না সেটা আপনি বলবেন। থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। —ঠিক আছে?'

'সাবাশ গোয়েন্দা!' হেসে বলে উঠলেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাও, বইগুলো নিয়ে তোমার থলির মধ্যে পুরে ফেলো। আর দিনের আলোতে একবার সিন্দুকের গায়ের দাগগুলো দেখো দেখি। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে না ওটা নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ আছে।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।'

ফেলুদা আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকের লেখা বই চারখানা তার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল।

'তোমরা চা খেয়েছ তো?' কালীকিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ড্রাইভারকে বলা আছে। গাড়ি বার করেই রেখেছে। তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে সুবিধে হয়। রাজেন গেছে বাজারে। গোকুল তোমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেবে। ...তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশেপাশে ঘুরে দেখতে চাও?'

ফেলুদা বলল, 'আমি ভাবছিলাম সাড়ে দশটার ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।'

'তা বেশ তো, তোমাদের মতো শহুরে লোকেদের পল্লীগ্রামে বন্দি করে রাখতে চাই না আমি। তবে তুমি আসাতে আমি যে খুবই খুশি হয়েছি—সেটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।'

কাল রাত্তিরের বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে আমি সকাল বেলার রোদে ভেজা ধান ক্ষেতের দৃশ্য দেখছি, এমন সময় শুনলাম ফেলুদা ড্রাইভারকে একটা প্রশ্ন করল।

'স্টেশনে যাবার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা আছে?'

'আজ্ঞে না বাবু', বলল মণিলাল ড্রাইভার।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি ও কী ভাবছে, কোনও সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না; কিন্তু সাহস হল না।

রাস্তায় কাদা ছিল বলে দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট লাগল স্টেশনে পৌঁছতে। মাল নামিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ফেলুদা কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে গেল না। মালগুলো স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় রেখে আবার বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তায় সাইকেল রিকশার লাইন। সবচেয়ে সামনের রিকশার মালিকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?'

'জানি বাবু।'

'চলুন তো। তাড়া আছে।'

প্রচণ্ডভাবে প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিতে দিতে ভিড় কাটিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেলাম। ফেলুদার খ্যাতি যে এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেটা বুঝলাম যখন সাব-ইন্সপেক্টর মিস্টার সরকার ওর পরিচয় দিতে চিনে ফেললেন। ফেলুদা বলল, 'ঘুরঘুটিয়ার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন তো।'

'কালীকিঙ্কর মজুমদার?' সরকার ভুরু কুঁচকোলেন। 'তিনি তো ভাল লোক বলেই জানি মশাই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তাঁর সম্বন্ধে তো কোনওদিন কোনও বদনাম শুনিনি।'

'আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?'

'সম্ভবত কলকাতায়। কেন, কী ব্যাপার, মিস্টার মিত্তির?'

'আপনার জিপটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? ঘোরতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।'

কাদা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে জিপ ছুটে চলল ঘুরঘুটিয়ার দিকে। ফেলুদা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মধ্যে শুধু একটিবার মুখ খুলল, যদিও তার কথা আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

'আরথ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাফথ্যালিন—সব ছকে পড়ে গেছে রে তোপ্‌সে। ফেলু মিত্তির ছাড়াও যে অনেক লোকে অনেক বুদ্ধি রাখে সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।'

মজুমদার-বাড়ি পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটা দেখে অবাক লাগল সেটা হল একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। ফটকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি। জিপ থেকে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'লক্ষ কর গাড়িটাতে কাদাই লাগেনি। এ গাড়ি সবেমাত্র রাস্তায় বেরোল।'

বিশ্বনাথবাবুর ড্রাইভারই বোধহয়—কারণ এ লোকটাকে আগে দেখিনি—আমাদের দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে গেটের ধারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আ-আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন?'

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে ফেলুদা আর অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভিতর—তার পিছনে দারোগা, আমি আর একজন কনস্টেবল।

আবার সেই প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে ফেলুদা এবং আমরা তিনজন সোজা ঢুকলাম কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে।

ঘর খালি। বিছানায় কম্বলটা পড়ে আছে। আর যা ছিল সব ঠিক তেমনিই আছে, কিন্তু মালিক নেই।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল ফেলুদা।

সে সিন্দুকটার দিকে চেয়ে আছে। সেটা হাঁ করে খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে অনেক কিছু বার করে নেওয়া হয়েছে।

দরজার বাইরে গোকুল এসে দাঁড়িয়েছে। সে থরথর করে কাঁপছে। তার চোখে জল। দেখে মনে হয় যেন তার শেষ অবস্থা।

তার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ে ফেলুদা বলল, 'বিশ্বনাথবাবু কোথায়?'

'তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।'

'দেখুন তো মিস্টার সরকার!'

দারোগা আর কনস্টেবল অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেল।

'শোনো গোকুল'—ফেলুদা দুহাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ দুটোকে শক্ত করে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'একটিও মিথ্যে কথা বললে তোমায় হাজতে যেতে হবে। —কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?'

গোকুলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—তাঁকে খুন করেছেন।'

'কে?'

'ছোটবাবু।'

'কবে?'

'যেদিন ছোটবাবু এলেন সেদিনই। রাত্তির বেলা। বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন, কর্তাবাবু বললেন—আমার টিয়া জানে, তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বলব না। তারপরে—তারপরে—তার কিছুক্ষণ পরে—ছোটবাবু আর তেনার গাড়ির ডেরাইভারবাবু, দুজনে মিলে—'

গোকুলের গলা ধরে এল। বাকিটা তাকে খুব কষ্ট করে বলতে হল—

'দুজনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই পিছনের দিঘির জলে—গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন ছোটবাবু—প্রাণের ভয় দেখিয়ে।'

'বুঝেছি। —আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও লোকই নেই, তাই না?'

'ছিলেন, তবে তিনি মারা গেছেন আজ দুবছর হয়ে গেল।'

আমি আর ফেলুদা এবার ছুটলাম নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁয়ে ঘুরলেই পিছনের বাগানে যাবার দরজা। বাইরে বেরোনো মাত্র মিস্টার সরকারের চিৎকার শুনলাম—

'পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার—আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ।

আমরা দুজনে দৌড়ে গাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে মি. সরকার হাতে রিভলভার

নিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। তেঁতুল গাছের পরেই কালকের দেখা পুকুরটা—তার জলের বেশির ভাগই সবুজ পানায় ঢাকা।

'লোকটা আগেই লাফ দিয়েছে।' বললেন মি. সরকার। 'সাঁতার জানে না। —গিরিশ, দেখো তো দেখি টেনে তুলতে পার কি না।'

কনস্টেবল বিশ্বনাথবাবুকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল। এখন ছোটবাবুর দশা ওই টিয়াপাখির মতো; খাঁচায় বন্দি। সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি গয়নাগাটি যা নিয়েছিলেন সবই উদ্ধার পেয়েছে। লোকটা ব্যবসা করত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জুয়া ইত্যাদি অনেক বদ-অভ্যাস ছিল, যার ফলে ইদানীং ধার-দেনায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

ফেলুদা বলল, 'কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে—তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাকটিং-এর বইগুলোর কথা মনে হল। তা হলে কি বিশ্বনাথবাবুর এককালে শখ ছিল থিয়েটারের? তিনি যদি ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়ে থাকেন, অভিনয় জেনে থাকেন তা হলে এইভাবে এই অন্ধকার বাড়িতে আমাদের বোকা বানানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। হাতটা তাঁকে কম্বলের নীচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কারণ নিজের হাতকে মেক-আপ করে কী করে তিয়াত্তর বছরের বুড়োর হাত করতে হয় সে বিদ্যে তাঁর জানা ছিল না। সন্দেহ একেবারে পাকা হল যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপ পড়েনি।'

আমি কথার ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিল কে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বনাথবাবু সেটা জেনেছিলেন। তিনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।'

শেষ পর্যন্ত আমাদের দশটার ট্রেনই ধরতে হল।

রওনা হবার আগে ফেলুদা তার সুটকেস আর ঝোলা থেকে আটখানা বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'খুনির হাত থেকে উপহার নেবার বাসনা নেই আমার। তোপ্‌সে, বুকশেলফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয় তো।'

আমি যখন বই রেখে কালীকিঙ্করবাবুর ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখনও টিয়া বলছে, 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

(পুনর্মুদ্রিত)

ছবি: সত্যজিৎ রায়

ছেলেধরাদের মুখোমুখি

অশোক বসু

জঙ্গলের ধার ঘেঁষে যে কাঁচা রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে, সেই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছিল ওরা। দু'টো সাইকেলে দু'জন। কাল্লু আর লাল্লু। ওদের সঙ্গে আর-একজনও আছে। তাকে বসানো হয়েছে লাল্লুর সাইকেলের রডে। আট বছরের মুন্না। শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী গঙ্গাপ্রসাদ সাহার নাতি। মুন্নাকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দুই দুষ্কৃতী কাল্লু আর লাল্লু। উদ্দেশ্য, ধনী ব্যবসায়ীর নাতিকে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করা। কত টাকা চাওয়া হবে, তা অবশ্য এখনও ঠিক করা হয়নি। মুন্নাকে একটু দূরে কোথাও লুকিয়ে রেখে তারপর ঠিক করা হবে মুক্তিপণের টাকার অঙ্ক। লাল্লুর ইচ্ছে এক লাখ। কিন্তু কাল্লু পঞ্চাশ হাজারের বেশি উঠতে চায় না। এমনকী, পঁচিশ হাজারে রফা হলেও আপত্তি নেই। এটাই ওদের প্রথম কাজে নামা। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা। কাল্লু আর লাল্লু দু'জন যেমনই লোক হোক না কেন, নিজেরা নিজেদের ভয়ংকর দুর্বৃত্ত বলে মনে করে। অচিরেই তারা সাংঘাতিক সব অপরাধ করে দেশের মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে এমন ধারণা হয়েছে ওদের। গঙ্গাপ্রসাদ সাহার নাতি মুন্না বাড়ির কাছের পার্কে খেলাধুলো করতে আসে বাড়ির কাজের বউয়ের সঙ্গে। শীতের রবিবারের সকালে পার্কে আসে, রোদ্দুরে ছোটাছুটি করে শীত ঝরিয়ে নিতে।

কাল্লু আর লাল্লু ভাল মানুষটি সেজে

গল্প

পার্কের বেঞ্চে বসে কয়েক দিন ধরে লক্ষ রাখল মুন্না আর কাজের বউটাকে। সুযোগ পেল এই রবিবার। কাজের বউটা তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে-করতে যেই একটু দূরে গিয়েছে, অমনই কাল্লু হাতছানি দিয়ে মুন্নাকে কাছে ডাকল, "বাঃ, তুমি তো খুব সুন্দর বাচ্চা আছ। তোমার নাম মুন্না, ঠিক কি না?"

মুন্না বলল, "তুমি আমাকে চেনো?"

মাথা নাড়ল কাল্লু, "না তো! তোমাকে চিনি না তো!"

মুন্না বলল, "চেনো না? একটুও না? তা হলে আমি যে মুন্না তুমি জানলে কেমন করে?"

বিজ্ঞের মতো মুখ করে কাল্লু বলল, "ম্যাজিক করে। ম্যাজিক করে আমি সব বলতে পারি! শুনবে? তোমার নাম মুন্না, তোমার বাবার নাম উমাপ্রসাদ, দাদুর নাম গঙ্গাপ্রসাদ, কোথায় তোমার বাড়ি, সে বাড়ি কেমন, সব।"

"তুমি আমাদের বাড়ি দেখেছ?"

"না তো! ম্যাজিক করে জানি। সাদা রঙের তিনতলা বাড়ির সামনে বাগান, বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে, ঠিক কি না?"

মুন্না চোখ বড়-বড় করে বলল, "তুমি ম্যাজিশিয়ান?"

কাল্লু ডাঁটের গলায় বলল, "আমি ম্যাজিশিয়ান এক্স। আর ও হল..." লাল্লুকে দেখিয়ে বলল, "ম্যাজিশিয়ান ওয়াই। আমার অ্যাসিট্যান্ট।"

মুন্না আদুরে গলায় বলল, "ও ম্যাজিশিয়ান, আমাকে একটা ম্যাজিক দেখাও না!"

কাল্লু গম্ভীর মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সব পারি। ওই যে সাদা রঙের কুকুরটা দেখছ, ম্যাজিক করে ওটাকে একটা কালো রঙের ভল্লুক করে দিতে পারি।"

"পার! সত্যি?"

"একদম সত্যি।"

"কই করো তো কুকুরকে ভল্লুক।"

কাল্লু মুশকিলের মুখ করে বলল, "কিন্তু ওসব করতে গেলে তো জাদুদণ্ড লাগে, জাদুর নানান জিনিস লাগে, সেসব তো বাড়িতে আছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে বাড়িতে যাও, তা হলে দেখাতে পারি।"

লাল্লু বলল, "এমনকী ইচ্ছে করলে তোমাকে ভোজবাজিও শিখিয়ে দিতে পারি।"

মুন্না বলল, "ভোজবাজি কী?"

"ম্যাজিক। এমন ম্যাজিক যে, তোমার বন্ধুরা দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

"সত্যি? তোমাদের বাড়ি কোথায় গো?"

কাল্লু বলল, "এই তো কাছেই। গেলেই বুঝতে পারবে কত কাছে। দারুণ-দারুণ সব ম্যাজিক শেখার ইচ্ছে থাকলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার। চোখের সামনে থেকে কাউকে ভ্যানিশ করে দেওয়া, গোরুকে ছাগল করে দেওয়া। যাবে তো চলো!"

লাল্লু বলল, "তা বলে ভেবো না তোমাকে কোনও খারাপ মতলবে..." বলেই এক হাত জিভ কেটে কাল্লুর দিকে তাকাল।

কাল্লু বলল, "শিগগির কথাটা উইথড্র করে নে লাল্লু। তুই না একটা রামবুদ্ধু আছিস। ভেবেচিন্তে কথা বলবি তো!"

লাল্লু বলল, "ঠিক বলেছিস। উইথড্র করে নিলেই তো কথাটা বলা হল না। মুন্না, আমি কোনও মতলব-টতলবের কথা বলিনি কিন্তু!"

আট বছরের মুন্না কথাটা ভাল করে শোনেইনি। সে তখন দারুণ-দারুণ ম্যাজিক শেখার আনন্দেই মশগুল। আবার তাকে একটু চিন্তিতও দেখা গেল। বলল, "কিন্তু তোমাদের বাড়ি গেলে তো কমলামাসি বকবে।"

কাল্লু বলল, "তোমার কমলামাসি টেরই পাবে না। এই যাব আর এই আসব।"

লাল্লু বলল, "খাবার আগেই ফিরে আসব।"

মুন্না বলল, "ঠিক তো!"

কাল্লু বলল, "ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

ওদের দু'টো সাইকেল একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। একেই সাইকেল, তাও নতুন নয়। দু'টোই পুরনো আর রং চটে গিয়েছে। মেলা শব্দ করে চলে। সেই সাইকেল চালিয়ে মুন্নাকে নিয়ে চলল লাল্লু আর কাল্লু, দুই অপহরণকারী। লাল্লুর সাইকেলে বসেছে মুন্না আর তার পিছন-পিছন আসছে কাল্লুর সাইকেল। চারপাশ নজর করতে-করতে আসছে। অসুবিধে হতে পারে এমন কিছু বুঝলে সঙ্গে-সঙ্গে মুন্নাকে নামিয়ে দিয়ে ওরা কেটে পড়বে।

বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর মুন্নার বোধ হয় ভাল ঠেকল না ব্যাপারটা। রাস্তাটা শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে ফাঁকা-ফাঁকা জায়গায়। চারদিকে শুধু মাঠ আর মাঠ। বাড়ি-ঘর যা দু'-একটা দেখা যাচ্ছে, সেগুলো গ্রামের দিকের ছোট-ছোট ঘর। টিন কিংবা শণের চাল। মাটির মেঝে।

"কী গো, তোমাদের বাড়ি কোথায়? যাচ্ছ তো যাচ্ছই। কমলামাসি তো ভাববে!"

কাল্লু খিক করে হেসে উঠে বলল, "ভাবাভাবির কিচ্ছু নেই সোনা! তুমি এখন আমাদের হেপাজতে। তোমার দাদু আর বাবাকে ফোন করে জানিয়ে দেব, তুমি আমাদের কাছে ভালই আছ। আমরা যত চাইব তত টাকা পাঠালে তোমাকে ফেরত পাঠাব।"

লাল্লু বলল, "ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, হা হা হা।"

মুন্না ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বলল, "বুঝেছি। তোমরা খারাপ লোক, ছেলেধরা। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, যাব না।" বলেই লাল্লুর সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরা ডান হাতটা প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ে ধরল।

"উরে বাবা গেছি রে..." বলে লাল্লু সাইকেলে ব্যালান্স রাখতে না পেরে রাস্তায় কাত হয়ে পড়ল। পিছনে আসছিল কাল্লুর সাইকেল। তার সাইকেলও লাল্লুর সাইকেলে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু'টো সাইকেলই মাটিতে পড়ে কুপোকাত। মুন্না কিন্তু আগেই লাফিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। ওদের ওই অবস্থা দেখে সে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। রাস্তার পাশের মাঠ ধরে চোঁ চাঁ দৌড় দিয়ে কিছুটা দূরের ছোটখাটো জঙ্গলে ঢুকে গেল।

লাল্লু মাটিতে বসেই বলল, "এই দ্যাখ কাল্লু, আমার হাতের অবস্থা। বিচ্ছু ছেলেটা সব ক'টা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে গো!"

কাল্লু দেখল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জামাপ্যান্ট থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "কিডন্যাপিংয়ের মতো শক্ত কাজ করতে চলেছিস, আর একটা বাচ্চা ছেলে কামড়াল, অমনি তুই সাইকেলসুদ্ধু মাটিতে ধপাস! এই জন্য দেশটার কিছু হল না! জানিস না, বড় কাজে

একটুআধটু ওরকম কষ্ট ভোগ করতেই হয়। স্রেফ তোর বোকামির জন্য কেস জন্ডিস হতে চলেছে। তবে ছেলেটাকে ছাড়া হবে না। যাবে কোথায়! জঙ্গল তোলপাড় করে খুঁজে আনব। ছেলেটা ফসকে যাওয়া মানে হাজার-হাজার টাকা ফসকে যাওয়া।"

লাল্লু বলল, "চল, জঙ্গলে ঢুকি। বিচ্ছুটাকে পেলে প্রথমে আমিও ওর হাতে অ্যাইসা কামড় দেব না, বাছাধন টের পেয়ে যাবে।"

কাল্লু গম্ভীর মুখে বলল, "টের পেয়ে যাবে কত চালে কত ধান।"

"ঠিক। কিন্তু কথাটা কত চালে কত ধান নয়, কত ধানে কত চাল!"

কাল্লু বলল, "আমি যা বলব, তাই হবে। আমি লিডার। ভুল বললেও আমি ঠিক, ঠিক বললেও ভুল। বুঝেছিস?"

কী আর করা যাবে। লিডার বলে কথা! লাল্লু ডান হাতের দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে বলল, "একটু-একটু বুঝেছি।"

অতঃপর ওরা জঙ্গলে ঢুকল। একটা ঝোপের মধ্যে সাইকেল দু'টো লুকিয়ে রেখে ওরা জঙ্গলের মধ্যে পাত্তা চালাল পলাতক মুন্নার।

॥ ২ ॥

রবিবার মানেই ছুটি। শুধু ছুটি। বিশুদ্ধ ছুটি। স্কুলের ছুটি, হোমটাস্ক, বইখাতা, কলম-পেনসিল থেকে ছুটি, বড়দের শাসন থেকে ছুটি। এমনই একটা ছুটির দিন যদি নীল আকাশ আর নভেম্বরের রোদ-ঝলমলে দিন হয়, তো কথাই নেই। ব্যাট-বল-উইকেট নিয়ে সকলে মিলে হইহই করে নেমে পড়ো মাঠে। দু' দলে ভাগ হয়ে শুরু করে দাও একটা জমাটি ক্রিকেট ম্যাচ। বল করো, বাউন্ডারি মারো, ক্যাচ ধরো। দারুণ মজায় ছুটির দিনটা হইহুল্লোড় করে কাটিয়ে দাও।

এমনই এক ম্যাচ খেলা হচ্ছে ছুটির দিনে। আসল খেলার মাঠে তো খোঁড়াখুঁড়ি, খেলতে দেবেন না বড়রা। তাই খেলা হচ্ছে আমবাগানের মাঠে। নামেই আমবাগান, একটাও আমগাছ নেই। আগে অনেক আমগাছ ছিল কি না এবং সেজন্যই আমবাগান নাম হয়েছে কি না, প্রবীণরা কেউ-কেউ হয়তো বলতে পারেন। সে যাই হোক, আমগাছ থাকুক আর না-থাকুক, মাঠটা তো আছে! সেই মাঠেই দেবু, পিন্টু বাপ্পাদের দেদার খেলা চলে বছরভর। ফুটবল খেলা হয়, ক্রিকেট খেলা হয়, দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্পের স্পোর্টস হয়। আমবাগানের মাঠ, ১২ থেকে ১৪ বছরের একদল ছেলের দাপিয়ে বেড়ানোর মাঠ।

তো সেদিন ছেলেরা দু'টো দল করে খেলছে। উইকেট এক দিকেই, ব্যাটসম্যানও একজন, বোলারও তাই। তা কী আর করা। এক-একটা দলে খেলোয়াড় তিনজন করে হলে এমন করেই খেলতে হবে। খেলোয়াড় কম হলেও খেলার আনন্দ কিন্তু কম হয়ে যায়নি। রীতিমতো টিম ইন্ডিয়ার মেজাজ নিয়ে খেলছে সকলে। এক দিকে দেবু, পিন্টু আর মনা। অন্য দিকে বাপ্পা, গোপাল আর ছোট্টু। ব্যাট করছে ছোট্টু, বল করছে দেবু। ১০ ওভারের খেলা। এর আগে দেবুদের দল রান করেছে ৫২। দেবু ১৯, পিন্টু ১৫ আর মনা ১৮। এখন ছোট্টুদের পালা।জোর লড়াই চলছে ব্যাটে-বলে। ছোট্টুদের সাত ওভারে দু' উইকেটে ৪১ রান। আউট হয়ে গিয়েছে গোপাল আর বাপ্পা। শেষ ব্যাটসম্যান ছোট্টু ব্যাট করছে। তিন ওভারে ১২ রান করলে ওরা জিতে যাবে। ছোট্টু আবার আনাড়ি ব্যাটসম্যান। ওর পক্ষে ১২ রান করা খুব সহজ কাজ নয়, আবার দুমদাম মেরে করেও দিতে পারে। দেবুর প্রথম বলটা ছোট্টু মারতে পারল না। দ্বিতীয়টাও নয়। পিন্টু আর মনা হইহই করে উঠল। তৃতীয় বলটা কিন্তু ব্যাটে-বলে হল। চোখ বুজে বলটা হাঁকিয়ে দিল ছোট্টু। ওভার বাউন্ডারি। বল আমবাগান ছাড়িয়ে মাঠের ধারের গাছগাছড়া, ঝোপঝাড়ের জঙ্গলমতো জায়গায় ঢুকল। বলের পিছু-পিছু পিন্টু ছুটল, সে ফিল্ডার। বল তাকেই খুঁজে আনতে হবে। আর ছ' রান দরকার ছোট্টুদের। এর মধ্যেই দেবুদের যেমন ভাবেই হোক, ছোট্টুকে আউট করতেই হবে। পিন্টু বল আনতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ ৩ ॥

জঙ্গলে ঢুকে পিন্টু মাঠ আর জঙ্গলকে চোখের সামনে রেখে অনুমান করে নিল ঠিক কোনখানে ক্রিকেট বলটা থাকতে পারে। আর তার অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে ওই বুনো টগরগাছের কাছেপিঠে কোথাও কিংবা সামান্য দূরেটুরে বলটা থাকার কথা। পিন্টু চারপাশ দেখতে-দেখতে সবে যখন কিছুটা এগিয়েছে, তখনই কী যেন একটা দুদ্দাড় করে ছুটে এল তার কাছে। কোনও বন্য জন্তুটন্তু হবে ভেবে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে পিন্টু দৌড়ে পালিয়ে যাবে ভাবছে, কিন্তু ভীষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। জিনিসটা

আর কিছুই নয়, একটি বছর আটেকের ফরসা ফুটফুটে ছেলে। চেহারা, জামাকাপড় দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, ছেলেটি সম্পন্নঘরের এবং শহরের বাসিন্দা। সে এ সময় জঙ্গলে এবং ওকে এত ভয়ার্ত দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে, ভীষণ কোনও ভয় ওকে পিছনে তাড়া করে আসছে।

ছেলেটি আঁকড়ে ধরল পিন্টুকে। কোনও কথা বলতে পারল না। কোনও কথা বলার অবস্থাতেও সে নেই।

অনেকটা পথ বুঝি দৌড়ে এসেছে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। হাঁপাচ্ছে। বারেবারে ভয়চকিত চোখে পিছনের দিকে তাকাচ্ছে।

পিন্টু বলল, "কী, কী হয়েছে তোমার? কী দেখছ অমন করে?"

ছেলেটি কোনও মতে বলল, "ওই যে ওরা! ওরা!"

"ওরা কারা?"

"দু'জন খারাপ লোক। এখনই এসে পড়বে। ওরা আমাকে ধরবে। আমি পালিয়ে এসেছি। ওরা ছেলেধরা। আমি ওদের সঙ্গে কখনওই যাব না। না, না, না।" ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

পিন্টু বুঝল দু'জন খারাপ লোকের, সম্ভবত অপহরণকারীর পাল্লায় পড়েছে ছেলেটি, তাই এত ভয়। ওদের কবল থেকে কোনও মতে পালিয়ে এসে এখন পিন্টুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে।

পিন্টু বলল, "ওরা, যাদের কথা বলছ, তাদের চেনো তুমি?"

"না। আমি পার্কে খেলছিলাম, ওরা আমাকে ডেকে বলল, ম্যাজিক দেখাবে। আমাকে সাইকেলে চড়িয়ে ওদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর বলল, আমাকে ধরে রাখবে। বাবা আর দাদু ওদের অনেক টাকা দিলে ছেড়ে দেবে।"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট হল পিন্টুর কাছে। ছেলেটিকে সম্ভবত অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সে বাচ্চা ছেলে হলেও মোটামুটি চালাকচতুর। কোনও মতে ছুটে পালিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। ছেলেটির কথামতো তাকে সাইকেলে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এরা কেমনধারা অপহরণকারী, যারা অপহৃতকে সাধারণ সাইকেলে করে নিয়ে যায়! মোটরগাড়ি না হোক, অন্তত একটা মোটর সাইকেলও তো থাকবে! বোঝা যাচ্ছে অপহরণকারীর দলটা নিতান্ত চুনোপুঁটির দল। দলে লোকলশকরও কম। ছেলেটির কথামতো মাত্র দু'জন। ছেলেটিকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ আদায় করা ওদের মতলব। বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে কিংবা ফোন করে জানিয়ে দেবে, অমুককে ফিরে পেতে হলে কোথায়, কখন কত টাকা দিয়ে আসতে হবে। সাবধান করে দেবে যে, অপহরণের কথা পুলিশকে জানালে অপহৃতের জীবনসংশয় হবে।

সে যাই হোক, অপহরণকারীরা যেমনই লোক হোক, একজন অথবা দু'জন হোক, পিন্টুর মতো অল্পবয়সি ছেলে ওদের মোকাবিলা করতে পারবে না। পিন্টুর বন্ধুদেরও এই মুহূর্তে খবর দেওয়া সম্ভব নয়। ওরা সকলেই মাঠে আছে। এখন একমাত্র করণীয় হল, আর একটুও দেরি না করে ছেলেটিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়া, যাতে ওরা দেখতে না পায়।

"এখনই ওরা এসে পড়তে পারে। চলো, আমরা কোথাও লুকিয়ে পড়ি। গাছেও উঠে পড়া যায়। কিন্তু মনে হয়

তুমি গাছে চড়তে পারবে না।"

ছেলেটি বলল, "খুব পারব। বাড়িতে পেয়ারাগাছ আছে, খুব চড়ি।"

"সে তো তোমাদের বাড়ির পেয়ারাগাছ। ছোট গাছ। এখানে তো বড়-বড় গাছ। ছোট গাছে চড়া ঠিক হবে না। বড় গাছে চড়তে হবে। দেখা যাক কী করা যায়। কী নাম তোমার?"

"মুন্না।"

"শিলিগুড়িতে থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। সব কথা পরে শোনা যাবে। এখন আমার সঙ্গে চটপট চলে এসো। খুব সাবধান, একটুও শব্দ করবে না কিন্তু!"

ক্রিকেট খেলা আর বল খোঁজা মাথায় উঠল। মুন্নাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের অনেক ভিতরে চলে গেল পিন্টু। এখানে অনেক গাছ, জঙ্গল অনেক ঘন। বড়-বড় গাছ গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা বেশ অন্ধকারও। এখানে গা-ঢাকা দিলে মনে হয় না অপহরণকারীরা সহজে ওদের দেখতে পাবে। পিন্টু গাছগুলোর দিকে তাকাল। সোজা উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এসব গাছে মুন্না কেন, পিন্টুই উঠতে পারবে না। তখনই একটু দূরে কী একটা শব্দ হল। মুন্নার হাত শক্ত করে ধরে পিন্টু একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল। কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শব্দটা কিন্তু আর হল না। যে দু'টো লোকের কথা মুন্না বলেছিল, তাদের কাউকে জঙ্গলে দেখা গেল না। ওরা জঙ্গলে ঢুকছে কি না তাও বোঝা গেল না। পিন্টু কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন দিকটা দেখল। আর পিছনে তাকিয়েই দেখল, একটু দূরেই জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়েছে। আর সেখানে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দু'টো সাইকেলের পিছনটা দেখা যাচ্ছে। তার মানে ওখানে সাইকেল রেখে লোক দু'টো জঙ্গলে ঢুকেছে।

মুন্নার কানের কাছে মুখ এনে পিন্টু ফিসফিস করে বলল, "ওই যে, ওই দ্যাখো, দু'টো সাইকেল।"

সাইকেল দু'টো মুন্না চিনতে পারল। উত্তেজিত গলায় বলল, "ওই তো ওদের সাইকেল। ওরা ওই সাইকেলে বসিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল।"

সাইকেল দেখেই পিন্টুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "ঠিক আছে। ওদের জিনিস দিয়ে ওদের জব্দ করা যাবে। সাইকেলে তোমাকে নিয়ে আমি শাঁইশাঁই করে চালিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দেব। ওরা টেরও পাবে না। জঙ্গলে বোকার মতো তোমাকে খুঁজবে। জোরসে চালাব। জানো তো, স্পোর্টসে সাইকেল রেসে আমি প্রত্যেকবার ফার্স্ট হই।"

ছোট হলেও মুন্নার সাহস আছে। ওর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল উত্তেজনায়। যেন একটা অ্যাডভেঞ্চারের খেলা পেয়ে গিয়েছে।

"তাই চলো। ওদের সাইকেলেই ওদের কাছ থেকে পালাই।"

॥ ৪ ॥

এদিকে পিন্টু তো বল আনতে গিয়েছে জঙ্গলে। তা অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল জঙ্গলে ঢুকেছে। কী ব্যাপার, এখনও আসছে না কেন! দেবু মাঠ থেকে হাঁক দিল, "এই পিন্টু, কী হল রে? বল পেলি?"

পিন্টুর কোনও উত্তর শোনা গেল না। দেবুর পরে বাপ্পাও ডাকল। তবু পিন্টুর দিক থেকে কোনও উত্তর শোনা গেল না। এবার সকলেই একটু অবাক হল। ওই তো একটুখানি ছোটমোটো জঙ্গল। কিছু বড়-বড় গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, এই যা। জঙ্গল বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাও না। বলটা খুঁজে পেতে তো এত সময় লাগার কথা নয়। আর বলটা না পেলেও পিন্টুই বা জবাব দিচ্ছে না কেন! এমন তো নয় যে, বলটা এক মাইল, আধ মাইল দূরে কোথাও চলে গিয়েছে। এই কাছেই জঙ্গলে বলটাকে যেতে দেখেছে সকলেই।

ছোট্টু বলল, "বলটা খুঁজতে এত সময় লাগছে কেন? টকটকে লাল রঙের ক্রিকেট বল। খুঁজে পাওয়া তো খুব সোজা।"

মনা বলল, "আর বোকাটা চুপ করেই বা আছে কেন! বলটা পেলি কি না পেলি, বলবি তো! নাকি খুঁজতে-খুঁজতে জঙ্গলের আরও ভিতরে ঢুকে গিয়েছে বোকাটা!"

বাপ্পা বলল, "আর-একটু দেখি। এর মধ্যে পিন্টু না এলে আমরাই ওকে খুঁজতে জঙ্গলে যাব।"

কিন্তু আর-একটু দেখার পরও পিন্টুর দেখা মিলল না। মাঠ থেকে আবারও চিৎকার করে ডাকা হল। যথারীতি কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেল সকলেই। ১৫ থেকে ২০ মিনিটেরও বেশি সময় হয়ে গেল। না পিন্টু, না বল, কোনও কিছুরই চিহ্ন দেখা গেল না। ছেলেদের মধ্যে ছোট্টুই একটু ডাকাবুকো। সে বলল, "আমরাই বা চুপ করে আছি কেন? চল, জঙ্গলে গিয়ে দেখে আসি, পিন্টুর এত দেরি হচ্ছে কেন!"

ক্রিকেট খেলা শিকেয় উঠল। সকলে মিলে চলল জঙ্গলে ব্যাপারটা দেখতে। ঠিক যে জায়গা দিয়ে ছোট্টুর ওভার বাউন্ডারির বলটা জঙ্গলে ঢুকেছিল, সেদিক বরাবর জঙ্গলে ঢুকল। ঢুকেই বোঝা গেল, যতটা ছোট আর নিরীহ মনে করা হয়েছিল, জঙ্গলটা সেরকম নয়। বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিশাল-বিশাল গাছগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। শাল, সেগুন, জারুল, অর্জুন, বট, অশ্বত্থ। সব গাছ ওরা চেনেও না। গাছও যেমন আছে, আগাছার ঝোপঝাড়ও তেমনই আছে। জঙ্গলের মধ্যে ছায়া-ছায়া অন্ধকার দিনের বেলাকেই বিকেলবেলা করে রেখেছে। নির্জন, নিস্তব্ধ। ঝিঁঝিপোকার একটানা ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। এতক্ষণ ছেলেরা যেটুকু কথা বলাবলি করছিল, এখন তাও থেমে গিয়েছে। চুপ করে আছে সকলেই। শীতের দুপুর, রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। যেটুকু বা আছে, তাও অনেক গাছের ছড়ানো ডালপাতার ফাঁক গলে মাটিতে আসতে-আসতেই কম হয়ে যাচ্ছে। একটু আগে খোলামেলা সবুজ মাঠে সূর্যের রোদ্দুরে ওরা যে খেলছিল, সেকথা তখন কারও মনে নেই। জঙ্গলের নিস্তব্ধ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার-অন্ধকার পরিবেশে এসে মনে হচ্ছিল, যেন অন্য কোনও অচেনা জগতে চলে এসেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, পিন্টু কোথায়? বল যদি খুঁজে না-ই পায়, তা হলে চলে আসছে না কেন? অনেক গাছের ঠাসা ভিড় আর আলো কম হলেও এমন নয় যে, দেখা যাচ্ছে না কিছুই। বলটা তো এসব জায়গাতেই খুঁজে পাওয়ার কথা। তা হলে পিন্টুরও এখানে বা কাছেপিঠে কোথাও থাকার কথা। কিন্তু কোথাও

গল্প

তাকে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কী জঙ্গলের অনেক ভিতরে ঢুকে গিয়েছে? সামান্য একটা বলের জন্য! কিন্তু কেন?

গোপাল দু' হাত মুখের সামনে এনে চোঙার মতো করে হাঁক পাড়ল, "পিন্টু, এই পিন্টু, তুই কোথায়?"

জঙ্গল যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। কোনও সাড়াশব্দই এল না। নিস্তব্ধ জঙ্গলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গোপালের ডাকটাই ফেরত এল শুধু।

গোপালের পর দেবু ডাকল, "পিন্টু, আমরা এখানে, জঙ্গলে। তোর কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন? উত্তর দে।"

অবস্থার কোনও ইতরবিশেষ হল না। পিন্টুর কোনও সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত বনভূমি থমথম করে উঠল ছেলেদের চোখের সামনে।

তখনই মনা আঙুল তুলে দেখাল বাঁ দিকের ঝোপটার দিকে, "ওই তো বলটা। ওই তো দেখা যাচ্ছে।"

সেদিকে তাকিয়ে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। সত্যিই তো, ঝোপটার নীচে সামান্য একটু ভিতরে লাল রঙের বলটা পড়ে আছে। এমন জায়গায় আছে যে, তন্নতন্ন করে আতালিপাতালি খোঁজারও দরকার হয় না। একটু এদিক-ওদিক ভাল করে দেখলেই বলটা চোখে পড়ার কথা। এমনও নয় যে, বলটা ঝোপঝাড়ের অনেক ভিতরে ঢুকে আছে। সহজে চোখে পড়বে না। তা ছাড়া একটা ক্রিকেট খেলার বলের টকটকে লাল রং অন্য কোনও রঙের সঙ্গে মিশেও থাকে না যে, চট করে আলাদা করে দেখা যায় না। অথচ বলটা আছে, পিন্টু নেই।

গোপাল এগিয়ে গিয়ে বলটা হাতে তুলে নিল। বলটা দেখতে-দেখতে বলল, "এই তো আমাদের বলটাই।"

দেবু বলল, "এই ছোট্টু, এখন কী করবি? পিন্টুর তো কোনও পাত্তাই নেই।"

ছোট্টু বলল, "তাই তো ভাবছি। জঙ্গলে এসে উবে গেল নাকি!"

কী করবে ভাবছে সকলে। তখনই জঙ্গলের ভিতর থেকে দু'জন লোককে ছেলেদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। একজন বলল, "অ্যাই ছেলেরা, বলি হচ্ছেটা কী এখানে?"

অন্যজন বলল, "কেউ এক পা নড়বে না এখান থেকে। আমি অর্ডার দিচ্ছি।"

প্রথমজন বলল, "আমি হচ্ছি লিডার। অর্ডারটা আমিই দিচ্ছি, হল্ট।"

॥ ৫ ॥

দু'টো লোকের মধ্যে একজন ঢ্যাঙা, সিড়িঙ্গে চেহারার, রং কালো, লম্বাটে মুখ, একমাথা বড়-বড় চুল। অন্যজন লম্বায় কম, গোল মুখ, রং ততটা কালো নয়, মাথায় অল্প চুল। একজনের সঙ্গে অন্যজনের চেহারার কোনও মিল নেই। শুধু বয়সটাই কাছাকাছি, এই যা। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। কিন্তু চেহারায় মিল না থাকলেও চালচলনে যথেষ্ট মিল আছে। দু'জনেই চোখ-মুখ এমন করে আছে, যাতে ওদের দেখলেই কুচক্রী, দুষ্কৃতী বলে মনে হয়। হঠাৎ ওদের দেখলে মনে হতে পারে, ছেলেদের ভয় দেখানোর জন্য ওরা ইচ্ছে করেই চোখে-মুখে এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলছে।

লম্বা মুখের লোকটা হুঙ্কার দিয়ে ছেলেদের বলল, "কী হল, কথাটা কানে যাচ্ছে না বুঝি? বললাম না হল্ট।"

ছোট্টু বলল, "আমরা তো হল্ট হয়েই আছি।"

গোলমুখ লোকটা বলল, "এই কাল্লু, তুই ঠিক কথা বলিসনি। কথাটা হবে খামোশ।"

লম্বামুখো, যার নাম কিনা কাল্লু, সে বলল, "কথাটা মুখ ফস্‌কে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছে লাল্লু। ঠিক আছে, আমি অর্ডার দিচ্ছি, খামোশ।"

এবারও ছোট্টু বলল, "আমরা তো খামোশ হয়েই আছি। কিছু বলছি না তো!"

কাল্লু এবার ছোট্টুর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "খুব মুখে-মুখে তর্ক করা শিখেছ, তাই না? বলি তোমরা এই সময় জঙ্গলে কেন? মতলবটা কী?"

দেবু বলল, "বল খুঁজতে এসেছি।"

গোলমুখো, যার নাম লাল্লু, সে বলল, "খুব গুলতাপ্পি মারতে শিখেছ দেখছি। বিশ্বসংসারে এত জায়গা থাকতে জঙ্গলে এসেছ বল খুঁজতে? কেন, বাড়িতে, রাস্তার ধারে..."

কাল্লু যোগ করল, "খেলার মাঠে কিংবা ঘরের মধ্যে..."

লাল্লু বলল, "ইশকুলে কিংবা আঁস্তাকুড়ে বলটা খুঁজতে কী হয়েছিল? ভাবছ আমরা কিছু বুঝি না! সত্যি কথা বলো। নইলে..." বলেই সে কাল্লুর দিকে তাকাল, "নইলে কী করা হবে রে কাল্লু?"

কাল্লু একটু ভেবে নিয়ে বলল, "সে অনেক কিছুই করা হবে। পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে। আপাতত ওদের বলে দে, নইলে গুলি করে সব ক'টাকে খতম করে দেওয়া হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ক'টাকে গুলি করে..." বলেই থেমে গেল লাল্লু। কাল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কী দিয়ে গুলি করব। আমাদের কাছে বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল, কামান, কিছুই তো নেই। তোকে কতবার বললাম, নিদেনপক্ষে একটা ধারাল ছোরা সঙ্গে রাখতে। এমনকী একটা ছুরি। এসব কাজে ওগুলো লাগে। তো নিয়ে এসেছিস একটা ব্লেড। তাও পুরনো, জংধরা।"

লোক দু'টোকে দেখে প্রথমে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল ছেলেরা। কিন্তু ওদের হাবভাব, রকমসকম দেখে ভয়টা কেটে গিয়েছে। ছোট্টু তো ফিক করে হেসেই ফেলল।

ছোট্টুর হাসি দেখে কাল্লু আর লাল্লুর কী রাগ, কী রাগ! কাল্লু চোখ পাকিয়ে বলল, "অ্যাই, অ্যাই, এত হাসি কীসের রে? আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছ না? ভয়ে বুক কাঁপছে না? হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে না?"

লাল্লু বলল, "বাপ-ঠাকুরদার নাম ভুলে যাচ্ছ না? আমাদের যতটা সহজ ভাবছ, ততটা সহজ নই। দু'জনেই খুব সাংঘাতিক ক্রিমিনাল, পয়লা নম্বর খুনে গুন্ডা, কুখ্যাত। এই কাল্লু, 'কুখ্যাত...' কি বলা যায় রে?"

কাল্লু বলল, "কুখ্যাত সমাজবিরোধী, মাফিয়া ডন।"

লাল্লু বলল, "শুধু তাই নয়, বর্তমানে আমরা নিষ্ঠুর কিডন্যাপার। আমাদের দয়া নেই, মায়া নেই, রাগ নেই। না, না, রাগ আছে। প্রচণ্ড রাগ আছে। আমাদের শুধু টাকা চাই, তাই কিডন্যাপ করি। এই তো শিলিগুড়ির ব্যবসাদার গঙ্গাপ্রসাদের নাতি মুন্নাকে অপহরণ করে..." বলেই জিভ কাটল, "এই যাঃ! টপ সিক্রেটটা মনের ভুলে বলে ফেললাম! এখন কী হবে রে কাল্লু?"

কাল্লু বলল, "কিস্‌সু হবে না। কথাটা উইথড্র করে নে, তা হলেই টপ সিক্রেটটা

সিক্রেটই থাকবে। কেমন বুদ্ধিটা বাতলে দিলাম বলদিকিনি।"

লাল্লু বলল, "দারুণ বুদ্ধি তোর। একেবারে ঠিক কথাটা বলেছিস। এই যে ছেলেরা, শোনো, আমরা দু'জন যে মুক্তিপণের টাকার জন্য গঙ্গাপ্রসাদের নাতি মুন্নাকে অপহরণ করেছি, কথাটা উইথড্র করে নিচ্ছি।"

কাল্লু বলল, "কার নাতিকে কীসের জন্য অপহরণ করেছি, একথা আমরা বলিনি। বলেছি যে, তার কোনও প্রমাণও নেই। এখন প্রাণে বাঁচতে চাও তো আমাদের কথার জবাব দাও।"

বাপ্পা বলল, "বললামই তো, বল খুঁজতে এসেছি। বলটা অবশ্য পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমাদের এক বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

বাপ্পার কথা শুনে লাল্লু প্রথমে খিকখিক করে, তারপরে খ্যাকখ্যাক করে, শেষে হো-হো করে হেসে উঠল। লাল্লুর দেখাদেখি কাল্লুও হাসতে শুরু করল। হাসতে-হাসতে দু'জনেই পেটে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। একটু পরে দু'জনের চোখ-মুখ প্রথমে হলুদ, তারপরে বেগুনি, তারপরে লাল হয়ে গেল। তবু অনর্গল হাসি থামল না। মনে হল, এখনই দু'জনে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই দেখে ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। প্রথমে ভয় পেলেও এখন দেখা গেল, কাল্লু আর লাল্লু দু'জনেই বেজায় মজার মানুষ। কিন্তু এখন ওদের অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়ে গেল সকলেই। প্রাণান্তকর হাসতে-হাসতে ওরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তো হরিষে বিষাদ হয়ে যাবে। বোঝা গেল না বাপ্পার কথায় ওদের হাসির কী আছে!

কিন্তু ওদের কিছুই হল না। একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে লাল্লু কটমট করে কাল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যাই কাল্লু, হাসছিস যে বড়?"

কাল্লুও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুই হাসছিস কেন?"

লাল্লু বলল, "আমার হাসি পেয়েছিল তাই হাসছিলাম।"

কাল্লু বলল, "তোকে হাসতে দেখে বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোনও হাসির কারণ আছে, তাই আমিও হাসলাম। এখন বলদিকিনি, তুই হাসছিলি কেন?"

লাল্লু বলল, "হাসব না? এরা প্রথমে বলল, বল খুঁজতে এসেছে। আমাদের দেখে ভেবড়ে গিয়ে এখন বলে কিনা, কোনও এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে। আমরা হচ্ছি নাম্বার ওয়ান ধুরন্ধর লোক। আমাদের বোকা বানানো কী অতটা সহজ? আরে বন্ধু কী একটা এক টাকার কয়েন, যে হাত থেকে পড়ে হারিয়ে যাবে? নাকি একটা মারবেল যে, গড়িয়ে চলে যাবে কোনও কোনায়, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুই বল কাল্লু, এর চেয়ে ভূ-ভারতে হাসির কথা আর কী আছে?"

কাল্লু বলল, "আর হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে এই বনবাদাড়ে? কেন, এটা কী খাটের তলা, না আলমারির পিছন যে, বন্ধু 'টুকি' বলে লুকিয়ে থাকবে। এই যে ছেলেরা, তোমরা কি আমাদের হাঁদাবাবু পেয়েছ, যে যা বোঝাবে তাই বুঝব? হুঁ হুঁ বাবা, আমরা বহুত সেয়ানা পার্টি আছি। আমাদের বোকা বানানো অত সোজা নয়। আমরা ডেঞ্জারাস লোক, যা খুশি তাই করতে পারি, বুঝেছ।"

লাল্লু ছেলেদের মুখে ফের হাসি দেখে বলল, "অ্যাই, অ্যাই, মুখে হাসি কেন? তোমাদের প্রাণে ভয়ডর নেই? দুই জলজ্যান্ত নটোরিয়াস লোককে দেখে ভয় করছে না? কী বোকা রে বাবা!"

তখন ছেলেদের মাথায় পিন্টুর চিন্তা কিংবা ভয়টয় কিছু ছিল না। ওরা হাসিমুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ কিনা একটুও ভয় করছে না।

কাল্লু বলল, "বটে! ভয় পাবে না মানে! মামদোবাজি নাকি? জানো, আমরা মশা-মাছি মারার মতো যখন-তখন খুন করি। হাসতে-হাসতে চাক্কু চালিয়ে যে-কোনও লোকের পেট ফাঁসিয়ে দিই। সিনেমার গব্বর সিংহ তো আমাদের কাছে নেহাত শিশু। আমাদের নাম শুনলে পালিয়ে কূল পায় না। কী, এখনও ভয় করছে না?"

সত্যিই কিন্তু কেউ তো ভয় পাচ্ছিলই না, উলটে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে যাচ্ছিল। ওদের প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল পিন্টুকে খুঁজে না পাওয়ার পিছনে লোক দু'টোর কারসাজি থাকতে পারে। কিন্তু এখন সন্দেহ চলে গিয়েছে। পিন্টুর মতো সাহসী ছেলেকে কোনও প্যাঁচে ফেলা এদের কম্ম নয়। লোক দু'টোর আর যাই হোক, কোনও অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা নেই। তবু ওদের মন এবং মান রক্ষার

জন্য ছোট্টু বলল, "হ্যাঁ গো, এখন একটু ভয় করছে। আবার চিন্তাও হচ্ছে।"

লাল্লু বলল, "কেন, কেন, চিন্তা হচ্ছে কেন?"

দেবু বলল, "চিন্তা হবে না! বন্ধুর কী হল, কোথায় গেল, এসব তো মহাচিন্তার ব্যাপার।"

লাল্লু, কাল্লু সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, "তা একটু চিন্তার ব্যাপারই বটে! ঘটনা তো একই। তোমরা বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছ না, আর আমরা যাকে অপহরণ করলাম, সেই মুন্নাকে..."

"এই যা! আবার ভুল করে ভিতরের কথা বলে ফেললাম! কী রে কাল্লু, এবারও কথাটা উইথড্র করে নেব?"

কাল্লু বলল, "দরকার নেই। শিকার তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। তা ছাড়া বারবার উইথড্র করলে প্রেসটিজ পাংচার হয়। বরং ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক, কোনও হালহদিশ পাওয়া যায় কি না। এই যে ছেলেরা, তোমরা এই

জঙ্গলে একটা ছেলেকে, তোমাদের চেয়ে একটু ছোট...”

লাল্লু বলল, “একটু ছোট না, অনেকটাই ছোট হবে। তবে বিচ্ছু ছেলে। আমার হাতে দাঁত দিয়ে এমন কামড় দিয়েছে! এই দ্যাখো!” বলে লাল্লু প্রথমে বাঁ হাত তুলে, তারপর ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে, ডান হাতটা তুলে ছেলেদের দেখাল।

দেখা গেল, ওর হাতে সত্যি দাঁতের দাগ বসে গিয়েছে। মুন্না বলে আট বছরের ছেলেটি মোক্ষম কামড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

কাল্লু আবার বলল, “হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বয়সে তোমাদের চেয়ে ছোট, ফরসা গায়ের রং...”

লাল্লু বলল, “ততটা ফরসা অবশ্য নয়।”

কাল্লু বলল, “হাইট এই সাড়ে চার...”

লাল্লু বলল, “না, না, সাড়ে চারের কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে।”

কাল্লু বলল, “গায়ে লাল জামা...”

লাল্লু বলল, “ঠিক লাল নয়, লালচে।”

কাল্লু কড়া চোখে লাল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি লিডার, তুই হলি চামচা। লিডারের কথার মধ্যে বাগড়া দিলে দল থেকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেব।”

লাল্লু কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে রইল। কাল্লু খুশি হয়ে বলল, “গুড। জেনারেলের সামনে সব সময় এইভাবে অ্যাটেনশন হয়ে থাকবি, তবেই না ফৌজি জোয়ান! শোনো খোকারা...”

গোপাল অমনই বলে উঠল, “এখানে খোকা বলে কেউ নেই। সকলেই খোকার দাদা। টিম ইন্ডিয়া।”

কাল্লু বলল, “টিম ইন্ডিয়া? সেটা আবার কী জিনিস?”

মনা বলল, “সে তোমরা বুঝবে না। বিরাট ব্যাপার সব। এখন কী বলছিলে, তাই বলো।”

কাল্লু বলল, “কী বলছিলাম? তাই তো, কী বলছিলাম? এই লাল্লু, কী বলছিলাম রে?”

লাল্লু বলল, “মুন্নার কথা।”

কাল্লু বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুন্নার কথা। মুন্না নামে একটি ছেলে, কালোও নয়, আবার ফরসাও নয়, লম্বাও নয়, আবার বেঁটেও নয়, এই রকম ছেলেকে জঙ্গলে দেখেছ কি না তাই বলো। বললে ভাল, না বললে...”

লাল্লু বলল, “না বললে...”

দেবু তেরিয়া গলায় বলল, “না বললে কী করবে শুনি?”

লাল্লু বলল, “না বললে কী করব? সেটা যখন করব তখনই বুঝবে। মোট কথা যা করব, তা কোনও দিন শোনোনি, ভাবোনি।

“সে এক ভয়াবহ ঘটনা, শরীরের রক্ত-জল করা ব্যাপার। মুক্তিপণের লক্ষ-লক্ষ টাকা আমরা অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই।”

কাল্লু বলল, “লক্ষ-লক্ষ টাকা নয়,

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি।
১৫ টাকা

মহাশ্বেতা দেবীর আশ্চর্য বই
তুতুল ২৫ টাকা

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
১৫ টাকা
লেখকের আরেকটি বই **চড়ুইয়ের সঙ্গে** ১৫ টাকা

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি
৩০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। চতুর্থ মুদ্রণ। ৪০ টাকা
'গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'—মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল।

পাগল করা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
৪৫ টাকা

শাদা ঘোড়া
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনূদিত হচ্ছে। **১৫ টাকা**

ঋষিকুমার
ডাকাত, ছেলেধরা, বেদে, বাঁশিওয়ালার সঙ্গে নানা রোমাঞ্চকর অভিযান।
২০ টাকা

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। **৪০ টাকা**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের নতুন বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প। ৫০ টাকা

লেখকের ছোটদের আরও বই
পাখির খাতা ২০ টাকা টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ১৫ টাকা
তালগাছের ডোঙা ২০ টাকা আমার বনবাস ১২ টাকা
হরিণের সঙ্গে খেলা ১৫ টাকা

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট) ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন

কমপক্ষে ২০০ টাকার বইয়ের অর্ডার দিলে আমাদের খরচে আপনার ঠিকানায় বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টাকা পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

হাজার-হাজার টাকা। লাল্লু, তুই না একটা বোকারাম আছিস।"

লাল্লু রেগে গিয়ে বলল, "আমি বোকারাম হলে তুই হলি বোকারাবণ।"

ওদের কথাবার্তা শুনে ছেলেরা শব্দ করে হেসে উঠল। আর তাই না দেখে কাল্লু গর্জন করে উঠল, "অ্যাই বেয়াদব ছেলেরা, তোমরা হাসছ কেন? আমরা কি একটা হাসির সিনেমা, যে দেখলেই হাসতে হবে?"

লাল্লু বলল, "নাকি একটা হাসির গল্পের বই, যে পড়লেই ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে হবে?"

কাল্লু বলল, "রেগে গেলে আমরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারি, জানো?"

লাল্লু বলল, "শুধু রক্তগঙ্গা নয়, রক্তযমুনা, এমনকী রক্তব্রহ্মপুত্রও বইয়ে দিতে পারি। মুন্নাকে তোমরাই লুকিয়ে রেখেছ। কোথায় রেখেছ বলো? আমি তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গে বলতে হবে। শুরু করছি, এক..."

ছেলেরা তবু নিরুত্তর। কোনও ছেলের মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই।

লাল্লু গম্ভীর মুখে বলল, "দুই।"

তথাপি তখনও সবাই চুপ।

দুই হয়ে গিয়েছে। এবার লাল্লু হুঙ্কার দিল, "আড়াই।"

সবাই চুপ। যেন ওদের নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে।

লাল্লু বলল, "পৌনে তিন।"

তখনই পিছনের ঝোপ থেকে কেউ বেরিয়ে এসে বলল, "মুন্নার খবর ওরা জানে না। আমি জানি। খবরদার, দু'জনের কেউ এক পা-ও নড়ার চেষ্টা করবে না। চেষ্টা করলে আমি কথা বলব না, কথা বলবে আমার হাতে ধরা এই রিভলভার, গুড়ুম।"

সকলেই অবাক হয়ে দেখল, কাল্লু ও লাল্লুর দিকে রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন থানার নতুন বড়দারোগা। তার আশপাশে চারজন সশস্ত্র পুলিশ।

দারোগাকে এবং অন্য পুলিশকে ওইভাবে দেখে কাল্লু আর লাল্লুর ওইখানেই খেল খতম, জারিজুরি সব শেষ। ওদের দেখে মনে হল, নিজেদের নড়বড়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছে না। এখনই কাটা গাছের মতো সটান মাটিতে পড়ে যাবে। তবু ওর মধ্যে কোনওমতে সাহস সঞ্চয় করে কাল্লু মিনমিন করে বলল, "আমরা তো এই জঙ্গলের শোভা দেখতে এসেছি দারোগাসাহেব। কী সুন্দর সব গাছ, কী সুন্দর সব ফুল, কী সুন্দর শোভা! আহা-আহা, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

লাল্লু বলল, "তা ছাড়া আমরা খুব ভাল লোক। আমরা ভাজা মাছটি পর্যন্ত উলটে খেতে জানি। তাই না রে কাল্লু?"

কাল্লু বলল, "হ্যাঁ রে লাল্লু। আমাদের মধ্যে কোনও বদ মতলব নেই। কোনওদিন ছিল না, এখনও নেই।"

লাল্লু বলল, "আমরা কাউকে অপহরণটরন... এই যা! মুখ ফসকে আবার কথা বেরিয়ে গেল। এখন কী হবে! কথাটা উইথড্র করে নেব না কী রে কাল্লু?"

কাল্লু বলল, "লাভ হবে বলে মনে হয় না। শুনেছি নতুন দারোগা কানে কম শোনেন। তার চেয়ে বরং আমরা ফিরে যাই চল। ময়নাগুড়িতে অষ্ট প্রহর হরিসংকীর্তন হচ্ছে। চল, সংকীর্তন শুনি গে।"

নতুন দারোগা বললেন, "এই, তোমরা এদিক-ওদিক দেখছ কী? কেটে পড়ার তাল, না? সোজা তাকাও। পায়ের মতো চোখের পাতারও কোনও মুভমেন্ট থাকবে না। এখনই তোমাদের হ্যান্ডক্যাপ পরিয়ে থানার লকআপে পুরে দেওয়া হবে, বুঝলে বাছাধনরা।"

কাল্লু আর লাল্লুর মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। কাল্লু বলল, "আমরা কিছু করিনি দারোগাসাহেব।"

নতুন দারোগা গর্জে উঠলেন, "অ্যাই বদমাইশরা, চোপ। একদম চোপ। তোমরা কী করেছ না করেছ, সব কথা মুন্না থানায় গিয়ে আমাকে বলেছে। মুন্নাকে নিয়ে ঘুরপথে তোমাদেরই সাইকেল চালিয়ে থানায় গিয়েছিল এই পিন্টু।"

লাল্লু বলল, "অ্যাঁ? আমাদের সাইকেল চালিয়ে আমাদেরই ধরিয়ে দিয়েছে। তার মানে যার শিল যার নোড়া, তারপরে কী যেন? এই কাল্লু, বল না!"

কাল্লু মাটিতে বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে হতাশ গলায় বলল, "তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।"

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

পঞ্চসায়র শিশুনিকেতন

(কলকাতা)

আমাদের স্কুল

আমাদের স্কুল তৈরি হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২ জানুয়ারি। পঞ্চসায়র অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। নার্সারি ও প্রাথমিক বিভাগ শিশুনিকেতন এবং মাধ্যমিক বিভাগ শিক্ষানিকেতন নামে পরিচিত। দু'টি বিভাগের জন্যই সুন্দর খেলার মাঠসহ দু'টি আলাদা বাড়ি আছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১,২০০। মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষানিকেতনের ফলাফল যথেষ্ট ভাল।

জ্যোতিমা মুখোপাধ্যায় ও প্রমিতা দে সরকার
চতুর্থ শ্রেণি

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেতে উঠি আমরা

আমাদের স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হলেও সবচেয়ে মজা হয় শিক্ষক দিবসে। কারণ, এই অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীরাই পরিচালনা করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ রঙিন কাগজ ও বেলুন দিয়ে সাজাই। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরা সামান্য উপহার দিই। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া ২৬ জানুয়ারি, ১৫ অগস্ট, সরস্বতী পুজো, রবীন্দ্রজয়ন্তী, শিশুদিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়।

জয়িতা মণ্ডল ও অর্পণ পঞ্চাধ্যায়ী
চতুর্থ শ্রেণি

শিক্ষামূলক ভ্রমণেও যাই

একটানা পড়াশোনার একঘেয়েমি থেকে মুক্তির আনন্দে মেতে ওঠার জন্য আমরা প্রতি বছর শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাই। এ ছাড়া সরস্বতী পুজোর দিন ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি ও হাতের কাজ নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে আয়োজিত বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতায় শিশুনিকেতনের কুশীলবরা সফল হয়ে নয়াদিল্লিতে জাতীয় বিজ্ঞান নাট্যমেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেখায় সমৃদ্ধ বিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা 'উদ্ভাস' প্রতি বছর প্রকাশিত হয়।

বিবৃতি সরকার ও অনিন্দিতা সেনগুপ্ত
চতুর্থ শ্রেণি

বৃক্ষরোপণ উৎসবও পালন করি

আমাদের স্কুল শুধু ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নয়, পরিবেশের প্রতিও যথেষ্ট সচেতন। প্রতি বছর আমরা বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করি। সবুজ গাছ এবং আমরা একসঙ্গেই বেড়ে উঠি। দিনে-দিনে ফুল যেমন ফোটে, তেমন করেই ফুটে উঠছি আমরা অর্থাৎ শিশুনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। আমাদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা জীবন গড়ার পথে এগিয়ে চলেছি। আমরা তাই গর্বিত।

বিজয়সখা ঘোষ
চতুর্থ শ্রেণি

বান্টির বন্ধুরা

অনুপ ঘোষাল

সেদিন বান্টি খুব কাঁদছিল। ভোর থেকে ঘোতনকে পাওয়া যাচ্ছে না! সাতসকালে ওইটুকু সময় ছাড়া বাড়ি থেকে তো বেরোয় না! গেল কোথায়? দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না কুকুরটা। একটা পা যে নেই! তিন পায়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। তবে বাড়ি পাহারা দেওয়ার কাজে চৌকস। রাতবিরেতে অচেনা মানুষ ঢুকতে দেখলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। দৌড়ে গিয়ে হয়তো আক্রমণ করতে পারে না, কিন্তু ঘোতনের নজর তীক্ষ্ণ, কান খাড়া। খুব সজাগ। বিপদের গন্ধ পেলে ঘেউ-ঘেউ শব্দে বাড়ির লোককে সাবধান করে দেবে ঠিক।

স্প্যানিয়েল বা স্পিৎজ-এর মতো আহ্লাদি নয়, ডোবারম্যান কিংবা অ্যালসেশিয়ানের মতো নয় দুর্ধর্ষও। ঘোতন একটা পা কাটা যাওয়া নেড়ি কুকুর। কিন্তু এক কান কাটা মানুষের মতো নির্লজ্জ নয়, বেইমান তো নয়ই। বাচ্চাটার একটা পা মোটর সাইকেলের চাকায় থেঁতলে যায়। রাস্তায় পড়ে চেঁচাচ্ছিল। কে যেন লেজ ধরে তাকে টেনে নর্দমার ধারে রেখে দিয়েছিল। তারপর মরে গেলে টান মেরে ফেলে দেওয়া হবে আরকি। বাচ্চাটা ঘাড় কাত করে কুঁইকুঁই করে কাঁদছিল। মৃত্যুর অপেক্ষা।

এ হল বছর দু'য়েক আগের ঘটনা। বান্টির তখন সবে ক্লাস থ্রি। গ্রামের বাড়ি থেকে বেড়াতে আসা ঠাকুরমার দেওয়া দশটা টাকার সদ্‌গতি তো করা চাই চটপট! তাই গিয়েছিল সামনের দোকানে চকোলেট কিনতে। পথের পাশে কুকুরছানাটাকে করুণ সুরে কাঁদতে দেখে ওর কেনাকাটা শিকেয় উঠল। বাচ্চাটাকে নিল কোলে তুলে। বাবার বন্ধু সুবিমল পালিত ডাক্তার। বাড়ির পাশেই ওঁর চেম্বার। তখন সেখানে ভরাট ভিড়। রোগীর লাইন অগ্রাহ্য করে বান্টি রক্তাক্ত ছানাটাকে বুকে আঁকড়ে সটান সুবিমলকাকুর চেম্বারে। উনি তো থ! বন্ধুকন্যার জামায় রক্তের দাগ। কোলে নোংরা এক কুকুরছানা। ততক্ষণে সেটা বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

প্রথমে যেন ডাক্তারবাবু বিরক্তই হলেন। স্বাভাবিক। উনি কি পশুচিকিৎসক? যাই হোক, বন্ধুর মেয়ে বলে কথা! তার আবদার রাখতে হয় বইকি!

গল্প

তিনি ভাল করে কুকুরের বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, সামনের বাঁ পা-টা একেবারে শেষ। গুঁড়িয়ে যাওয়া হাড়গুলো তো রাখা চলে না। অগত্যা প্রায় ঝুলতে থাকা পা-টা হাঁটু পর্যন্ত রেখে নীচের অংশটা অপারেশনের ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দিলেন সুবিমল। আশ্চর্য, বাচ্চাটা খুব একটা চেঁচাল না। কেমন যেন ঝিম মেরে আছে। ডাক্তার পালিত পায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটা অ্যামপুট করার সময় কী একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন বলেই কি?

পায়ের অংশটা বাদ দেওয়ার পর অ্যান্টিবায়োটিক লোশন দিয়ে ব্যান্ডেজ। আর, রক্তপাত বন্ধ এবং ক্ষত শুকনোর জন্য আরও দুটো ইঞ্জেকশন। কম্পাউন্ডার সত্যেনকে দিয়ে পশুদের জন্য তৈরি ক্যাপসুল কিনে আনিয়ে সাতদিন ধরে এবেলা-ওবেলা খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। এক ফাঁকে দৌড়ে গিয়ে মাকে ডেকে এনেছিল বান্টি। তাঁকে সব বুঝিয়ে দেওয়া হল।

পায়ের কিছুটা বাদ গেল বটে, কিন্তু কুকুরটা মরল না। ঘা গেল শুকিয়ে। প্রথম প্রথম একটু ঘায়েল মনে হচ্ছিল। খাওয়াদাওয়ায় উৎসাহ নেই। গরম দুধেও অরুচি। তারপর টেংরির ঝোল খেতে-খেতে মাসদুয়েকের মধ্যেই ঘোতন পুরো ফিট।

বান্টির বাবা অনুত্তম বসু কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেননি। মায়েরও কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওঁরা দু'জনেই তো শিক্ষক, মায়া-মমতা খুব। ভাল মানুষ। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে দু'জনে নিজেদের কলেজ যাওয়ার আগে কাজের মেয়েটিকে বলে যেতেন বারবার, বাচ্চাটার যেন অযত্ন না হয়!

অন্য কুকুরের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে ডাস্টবিনের খাবার কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই বাচ্চাটার। পথে বের করে দিলে কষ্ট হবে। অতএব নিতান্ত দেশি কুকুর হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক দম্পতির বাড়িতে ঘোতনের পাকাপাকি আশ্রয় জুটে গেল। বান্টিদের আদরযত্নে এখন তার চমৎকার স্বাস্থ্য। চানের সময় ডগসোপ ঘষে-ঘষে ঘোতনকে চকচকে করে ফেলেছে বান্টি। আর, রোজ বিকেলে কুকুরের জন্য স্পেশ্যাল পাউডার তো আছেই। এঁটুলি হয় না। এখন এমন তার জেল্লা, দেখলে দেশি কুকুর বলে বিশ্বাসই হয় না। তাগড়াই

স্বাস্থ্য। লালচে খয়েরি গায়ের রংটা যেন ঝিলিক দিচ্ছে। তার উপর সাদা ছোপগুলো যেন চন্দনের নকশা। দেশি কুকুর, অথচ কানদু'টো কী করে যেন একটু ঝুলে পড়ল। সেটা কি আহ্লাদে? লেজটা লোমে ফোলা, অনেকটা শেয়ালের মতো। অন্য দেশি কুকুরের পাশে ঘোতনকে মোটেই মানায় না। অনুত্তমবাবু জুওলজির অধ্যাপক। জীবজন্তু সম্পর্কে খুব অগ্রহ। তিনি বলেন, "আমাদের দেশি কুকুরের জাত খুব ভাল। দারুণ বুদ্ধিমান। যত্নআত্তি পেলে বিলিতি কুকুরকে টেক্কা দেবে।"

বাড়ির দুটো বাচ্চার মধ্যে খুব ভাব। স্কুল থেকে ফিরে ঘোতনের সঙ্গে বান্টির কত খেলা! বান্টির দু' পায়ে আর ঘোতনের তিন পায়ে বেতাল ছুটোছুটি। লুকোচুরির মজা।

আস্তে-আস্তে বড় হয়ে উঠছে দু'জনে। বান্টির এখন ক্লাস ফাইভ। ভারিক্কি ভাব। কিন্তু মা কোনও আবদার না রাখলে তৎক্ষণাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলাটাও তার জলভাত। আর ঘোতন তো দু' বছরেই সাবালক। ইয়া তাগড়া, গোটা শরীর চকচক করছে। বান্টি কিছুতেই ভেবে পায় না, সেদিন সকালে সামনের রাস্তা থেকে ঘোতনকে কুড়িয়ে না আনলে আজ কেমন করে কাটত তার বিকেল আর ছুটির দিনের দুপুরগুলো!

একবার বড়দিনের ছুটিতে বান্টি টাটানগরে মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে। বাবা ছিলেন বাড়িতে। ছিল কুকুরটাও। সে তো খোঁড়া পায়ে লম্বা ট্রেন জার্নির ধকল নিতে পারে না! কাজের মেয়ে মালতীর উপর ছিল কুকুরটার দেখাশোনার দায়িত্ব। ও মা, বাড়িতে বন্ধু নেই বলে ঘোতন খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিল প্রায়। ঝিম মেরে বসে থাকত। অধ্যাপক বসু ঘাবড়ে গিয়ে একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ঘোতনকে পরীক্ষা করে অবাক। জ্বরজ্বালা কিচ্ছু নেই। হজমের গোলমালও নয়। জিভ, চোখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। আন্দাজে কী ওষুধ দেবেন! বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষার পর একটা ভিটামিন ড্রপ আর ক্রিমির ওষুধ লিখে দিয়ে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন, অনুত্তম বসু বললেন, "কুকুরের কি মন খারাপ হয় ডাক্তারবাবু?"

পশুচিকিৎসক ভদ্রলোক বললেন, "হতেও পারে। এর ক্ষেত্রে কি তেমন কোনও কারণ ঘটেছে?"

তারপর বান্টির সঙ্গে ঘোতনের বন্ধুত্বের বিবরণ শুনে তিনি হাসলেন, "আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দেখতে পারেন। বন্ধুর চেয়ে বড় ভিটামিন আর কী আছে?"

কুকুরটা দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছিল দেখে অনুত্তমবাবু বান্টিকে ফিরে আসার জন্য ফোন করলেন টাটানগরে। বান্টিরা ফিরে আসতেই ঘোতন খুশিতে লাফিয়ে উঠল। গোমড়া ভাবটা উধাও। খাওয়াদাওয়া তার শুরু হয়ে গেল আগের মতো। বান্টির সঙ্গে খেলাধুলো, তেমনই হুটোপুটি। দু' দিনেই ঘোতন পুরো চাঙ্গা।

বান্টি আর ঘোতনকে ছাড়ে না। দু'-চারদিনের জন্যও কোথাও গেলে ওদের মারুতিতে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই যায়। কুকুরটার কষ্ট ও সহ্য করতে পারে না!

সেই ঘোতন সেদিন হারিয়ে গেছে। নিজে থেকে উধাও হওয়ার পাত্র সে নয়। কেউ নিয়ে পালাল না কি! অমন খোঁড়া কুকুর কার কাজে দেবে? চুরি করে সত্যিই যদি কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে, বান্টিকে না দেখার দুঃখে বেচারা মারা যাবে নির্ঘাত। রাস্তাঘাট তন্নতন্ন করে খুঁজে এসে কান্নায় অভ্যস্ত মেয়েটি ব্রেকফাস্ট না করে ফোঁপাতেই থাকল। বাবা বুঝিয়ে পারেন না, মা আদর করতে-করতে হয়রান। রবিবারের সকালটাই নষ্ট।

তবে কি মোড়ের ডাস্টবিনে সেই লোকটা সকালবেলা ঝোলা থেকে কী যেন ফেলে চটপট পালাল, তখনই রাস্তায় ঘোতনকে দেখে ঝোলায় পুরে ...! বান্টি ছাদ থেকে লোকটাকে দেখেছিল, তখন ঘোতন তো সেখানে ছিল না! ও তখন বাড়ির পিছনের ঝোপে!

ঘোতনকে মা ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা ছেড়ে দেন রোজ। পিছনের ঝোপঝাড়ে তিন পায়ে খানিক কসরত করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘরে এসে ঢোকে কুকুরটা। তারপর ব্রেকফাস্ট। সেদিন ভোরে বেরিয়ে সে আর ফিরল না। লেংচে-লেংচে তো বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়, হঠাৎ বেচারা হাপিস?

কান্না সামলে আবার বেরিয়ে গেল বান্টি। ওকে না পেলে ছুটির দিনটা মাটি। ডাস্টবিনে কী ফেলেছিল লোকটা? মিনি গোয়েন্দাগিরি একটা হয়ে যাক তা হলে! লোকটার চেহারা বিচ্ছিরি। খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঝোলা থেকে কী যেন ডাস্টবিনে ঢেলে দিয়েই কেমন চোরের মতো পালাল। একটু পরেই তো মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি সব জঞ্জাল তুলে নিয়ে চলে যাবে। জানা যাবে না ব্যাপারখানা!

বান্টি পিছনের ঝোপটা আর-একবার ভাল করে দেখে নিয়ে, সেই ডাস্টবিনটার দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক। দূর থেকেই দেখতে পেল ঘোতনকে। তাকে ঘোতন তখনও লক্ষ করেনি। ডাস্টবিনের একপাশে ঘাপটি মেরে বসে আছে। মাঝে-মাঝে দু'-তিনটে কাক ময়লার মধ্যে কী যেন ছোঁ মারার চেষ্টা করতেই ঘেউ ঘেউ করে তিন পায়ে তেড়ে যাচ্ছে ঘোতন। ব্যাপারটা কী?

বান্টি ছুটে গিয়ে কাছে দাঁড়াল। বন্ধুকে পেয়ে কুকুরটা বেজায় খুশি। হাবেভাবে ডাস্টবিনের মধ্যে কী যেন দেখাতে চাইছে।

ও মা, দু'টো বিড়ালছানা! গায়ে সোনালি রঙের উপর কালো-কালো ছোপ। আহ, কী দারুণ দেখতে! চোখ ফোটেনি এখনও। অসহায়ের মতো বন্ধ চোখেই কাকে যেন খুঁজছে। মিউমিউ করে কাঁদছে।

কান্নায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে বান্টির। ওই পাজি লোকটাই তবে এদের ফেলে পালিয়েছে! এদের মা কোথায়? বিড়ালমায়ের কাছ থেকে কেড়ে এনে কচি ছানা দু'টোকে এখানে ফেলে পালাল কেন লোকটা? ভাগ্যিস কাকগুলো ঠুকরে মেরে ফেলেনি এতক্ষণে! বান্টি বাচ্চা দু'টোকে দু' হাতে তুলে নিয়ে বাড়ি এল। মহা উৎসাহে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ফিরল ঘোতনও।

বাটিতে চুবিয়ে রাখা ন্যাকড়ার পলতে থেকে চুষে-চুষে দিব্যি দুধ খাচ্ছিল বাচ্চা দু'টো। ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে মা বললেন, "দেখিস, ঠিক বেঁচে যাবে।"

নতুন বন্ধু পেয়ে বান্টি আহ্লাদে আটখানা। এদের নাম রাখল, পুসকি আর টুসকি। বাচ্চা দু'টো বড় হয়ে গেলে চার বন্ধুতে দারুণ জমবে খেলা!

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সত্যি হিরো

সুকুমার রুজ

গল্প

মন ভাল নেই সুমনের। কাল রাতে পুলিশ এসে ওর বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। মায়ের সে কী কান্না! সুমনও কাঁদছিল মায়ের পাশে বসে। কাঁদতে-কাঁদতে এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে কাকের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেতেই মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। সঙ্গে-সঙ্গে মন খারাপ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, মা ঘরে নেই। ও ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামতেই চোখে পড়ল, মা কথা বলছেন অনিলজেঠুর সঙ্গে। মায়ের কান্না-কান্না ভাব। জেঠু সান্ত্বনা দিচ্ছেন মাকে, "তুমি কিছু ভেবো না বউমা। আজই সুনীল ছাড়া পেয়ে যাবে। ও অন্যায় তো কিছু করেনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। আমি ওকে জামিন করানোর ব্যবস্থা করছি।"

সুমন জানে না ওর বাবা কী অপরাধ করেছেন! কাল রাতে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, 'চলো, এবার জেলের লপ্‌সি ঘাঁটা খেয়ে আসবে কিছুদিন। হিরো হওয়ার সাধ মিটে যাবে।'

পুলিশের মুখে জেলের কথা শুনে সুমন খুব ভয় পেয়েছিল। সত্যি-সত্যি যদি বাবাকে জেলে দেয়! জেলে নাকি খুব অত্যাচার করা হয়, ও বইয়ে পড়েছে

এরকম কত ঘটনা। তা ছাড়া 'সুভাষচন্দ্র', 'ক্ষুদিরামের ফাঁসি' এসব সিনেমাতেও ও দেখেছে কত অত্যাচারের দৃশ্য। কেন যে বাবাকে জেলে পাঠানোর কথা বলছে, ও জানে না! পুলিশ বলছিল, 'হিরো হওয়ার সাধ মিটে যাবে।'

হিরো হওয়ার সাধ হলে পুলিশ ধরবে কেন তাও বুঝতে পারে না সুমন। সিনেমায় তো কত হিরো আছে। এই পাড়াতেই তো একজন আছে, হিরোর অভিনয় করে। এদের তো জেলে যাওয়ার কথা শোনেনি কখনও। সুমনেরও ইচ্ছে, বড় হয়ে হিরো হবে। কিন্তু...!

সুমন শুনল, অনিলজেঠু বলছেন, আজই ছাড়া পেয়ে যাবেন বাবা। বাবা তো কোনও অন্যায় করেননি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন।

সুমন ভাবে, ঠিকই তো! পুলিশের কথামতো বাবা যদি হিরোই হন, হিরোরা তো অন্যায় করেন না কখনও! কতদিন টিভিতে দেখেছে, যারা অন্যায় করে, হিরো তাদের ধরেই তো বেধড়ক পেটায়। তখন কী ভাল যে লাগে! তাই সুমন ভাবে, ওকেও হিরো হতে হবে। পাজি লোকগুলোকে ঠেঙাতে হবে। সিনেমায় এক-এক জনকে দেখে এত ভাল লাগে, তার মতো হতে ইচ্ছে করে।

একবার 'টারজান' সিনেমা দেখে সুমনের খুব ইচ্ছে হয়েছিল টারজানের মতো হওয়ার। জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে কী বন্ধুত্ব টারজানের! সিংহ, হাতি সব টারজানের কথায় ওঠে-বসে। সুমন সিংহ, হাতি আর পাবে কোথায়! তাই পটুদের বাড়ির হুলো আর রাস্তার কালু এই দু'টোকে পোষ মানানোর চেষ্টা করেছিল। তারপর সে কী কাণ্ড! কালুকে একদিন লেজ ধরে বসানোর চেষ্টা করতেই, ঘেউ-ঘেউ করে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল কালু। কিন্তু কামড়ায়নি। আর হুলোটার লেজে হাত দিতেই 'মিঁয়াও' করে এমন আঁচড় দিল যে, একদম রক্তারক্তি। বাবা তো সব শুনে, আর হাতের ওই অবস্থা দেখে, আরও দু'ঘা দুমাদ্দুম দিয়ে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। ছ'খানা ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল। তারপর সুমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, টারজান হওয়ার দরকার নেই। তার চেয়ে হিরো হওয়া ভাল। নাচ করো, গান করো, আর দুষ্টু-পাজি লোকদের পেটাও।

সুমন বাসি মুখে, ফোলা-ফোলা চোখে মায়ের আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে-জড়াতে ভাবে, আচ্ছা, বাবা কি পাজি লোকদের পিটিয়েছেন! কিন্তু বাবার গায়ে তেমন শক্তি আছে বলে তো মনে হয় না! বাবা কেমন রোগা-রোগা। হিরো-হিরো দেখতেও নন। হিরো হতে গেলে দারুণ স্বাস্থ্য দরকার। কেমন ফোলা-ফোলা মাস্‌ল থাকতে হবে।

সে জন্য সুমন রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করে। পঁচিশটা ডন মারে, পঞ্চাশটা বৈঠক দেয়। তারপর ভেজানো ছোলা-বাদাম খায়। স্নান করার পর চুল আঁচড়ানোর সময় রোজ একবার করে আয়নায় দ্যাখে, হাতের, বুকের মাস্‌লগুলো একটুও বেড়েছে কি না।

আজ সুমনের ব্যায়াম করার ইচ্ছে হচ্ছে না। মনটা সত্যিই খুব খারাপ। বাবার কথা ভেবে কান্না পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না। কখনও কাঁদে না ও। স্কুলের ভোলাস্যারের কথা মনে পড়ে যায়। ভোলাস্যার বলেন, "তোমরা তো ছেলে! ছেলেরা কাঁদে না কখনও। বিপদে পড়লে কখনওই কাঁদবে না। যারা দুর্বল, তারাই কান্নাকাটি করে। কাঁদলে মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। না কেঁদে বরং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় খোঁজার চেষ্টা করবে।"

সুমনের মনে যন্ত্রণা। বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে, এটা তো বিপদই। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য উপায় খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে সে ছোট্ট ছেলে হয়ে কী-ই বা করতে পারে! তা ছাড়া কেন ধরে নিয়ে গিয়েছে, সেটাও জানে না। মাও জানেন না হয়তো! অনিলজেঠু নিশ্চয়ই জানেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। এসব সাত-পাঁচ ভেবে সুমন বলল, "আচ্ছা জেঠু, বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কেন? বাবা কী দোষ করেছেন?"

মা চোখের জল লুকোতে ঘরে চলে যান। ছেলেকে বুঝতে দিতে চান না মনের কষ্টের কথা। তা হলে ছেলেও যে মনে কষ্ট পাবে! কোনও মা কি চান ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাক?

অনিলজেঠু একটু ইতস্তত করেন। তারপর বলেন, "কোনও দোষ করেনি তোমার বাবা।"

"তা হলে?"

"তোমার বাবা যাদের কাছে কাজ করে, তারা তোমার বাবার নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে। চুরির অভিযোগ।"

সুমন চমকে ওঠে, "চুরি! না-না, বাবা চুরি করতেই পারেন না। কেন ওরা মিছিমিছি বাবাকে চোর বলবে?"

"সে অনেক ব্যাপার, তুমি বুঝবে না।"

"জেঠু, আমাকে বলুন না, কী ব্যাপার? আমি ঠিক বুঝব।"

"বুঝবে? আচ্ছা শোনো। তোমার বাবা যেখানে কাজ করে, ওখানে তোমার মতো এগারো-বারো বছরের কয়েকটা ছেলেও কাজ করে। ছোট্ট ছেলে তো ওরা! তাই কখনও-সখনও কাজে ভুল করে, কিংবা একটুআধটু খেলায় মেতে ওঠে। সে জন্য ওদের মালিক মাঝে-মাঝেই মারধোর করে ছেলেগুলোকে। তোমার বাবা একদিন থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল, 'কেন মারছেন ছেলেগুলোকে? ওদের তো এখন লেখাপড়া আর খেলাধুলো করারই বয়স। এত ছোট ছেলেদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন, আবার ওদের মারধোর করছেন! জানেন, এদের দিয়ে কাজ করানো বেআইনি।'

"তোমার বাবার এসব কথা শুনে মালিকের খুব রাগ হয়েছিল। তার উপর তোমার বাবা করত কী, টিফিন টাইমে ওই ছেলেগুলোকে অক্ষর চেনাত, হিসেব শেখাত, যাতে ওরা পড়তে পারে, পারিশ্রমিকের হিসেব বুঝে নিতে পারে। এতে মালিকের রাগ আরও বাড়ল। মালিক তখন তোমার বাবাকে শায়েস্তা করার মতলব আঁটল। তোমার বাবা তো ক্যাশিয়ার। টাকাপয়সা নিয়ে কাজ। মালিক করল কী, নিজেই কিছু টাকা সরিয়ে রেখে তোমার বাবার নামে চুরির অভিযোগ করল। তারপর পুলিশকে উলটোপালটা বুঝিয়ে তোমার বাবাকে ধরিয়ে দিল।"

"ভারী পাজি তো মালিকটা! বাবা তো ঠিক কাজই করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। অন্যায় করা যেমন উচিত নয়, তেমনই অন্যায় সহ্য করাও উচিত নয়। আমাদের ভোলাস্যারই একথা বলেন।"

জেঠু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। কিন্তু...!"

সুমন বলল, "জেঠু, তা হলে এখন কী হবে? বাবাকে ওরা জেলে পাঠিয়ে দেবে না তো?"

"না-না, জেলে পাঠাবে বললেই কী

গল্প

পাঠানো যায়? অপরাধী সাব্যস্ত হলে তবে না! তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি থানায় গিয়ে আজই তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করব।"

"জেঠু, আমিও যাব আপনার সঙ্গে। পুলিশকে গিয়ে বলব বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।"

জেঠু ম্লান হাসেন, "তোমার কথা কি শুনবে ওরা? তুমি ছোট ছেলে। তা ছাড়া পুলিশ বলে কথা!"

সুমন গলায় জোর আনে, "কেন শুনবে না। আমি সেভেনে পড়ি। আমি ছোট নাকি? তা ছাড়া আমি পুলিশকে ভয় পাই না। ভোলাস্যার বলেন, 'যারা অন্যায় করে, তাদের মনে ভয় থাকে।' আমি তো কোনও অন্যায় করছি না, তবে ভয় পাব কেন? আমি যাব।"

জেঠু আশ্বস্ত করেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিয়ে যাব।"

॥ ২ ॥

থানার সামনে যেতেই সুমনের বুকটা একটু কাঁপে। ও জেঠুর হাত শক্ত করে চেপে ধরল। জেঠু বললেন, "কি সুমন, ভয় করছে?"

সুমন অপ্রস্তুতের হাসি হাসে, "হ্যাঁ, ভয় একটু করছে ঠিকই। এত পুলিশ! কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না। ভোলাস্যার বলেন, 'সাহস না থাকলে কোনও বড় কাজ করা যায় না।' বাবাকে যে ছাড়িয়ে আনতেই হবে। চলুন, ভিতরে যাই। ভোলাস্যার বলেন, 'ভয়কে মনে জায়গা দিলে ভয় আরও বেশি চেপে ধরে।' আপনি দেখবেন, পুলিশের সামনে আমি মোটেই ভয় পাব না।"

জেঠু মুচকি হেসে থানার বড়বাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে যান। বড়বাবু কী একটা কাগজ পড়ছেন। সুমন দুরুদুরু বুকে জেঠুর হাত ধরে আছে।

"আসব স্যার।" বলে জেঠু ভিতরে ঢোকেন। সুমন জেঠুর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সাহসী হওয়ার চেষ্টা করে।

জেঠু বড়বাবুর সঙ্গে সুমনের বাবার ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে থাকেন। সুমন দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শুনতে থাকে কথাগুলো। বড়বাবু যখন বললেন, "দেখুন, ওঁর নামে চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাই ধরতে বাধ্য হয়েছি।"

সুমন আচমকা বলে ওঠে, "মিথ্যে কথা। আমার বাবা চুরি করেননি।"

বড়বাবু ভুরু কুঁচকে তাকান, "সুনীল রায়ের ছেলে?"

জেঠু বললেন, "হ্যাঁ, আমার ভাইপো।"

বড়বাবু সুমনের দিকে বড়-বড় চোখে তাকান, "তুমি কী করে জানলে তোমার বাবা চুরি করেননি?"

সুমন বেশ সাহসী হয়ে ওঠে, "আমার বাবা কখনও চুরি করতে পারেন না। বাবা বলেন, 'চুরি করা মহাপাপ।' আমি একবার আমাদের ক্লাসের রজতের একটা কলম নিয়ে চলে এসেছিলাম ওকে না বলে। বাবা সেই কলমটা দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায় পেয়েছি? আমি সত্যি কথাটা বলতেই বাবা আমাকে খুব মেরেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'কাল স্কুলে গিয়ে আগে রজতকে কলমটা ফেরত দিয়ে, ওর কাছে মাফ চেয়ে নেবে।' "

বড়বাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন স্কুলে পড়ো?"

"নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউশনে।"

"কোন ক্লাসে?"

"ক্লাস সেভেন।"

বড়বাবু অদ্ভুত চোখে সুমনের দিকে তাকান, "সুভাষ ইনস্টিটিউশন? ক্লাস সেভেন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি পরের দিন রজতকে কলমটা ফেরত দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি স্কুলে গিয়েই ওকে কলমটা দিয়ে ওর কাছে মাফ চেয়ে নিই। ও মুখগোমড়া করে ছিল। কী হয়েছে, জিজ্ঞেস করতে ও বলেছিল, কলমটা হারানোর জন্য ওকে বাড়িতে খুব বকুনি খেতে হয়েছে। তা শুনে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমার জন্যই তো ওকে...। সেদিন আমার টিফিনের পয়সা দিয়ে রজতকে আইসক্রিম খাইয়েছি। ও আমার উপর আর রাগ করে থাকেনি। বন্ধু হয়ে গিয়েছে।"

বড়বাবুর মুখে মিটিমিটি হাসি। আর সুমনের জেঠু তো অবাক, সুমনকে ওভাবে কথা বলতে দেখে। বড়বাবু বললেন, "তোমার নাম তা হলে সুমন, তাই তো?"

"হ্যাঁ, সুমন রায়। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"আমরা পুলিশ। আমাদের সব কিছু জানতে হয়। রজত মুখোপাধ্যায় তোমার খুব ভাল বন্ধু, তাই তো?"

সুমনের চোখে-মুখে বিস্ময়, "হ্যাঁ। রজতের বাবা মস্ত পুলিশ অফিসার। পুলিশ হলেও কিন্তু খুব ভাল ওর বাবা। পরের দিন রজত স্কুলে এসে বলেছিল, ওর বাবা দশ টাকা দিয়েছেন, আমি আর রজত দু'জনে মিলে দু'টো চকোলেট খাওয়ার জন্য। আর আমার জন্য রজতের কলমের মতো একটা কলম কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে তার পরের দিন কলমটা নিয়েছি।"

বড়বাবু হেসে বললেন, "তুমি রজতের বাবাকে দেখেছ?"

"না দেখিনি। রজত বলেছে, একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে আমাকে।"

"কবে যাবে রজতদের বাড়ি?"

"আজ শনিবার, স্কুলে হাফ-ছুটি। আজকেই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। বাবাকে যে আপনারা মিছিমিছি চোর বলে ধরে নিয়ে এলেন? আমার বাবাকে ছেড়ে দিন। বাবা কোনও অন্যায় করেননি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। জানেন, ওরা বাবার নামে...।"

সুমনের গলা ধরে যায়। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বড়বাবু বললেন, "কেঁদো না। তোমার বাবাকে ছেড়ে দেব। আর আজই তুমি রজতদের বাড়ি যেতে পারবে।"

সুমন বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে শান্ত হয়। বড়বাবু অনিলবাবুকে দিয়ে দু'-একটা কাগজে সই করিয়ে নেন। তারপর একজন কনস্টেবলকে ডেকে বললেন, "লকআপ থেকে সুনীল রায়কে নিয়ে এসো।"

সুমন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। বড়বাবু আর-একজন কনস্টেবলকে ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, "এই বিচ্ছু ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে তোলো।"

সুমন ভড়কে যায়। ওর চোখে-মুখে ভয়। বড়বাবু হঠাৎ হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, "এত সাহসী ছেলে হয়ে ভয় পেয়ে গেলে! তোমাকে এখনই ধরে নিয়ে যাব রজতদের বাড়িতে। আমিই রজতের বাবা। আর তুমি হলে সত্যিকারের হিরো, হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

ছবি: অনুপ রায়

ভেনিসে পিন্টুমামা

ঋতা বসু

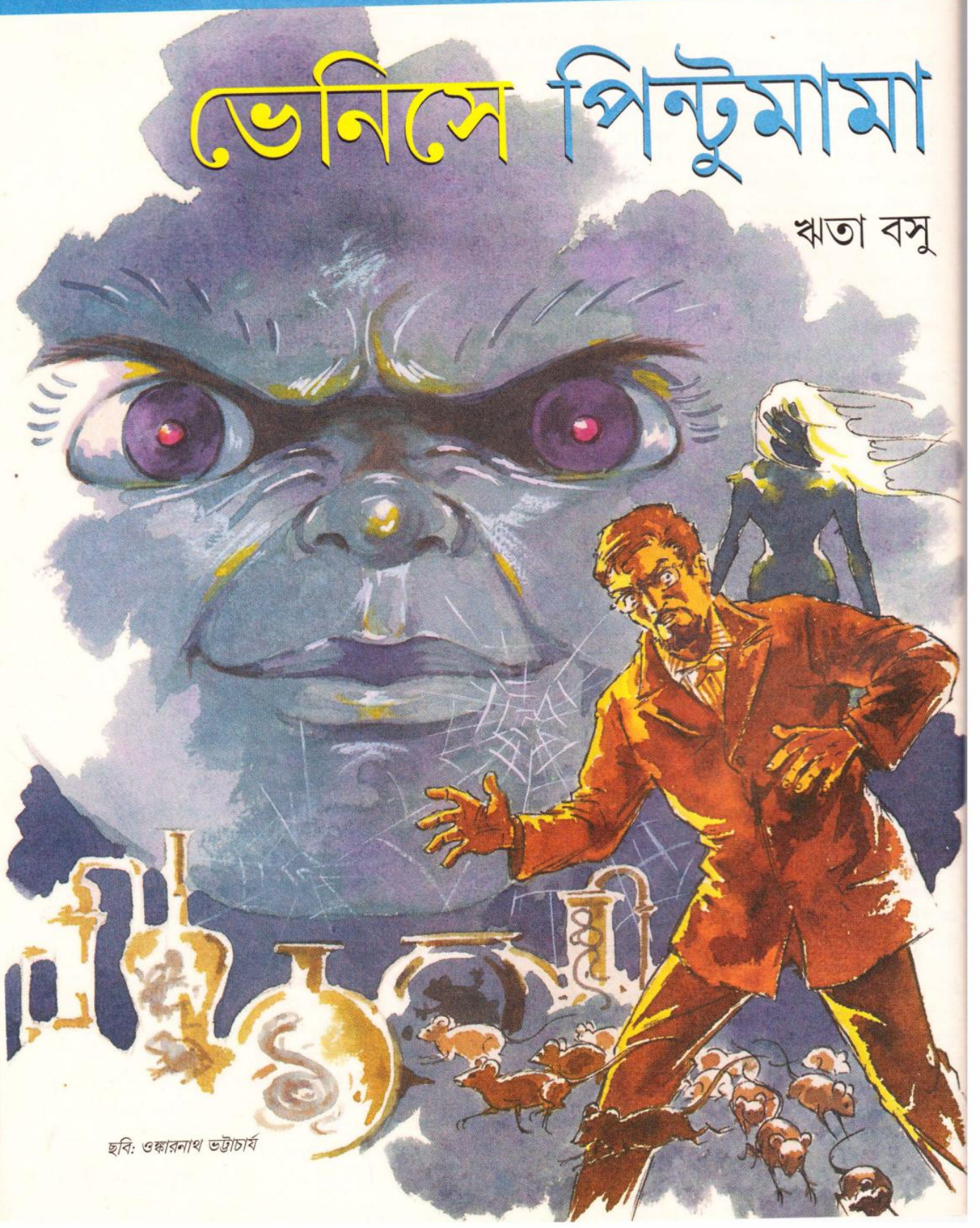

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

এক সংখ্যায় সমাপ্য

বাবা কয়েক দিনের জন্য অফিসের কাজে ইতালি গিয়েছিলেন। আমি আর তুলি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম বাবা ফিরে আসবার পর গল্প শুনব বলে।

বাবা আমাদের জন্য নানারকম চকোলেট, কলম, থ্রি-ডাইমেনশন ছবির বই, আর যে-যে জায়গা বা মিউজিয়ামে বাবা গিয়েছেন, তার অজস্র রঙিন সচিত্র পুস্তিকা নিয়ে এসেছেন। আমি আর তুলি গল্প শুনবার জন্য হাঁ করে আছি দেখে বাবা বললেন, "বিদেশের গল্প আর কী বলব! দারুণ সব মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি! ওই দেখেই সময় কেটে যায়। লিফলেট এনেছি, দেখলেই বুঝতে পারবি। তা ছাড়া অফিসের কাজেই তো ব্যস্ত ছিলাম বেশিটা সময়।"

মা বললেন, "ওর মধ্যে যে সময় করে ভেনিসটা দেখে নিতে পেরেছ, এই অনেক। শুনছিলাম শহরটা নাকি আস্তে-আস্তে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে! সত্যি নাকি?"

আমাকে আর তুলিকে বাবা ভেনিস শহরের অনেক পিকচার পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন, "জানি না, হতেও পারে। একটা আশ্চর্য শহর বটে! স্থলপথের চেয়ে জলপথই বেশি।"

তুলি আর আমি যাবতীয় ছবিটবি নিয়ে নিজেদের ঘরে এলাম। তুলি বলল, "বাবার গল্প বলার রকমটা দেখলি? যদি পিন্টুমামা যেত, আমরা দারুণ সব গল্প শুনতাম।"

"আমি যাইনি কে বলল তোদের?"

ঘরে বাজ পড়লেও এত চমকাতাম না। পরদার ফাঁক দিয়ে পিন্টুমামা মুন্ডু বের করে বলল, "আমি জানি তো, তোদের বাবা এই সময় ফিরবেন। ভাবলাম, যাই একবার পুরনো জায়গার গল্প শুনে আসি। সব ঠিকঠাক আছে তো, না অদলবদল হয়েছে?"

আমি উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "তুমি ইতালি গিয়েছ! আগে বলোনি তো কখনও?"

"কোন কথাটাই বা তোদের বলেছি? আমার জীবনের পাঁচ পার্সেন্ট গল্পও তোরা শুনিসনি। যার জীবনের প্রতিটি দিনই একটা করে গল্প, সে আর কত বলবে? নেহাত তোরা খোঁচাতে থাকিস, তাই দু'-চারটে ঘটনা কখনও-সখনও বেরিয়ে আসে।"

পিন্টুমামা পরদার ফাঁক থেকে মুন্ডুটা টেনে বাবার ঘরের দিকে রওনা দিল। আমি আর তুলিও মিউজিয়ামের সচিত্র পুস্তিকা, নানারকম পিকচার পোস্টকার্ড ছড়িয়ে ফেলে রেখে পিন্টুমামার পিছন-পিছন বাবার ঘরে এসে ঢুকলাম।

পিন্টুমামা বলল, "আপনার বিদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনতে এলাম।"

বাবা বললেন, "আমি তো আর তোমার মতো গল্প বলতে পারি না। গেলাম, দেখলাম, ভাল লাগল, এই আরকি। তবে সময় বের করে এর মধ্যেই ভেনিসটা ঘুরে এলাম। আজব শহর বটে!"

"ব্যাসিলিকা দ্য সান মার্ক, ডিউকের প্যালেস, বেল টাওয়ারে উঠে পুরো ভেনিস শহর নিশ্চয়ই দেখেছেন। গন্ডোলা তো চড়বেনই, তাই আর জিজ্ঞেস করছি না। তবে আমি যদি জানতাম আপনি ভেনিসে যাবেনই, তবে টর্সেলো দ্বীপের ভিতর দিকে সান্টা মার্গারিটা চার্চের পাশে ছোট একটা সমাধিস্থান দেখে আসতে বলতাম।"

বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু বই পড়েই তুমি ভেনিসের অত খুঁটিনাটি জেনে গেলে?"

পিন্টুমামা রুমাল বের করে মন দিয়ে চশমাটা মুছতে-মুছতে উদাস গলায় বলল, "শুধু বই পড়েই কি এত কিছু মনে রাখা সম্ভব? ওখানে ছিলাম যে তিন মাসের উপর।"

"সে কী! কবে?" বাবার গলায় পরিষ্কার অবিশ্বাসের সুর, "আগে কখনও শুনিনি তো?"

"আপনিও তো ঝন্টে আর তুলির মতো করছেন। আগ বাড়িয়ে আমি কোন কথাটাই বা বলেছি? ঝন্টেরা চেপে ধরে, তাই একটা গল্প আপনারা শুনে ফেলেছেন।"

বাবা বোধ হয় পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "ছিলে কোথায় ভেনিসে?"

"ছিলাম হোটেল গ্যালারিয়াতে।"

"সেটা আবার কোথায়?"

বাবার অবিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়ছে বুঝতে পারছি। আমি মনে-মনে প্রার্থনা করছি, পিন্টুমামা যেন এমন একটা কিছু বলে, যাতে বাবার অবিশ্বাস দূর হয়। পিন্টুমামা বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝে নিয়েই বলল, "আপনি অ্যাকাডেমিয়া স্টেশনটা দেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ, একলা ছিলাম বলে গন্ডোলা নিইনি। ভেপোতে করে রেল স্টেশন থেকে সেন্ট মার্ক স্কোয়ারে গিয়েছিলাম। পথে দেখেছি, মনে আছে।"

আমরা আগেই বাবার কাছে শুনেছিলাম গন্ডোলা হচ্ছে সরু নৌকো, যাতে দু'-চারজন লোক বসতে পারে। সেই জন্য গন্ডোলার ভাড়া খুব বেশি। শুধু টুরিস্টদের জন্যই সেগুলো ভেনিসের জলপথে ঘুরে বেড়ায়। আর ভেপো হচ্ছে বিরাট স্টিমার, যাতে একসঙ্গে প্রায় একশো লোক যাতায়াত করতে পারে। তবে অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত চওড়া গ্র্যান্ড ক্যানেল দিয়েই ভেপো চলাচল করে। ভিতরের সরু-সরু জলপথে গন্ডোলাই ভরসা। স্থানীয় লোকেদের জন্য অবশ্য কম ভাড়া, বলাই বাহুল্য।

পিন্টুমামা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলল, "তবে তো আপনার দেখারই কথা। সেন্ট মার্ক থেকে আসবার সময় অ্যাকাডেমিয়ার ব্রিজ পার হয়ে সেই স্টপে ভেপো থেকে নামলেই আপনি মিউজিয়মের বাঁ দিকে হোটেল গ্যালারিয়া দেখতে পাবেন।"

বাবা যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন তা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। এবার বাবা পিন্টুমামাকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই বললেন, "বোসো বোসো। কেন গিয়েছিলে ভেনিসে? তিন মাস ধরেই বা কী করছিলে?"

"সে কথা বলতে গেলে এই কেঠো চেয়ারে বসলে হবে না।" এই বলে পিন্টুমামা খাটের উপর বেশ গুছিয়ে তাকিয়াটা টেনে আরাম করে বসল।

হরিপদদা যেন এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাই স্পেশ্যাল মগে করে এক মগ সুগন্ধে ভুরভুর চা পিন্টুমামার সামনে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, "মামাবাবু, ঢোকামাত্রই আমি জানি এবার বিলেতের গল্প শুনব। আমাদের বাবু গেলেন আর আপনি যাননি এ তো হতেই পারে না।"

হরিপদদার কাছে বিলেত মানে অবশ্য ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গা, যেখানে সাহেব-মেমসাহেবরা থাকে।

পিন্টুমামা চায়ে চুমুক দিয়ে শুরু করার আগে আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম, "সান্টা মার্গারিটা গ্রেভইয়ার্ডে কী হয়েছিল পিন্টুমামা?"

"সে কথায় যাওয়ার আগে তোর ও তুলির সুবিধের জন্য ভেনিসের কথা একটু বলে নিই। তা না হলে তোরা গল্পটা ঠিক ধরতে পারবি না।

"ভেনিস শহরটার মতো এমন একটা অদ্ভুত জায়গা সারা পৃথিবীতে আর দু'টো নেই। তোরা ভূগোলের বইটই দেখে বিস্তারিত পড়ে নিস। আমি শুধু এটুকু বলছি, এটা একটা বিরাট দ্বীপ, সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। চওড়া একটা খাল, যাকে বলে গ্র্যান্ড ক্যানাল, সেটা শহরটার এক দিক থেকে আর-এক দিকে চলে গিয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানালের এক দিকে সমুদ্র, অন্য দিকে ভেনিস শহর। ক্যানেল থেকে অজস্র জলপথ আবার শহরের বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। ভেনিসে জানিস তো, তরকারিওলা আসে নৌকো করে। নৌকো করে রুগি যায় হাসপাতালে। পিয়ন আসে নৌকো করে। চারদিকে এত জল, কিন্তু খাবার জলের বড়ই অভাব।"

বাবা এবার অধৈর্য হয়ে বললেন, "এসব তো বই পড়েই জানা যায়। তুমি ওখানে কী করছিলে তাই বলো না।"

আমরা এমন করলে পিন্টুমামা কখন গল্প বলা থামিয়ে উঠে পড়ত। নেহাত বাবা, তাই চুপ করে আছে। আমাকে, তুলিকে আর হরিপদদাকে তো পিন্টুমামা পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল শ্রোতার উপাধি দিয়েছে। মামা বলেছে, গল্প শোনাটাও বলার মতো একটা আর্ট। ওটা বেশিরভাগ লোকেরই জানা নেই। বাবাও যে না জানারই দলে, সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

পিন্টুমামা বাবার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "না, বইয়ে মোটেই সব কথা লেখা থাকে না। বাড়িগুলোর মধ্যে যে কুয়ো, ডিপ টিউবওয়েলগুলো আছে, সেগুলো যে মাঝে-মাঝেই দূষিত হয়ে যায়, তার জন্য লোকজন অসুস্থ হয়, নৌকো করে পানীয় জল পাঠাতে হয়, তা বইয়ে লেখা থাকলেও একবার সেই দূষণের মাত্রা বেড়ে কী কাণ্ড হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় কোথাও লেখা নেই। সেবার দু'-তিনজন লোক মারা গেল পর্যন্ত। এ তো আর আমাদের দেশ নয়, ঝাঁকে-ঝাঁকে মানুষ মরলেও কারওর কিছু যায় আসে না। চার দিকে হইচই পড়ে গেল। মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে ভেনিসে যাওয়ার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এল। আসলে আমার নতুন আবিষ্কার, পেটের অসুখের অব্যর্থ দাওয়াই 'উদকম' সেইবারের ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্সে হইচই ফেলে দেওয়ার জন্যই আমাকে অত ডাকাডাকি, বুঝতে পারলাম।

"আমাদের কলেরা, আন্ত্রিক মোকাবিলা করে অভ্যেস। ভেনিসের ওই সামান্য পেটের ব্যামোতে আমার উদকমেরও দরকার হবে বলে মনে হল না। তার উপর টাকাটাও ভালই দিচ্ছে।

"ভেনিস শহরটা আগে একবার...," এই বলে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মতো বুড়ি-ছোঁয়া করে এসেছিলাম। এবার যখন গিয়ে থাকবার সুযোগ জুটেই গেল, তখন ভাবলাম, ছাড়ি কেন?"

পিন্টুমামার ভেনিস দর্শন

একটু থেমে পিন্টুমামা বলল, "এখনও পরিষ্কার মনে আছে, পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে রোম হয়ে ভেনিসে এসে পৌঁছলাম। এসে দেখলাম, অসুখটাকে যত হাল্কাভাবে নিয়েছিলাম, ওটা মোটেই তত হাল্কা নয়। জলদূষণের সমস্যাটাও সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। মাটির তলাতেই গভীর ও অগভীর জলস্তর মিশে গিয়ে এই বিপত্তি। আমার কাছ থেকে মাঝে-মাঝে পরামর্শ নিলেও, জলদূষণের সমস্যা মোকাবিলা করছে অন্য বিভাগ। আমার কাজ, দূষিত জল পান করে যারা অসুস্থ হচ্ছে বা হয়েছে তাদের চিকিৎসা করা।"

আমরা যদিও জীবনে পিন্টুমামাকে ডাক্তারি করতে দেখিনি। এমনকী আমাদের সামান্য কোনও শরীর খারাপেও মা যদি কোনও পরামর্শ চান, মামা বলত, 'অন প্রিন্সিপল, আমি নিজের লোকের চিকিৎসা করি না। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণা দিয়ে ডাক্তার না দেখালে রোগ সারে না।'

আমাদের চিকিৎসা না করলেও কখনও আর্মিতে, কখনও কোনও দেশীয় রাজার প্রাইভেট ডাক্তার হিসেবে, কখনও গবেষণার কাজে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়ে মামার জীবনে যে সব সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা তারই গল্প শুনতে ভালবাসি। তবে মামার খ্যাতি যে এক সময় দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে গিয়েছিল, তা এই প্রথম শুনলাম।

বাবার দিকে তাকিয়ে পিন্টুমামা বলল, "আপনাকে যে হোটেল গ্যালারিয়ার কথা বললাম, ওটারই একটা ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। জানলা খুললেই গ্র্যান্ড ক্যানাল দেখা যায়। ভারী পছন্দ হয়েছিল ঘরটা। সময় বিশেষ পেতাম না কাজের চাপে। তবু যখনই জানলায় দাঁড়াতাম, দেখতে পেতাম, গন্ডোলা করে গ্র্যান্ড ক্যানাল দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কত দেশের কত রকমের লোক।"

আমি বাবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, বাবাও আমাদের মতো মন দিয়ে পিন্টুমামার গল্প শুনছেন। চোখে-মুখে কোথাও অবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই।

পিন্টুমামা দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে শুরু করল, "গ্যালারিয়াতে থাকি, আর গন্ডোলা চড়ে বাড়ি-বাড়ি রুগি দেখে বেড়াই। উদকম দিয়ে দু'-চারজনকে সুস্থ করতে না-করতেই অন্য পাড়া থেকে ডাক পড়ে।

"এইভাবে গন্ডোলা চড়ে অনবরত ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে ভেনিসের জলের গলিপথগুলো আমার বাগবাজারের গলির

মতো সড়গড় হয়ে গেল।

"আর আমার ভারী পছন্দ ছিল হোটেলের বাসিন্দা সাদা মোটাসোটা বিড়ালটা। বিড়ালটা ক'দিনেই ভারী ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল। আমি ওকে ডাকতাম 'মাসি' বলে। আমার দেখাদেখি অন্যরাও ওকে 'ম্যাসি' বলে ডাকতে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। হোটেলের টানা লম্বা কার্পেট মোড়া করিডর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেত। কী রাজকীয় ছিল তার চলন ভাবতে পারবি না।"

পিন্টুমামা মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো বলো বিড়ালকে ট্রেনিং দেওয়া যায় না। মাসিকে যদি দেখতে তা হলে বুঝতে, ট্রেন্ড বিড়াল কাকে বলে। আমার ঘরে অন্য লোক থাকলে কখনও ঢুকত না। বাইরে অপেক্ষা করত। আমি ওর জন্য টিনের মাছ, দুধ নিয়ে আসতাম। যতক্ষণ না ডাকতাম অপেক্ষা করত গম্ভীরভাবে।"

মা বললেন, "কী জানি, তুমি কোন বিড়ালের কথা বলছ? সাহেবদের দেশে বোধ হয় এমনই ভদ্রসভ্য বিড়াল দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উৎপাত করে যে কেঁদো হুলোটা, তাকে দেখলে তুমি আর বিড়ালের ভদ্রতার কথা বলতে না।"

হরিপদদাও সুর ধরল, "সে ব্যাটা যেমন চোর তেমনই বদমাশ। অমন সুন্দর কলাই ডালের বড়িগুলো খাবে না, অথচ ফেলে ছড়িয়ে মাড়িয়ে কেমন নষ্ট করে দিয়েছিল, তাই না মা?"

আমি আর তুলি হতাশভাবে বসে থাকি। হরিপদদা থামলে আমি বলি, "তা হলে তোমরা বিড়ালের গল্পই করো, আমরা যাই। ভেনিসের গল্প পরে হবে।"

বাবাও অধৈর্য হয়ে বললেন, "সেই তো! এ যে ধান ভানতে শিবের গীত।"

পিন্টুমামা বলল, "আসলে মাসির কথা যখনই ভাবি মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই গল্পে ওরও একটা ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, বলছিলাম ভেনিসের কথা...!" তারপর বাবার উদ্দেশে পিন্টুমামা বলল, "আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ভেনিসে সারা পৃথিবী থেকে কী পরিমাণ টুরিস্ট আসে। এত রকমের লোক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও শহরে দেখা যায় না।

"সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভেনিসে সব চেয়ে বেশি টুরিস্ট থাকে। তারপর বৃষ্টির জন্য কমে গেলেও অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশিই বলা যায়।

"এত রকমের টুরিস্ট বলেই বোধ হয় কাউকেই মনে থাকে না। কেউ আসে গাইডের পিছন-পিছন বিরাট দল বেঁধে। কেউ বা আবার নিজেরাই আসে। অল্প বয়সি ছেলেমেয়েদেরও জোট বেঁধে ঘুরতে দেখি। নতুন বিয়ে হওয়া দম্পতিদের কাছে তো ভেনিসে হনিমুন দারুণ ব্যাপার। আর দেখতে পাই, পেরাম্বুলেটরে করে বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে আসা অজস্র মা-বাবা।

"ডাক্তারি আমার পেশা বটে, কিন্তু আমার নেশা হল মানুষ। কত রকমের মানুষ। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে হাঁ করে এদের কাণ্ডকারখানা দেখি।"

ভেনিসে ভয়ানক কাণ্ড

পিন্টুমামা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "একদিন সেন্ট মার্ক স্কোয়ারে একটা কোল্ডড্রিঙ্ক নিয়ে এইরকমভাবেই বসে চারদিক দেখছি, হঠাৎ দেখি, কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে একটা প্র্যামের উপর ঝুঁকে পড়ে একটা বাচ্চাকে আদর করছে। তারপর তারা কলকল করতে-করতে যেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলেছে, দেখি, সেটা একটা প্রমাণ সাইজের পুতুল। বাচ্চাগুলো খুব সুন্দর জামা, জুতো, মোজা পরা পুতুলটার সোনালি রেশমের মতো লম্বা চুলগুলো ধরে টানাটানি করছে। পুতুলটাকে একবার এ কোলে নিচ্ছে, আর-একবার ও কোলে নিচ্ছে। মেয়েগুলোর আদরের অত্যাচারে পুতুলটার প্রাণ ওষ্ঠাগত বলে মনে হল। সুন্দর করে আঁচড়ানো সোনালি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। টানাটানিতে জামা উঠে যেতে দেখতে পেলাম ডাইপার পরানো রয়েছে।"

তুলি জিজ্ঞেস করল, "ডাইপার কী?"

"বাচ্চারা যাতে বিছানা না ভেজায় তার জন্য পাতলা প্লাসটিক দেওয়া নরম মোটা ন্যাপি। ভাবলাম, বাবা এ কাদের পুতুল?

"হঠাৎ কোথা থেকে একটি বছর ছাব্বিশ-সাতাশের মেয়ে এবং ওই বয়সেরই একটি ছেলে ছুটে এসে ইতালিয়ান ভাষায় ছোট মেয়েগুলোকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে আবার প্র্যামের মধ্যে শুইয়ে দিল। বাচ্চা মেয়েগুলো ঘাবড়েটাবড়ে থতমত খেয়ে দৌড়োল যেখানে তাদের মা-বাবা বসে আছেন সেখানে। আমি একটু অবাক হলাম। একটা পুতুল নিয়ে একটু খেলেছে বলে অমন করে বাচ্চাদের বকুনি দেওয়াটা খুবই বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। তারা প্র্যামটা ঠেলে আমি যেখানে বসেছি তার চেয়ে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসল। মেয়েটিকে যেন বড্ড বেশি অস্থির লাগছে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে কথাবার্তা শোনা না গেলেও, ছেলেটি যে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, শান্ত করার চেষ্টা করছে এটা বুঝতে পারছি।

"যাই বল, সাহেবসুবোরা কিন্তু বাতিকগ্রস্ত হলে সেটা বড় ভয়ানক হয়। ভাবলাম, হয়তো নিজেদের মেয়ের খুব প্রিয় পুতুল বা ঠাকুরমা-দিদিমার উইল করে দিয়ে যাওয়ার এই সাতরাজার ধন এক মানিক। আসলে যার এটা নিয়ে খেলবার কথা, তাকে কিন্তু আমি যতক্ষণ ছিলাম ধারেকাছে দেখলাম না। হয়তো এদেরই বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গে অন্য দিকে বেড়াতে গিয়েছে। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই এই ছেলেটি আর মেয়েটিকে দেখি, ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও সেন্টমার্ক স্কোয়ারে, কখনও অ্যাকাডেমিয়ায়, কখনও সেন্টপাওলে। প্র্যামটা কখনও এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করে না। এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই।

"ওদেশে ঠাকুরমা, দিদিমা, মাসি, পিসির পাট নেই বলে এবং বাচ্চার জন্য আলাদা আয়া খুব কম লোকই রাখতে পারে বলে, ক্রেশে না দিলে সদাসর্বদা বাচ্চা নিয়ে ঘোরাই রেওয়াজ।"

এবার বাবার দিকে তাকিয়ে পিন্টুমামা বলল, "এটা নিশ্চয়ই আপনিও লক্ষ করেছেন, কত রকমের প্র্যাম ওদেশে। পুরো একটা সংসার ওরা প্র্যামের উপর চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্র্যামটা দোতলা। একটা তলা নিশ্চয়ই আহ্লাদী পুতুলটার জন্য। তবে এদের মেয়েটা যে খুবই শান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটেই জ্বালাতন করতে দেখি না। সব সময়েই শুয়ে থাকে। এত লোক যাচ্ছে-আসছে, কাউকেই মনে থাকে না। অথচ আমার মনে এই দম্পতি কেন জানি না, একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। যেচে আলাপ করা আমার কোষ্ঠিতে নেই। তাই দূর থেকেই লক্ষ করি, ওরাও নিশ্চয়ই ক্রশ লাগানো সরকারি ওয়াটার ট্যাক্সিতে ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছি দেখে থাকবে। পেটের রোগ ছাড়াও

আরও নানারকম অসুখে আমার আবিষ্কার এক-একটা দাওয়াই দিয়ে ভেনিসিয়ানদের খাতির আমি যে আদায় করে নিয়েছিলাম তাও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার নয়।

"এই দম্পতিকে সারা সপ্তাহ দেখতে পাই না। শুধু শনিবার ও রবিবার দেখা মেলে। হয়তো কাছাকাছি থাকে। মনে ভাবি, এদের কি আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না নাকি? ফি সপ্তাহেই ভেনিসে আসা চাই? লোকের যে কত রকমের বাতিক থাকে।

"ডিসেম্বর এসে গেল। ভেনিসে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। টুরিস্টের ঢল একটু কমেছে। এই দম্পতিকে কিন্তু নিয়ম করে প্রত্যেক শনিবারেই দেখতে পাই।

"আচমকা একদিন এদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। জলের গলিপথগুলো টইটম্বুর হয়ে আছে। ওইরকমই একটা গলির মোড়ে দেখি, তারা দাঁড়িয়ে আছে। আমি গন্ডোলা ছেড়ে সেন্ট মার্ক স্টপে আসার জন্য রাখা ওয়াটার ট্যাক্সিতে ফিরে যাব হোটেলে। টুরিস্ট কম দেখে গন্ডোলাও কম। ওরা বাচ্চা নিয়ে বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে ভদ্রতা করে বললাম, 'তোমাদের লিফ্‌ট দিতে পারি।'

"তারা কৃতজ্ঞ হেসে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে উঠে এল। পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর জানলাম, মেয়েটির নাম কাতিয়া, আর ছেলেটির নাম মার্কো। প্র্যামটা দেখলাম, ভাল করে প্লাসটিকের পরদা দিয়ে ঢাকা। আমার মনে হল, ভেনিস নিয়ে এদের আদিখ্যেতা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছে। নয়তো এই আবহাওয়ায় বাচ্চা নিয়ে কেউ বেরোয়?

"কিন্তু জানিসই তো, সাহেবসুবোদের দেশে কৌতূহল প্রকাশ করা বা কোনও ব্যাপারে আগবাড়িয়ে মতামত দেওয়া এটিকেট বিরুদ্ধ।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কোথায় উঠেছ?'

"মার্কো বলল, 'আমরা এখানে থাকি না। বোলনিয়া থেকে আসি। সারাদিন কাটিয়ে ফিরে যাই। কখনও থেকেও যাই।'

"বোলনিয়া ভেনিস থেকে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। সেখান থেকে নিয়ম করে প্রত্যেক উইকএন্ডে শুধু বেড়াতে আসে বাচ্চা নিয়ে? এরা কি পাগল?

"ওঃ, তোদের বলাই হয়নি, ভেনিসে আবার একটু বেশি বৃষ্টি হলেই বাড়ির একতলায় জল উঠে আসে। মাঝে-মাঝে ট্রেনও বন্ধ হয়ে যায়।

"আমার হাঁ হয়ে যাওয়া দেখেই বোধ হয় কাতিয়া বলল, 'আমার মেয়ে খুব ভেনিস ভালবাসে।'

"সেও তো আর-একরকম পাগলামি। আমরা তো বরাবর জানি, বেশি বায়না করলে বাচ্চাদের কান মলে একটা চড়ের মোক্ষম দাওয়াই দিলেই যত বেয়াড়া বায়না ঠান্ডা হয়ে যায়। বাচ্চা কীই বা বোঝে! তার মতামতকে অত গুরুত্ব দেওয়ারই বা কী আছে? বুঝলাম না। তারা কোথায় যেত জানি না, হাওয়া উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে দেখে আমার সঙ্গে অ্যাকাডেমিয়াতেই নামল।

"বলল, বৃষ্টি থামলে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে।

"উদকমের কল্যাণে রোগীদের সংকট দূর হয়ে স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গিয়েছে। জলের দূষণের সমস্যাটাও মোকাবিলা করা গিয়েছে। দেশে ফেরার সময় হয়ে এল। কাজ এগিয়ে রাখার জন্য আমি ঘরে বসে এক মনে সারাদিনের রিপোর্ট লিখছি।

"কাজ করতে-করতেই মনে হল, আজ মাসি এখনও আসেনি। হয়তো আসবে একটু পরে। দরজার কাছে কীসের আওয়াজে আমার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটল। সমস্ত হোটেলটা নিস্তব্ধ বলে সামান্য আওয়াজও বেশ জোরে কানে এসে লাগে।

"তোদের সাহেবি হোটেল বলতে যে কেতার ছবিটি মনে ভেসে ওঠে, ইউরোপের মাঝারি হোটেলগুলোর ধরনধারণ কিন্তু তার সঙ্গে একেবারেই মিলবে না। কী সামান্য কয়েকজন মাত্র লোক দিয়ে ওরা হোটেলগুলো চালায়, ভাবতে পারবি না। গ্যালারিয়া হোটেলটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলেই দু'-চার জন বাসিন্দার সঙ্গে দেখা হত। তারপর সারাদিন যে-যার মতো ঘুরে বেড়াতাম। ফিরে এসে দেখতাম, ঘরদোর পরিপাটি করে গোছানো আছে।

"আমার ঘরের কাঠের দরজার বাইরে আর-একটা ঘসা কাচের দরজা ছিল। সাধারণত হোটেলগুলোতে ওইরকম দরজা থাকে না। আমার আবার ওই দরজাটার জন্যই ঘরটা বেশি পছন্দ হত। শোওয়ার সময়টা ছাড়া ঘরে থাকলে শুধু কাচের দরজাটা টেনে রাখতাম। ঘসা কাচের মধ্যে দিয়ে করিডর ধরে হেঁটে যাওয়া লোকজন আবছা দেখা যেত।

"শব্দ শুনে লেখা থেকে মুখ তুলে দেখি, একটা বাচ্চার হাত কাচের দরজাটা ঠেলবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই হোটেলের কোনও বোর্ডারের বাচ্চা। আমি আবার আমার কাজে মন দিলাম।

"কয়েক মুহূর্ত পরে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মতো শব্দে চমকে উঠলাম। কোথা থেকে শব্দটা এল ঠাহর করতে পারলাম না। দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে দেখি, কিছুটা দূরে মাসি সন্দেহজনকভাবে কাত হয়ে পড়ে আছে। কেউ কোথাও নেই।

"কাছে গিয়ে দেখি, মাসির শরীরে প্রাণ নেই। ঘাড়টা অদ্ভুতভাবে লটপট করছে। রিসেপশন থেকে জিকোকে ডেকে নিয়ে এলাম। সে-ও খুব অবাক হয়ে গেল। আমরা বলাবলি করলাম, কোথাও থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

"বললাম বটে, কিন্তু মনটা খচখচ করতে লাগল। এমনটা হতে আগে কখনও দেখিনি। তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে পড়লেও বিড়ালের কিছু হয় না।

"যাই হোক, জিকো মাসিকে তুলে নিয়ে গেল। কোনও বোর্ডারই কিছু টের পায়নি। নির্জন করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব নিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলাম। তোরা বললে বিশ্বাস করবি না, যখনই আমার জীবনে কোনও অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, আমার মনের মধ্যে একটা বিপদের সংকেত আমি তার আগেই পেয়েছি।

"জিকো যাই বলুক না কেন, মাসির মৃত্যুটা নিয়ে আমার যে মন খুঁতখুঁতুনি, তার মধ্যে যেন বিপদের পূর্বাভাস পেলাম।

"বসে-বসে আকাশ পাতাল না ভেবে চিরকালই যা করি, আজও তাই করলাম। কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলাম। খানিকটা পরে আর সব কিছু ভুলে কাজের মধ্যে ডুবেও গেলাম। রাত কত হয়েছে খেয়াল ছিল না। চারদিকের থমথমে ভাবে মাঝরাত্তির যে পেরিয়েছে তাতে ভুল নেই। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। চমকে উঠলাম।

আবার কী হল? দরজা খুলে দেখি, মার্কো উদ্‌ভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে।

" 'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'বৃষ্টির জন্য আমরা আজ আটকে গেলাম। তোমার পাশের ঘরেই আছি। সমস্যা হল, আমার মেয়ে যে ব্র্যান্ডের দুধ খায়, সেটা ফুরিয়ে গিয়েছে। নীচের বড় স্টোরটায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এত রাতে আমাদের কথা কেউ শুনবে বলে মনে হয় না।'

"কাতিয়া বলল, 'তুমি ডাক্তার, এখানে সবাই তোমাকে বেশ খাতিরও করে। যদি তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো। আমার মেয়েটা খিদেয় বড় কষ্ট পাচ্ছে। অসুস্থও হয়ে পড়ছে।'

"স্টোরের ইনচার্জ মিঃ কারানির সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় আছে। ওঁর ছেলেটির ঝিমনো ভাব, কোনও কিছুতে উৎসাহ নেই দেখে খুব চিন্তিত ছিলেন। প্রচুর ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধপত্তর করেও লাভ হয়নি বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার আবিষ্কার উদ্দীপন-২৭ চেরির রসের সঙ্গে মিশিয়ে ঠিক তিনদিন দিতে বলেছিলাম। এখন সেই ছেলে স্কুলের টিমে বীরবিক্রমে ফুটবল খেলছে। স্বভাবতই আমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না।

"দুধটা দেওয়ার খানিকটা পর ভাবলাম, দেখে আসি বাচ্চা মেয়েটা কেমন আছে। হোটেলের করিডরটা এমনিতেই নির্জন থাকে। এখন রাত হয়ে গিয়েছে বলে একেবারে জনমনিষ্যি শূন্য। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কার্পেট মোড়া। করিডরের বড়-বড় আলোগুলো নিভে গিয়েছে। দূরে-দূরে ঘেরাটোপের মধ্যে ছোট-ছোট টিমটিমে আলোর জন্য করিডরে একটা আলোআঁধারির সৃষ্টি হয়েছে।

"খেয়াল করিনি।এখন বেরোতে গিয়ে দরজার কাছে দেখলাম, একটা চুষিকাঠি পড়ে আছে। চুষিকাঠি জানিস তো? প্লাসটিকের চাকতির মধ্যে রবারের নিপ্‌ল বাচ্চারা মুখে নিয়ে চোষে। দেশে দেখেছি, খুব ছোট বাচ্চারাই চুষিকাঠি ব্যবহার করে। বিদেশে দেখলাম, বেশ বড় বাচ্চারাও হাতে পুতুল ও মুখে চুষিকাঠি নিয়ে ঘোরে। আমার কাচের দরজা ঠেলছিল যে বাচ্চাটা, সে ফেলে গিয়েছে। ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই মার্কো-কাতিয়ার বাচ্চা মেয়েটার জিনিস। তাই হাতে তুলে নিলাম। ভাবলাম, খোঁজ নিতে যাচ্ছি যখন ফেরত দিয়ে দেব। তারপর নিজের বোকামিতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ওদের বাচ্চাটা তো খুবই ছোট, প্র্যামে শুয়ে থাকে। আর আমার ঘরের দরজা যে ঠেলেছিল, সে নিশ্চয়ই হেঁটে-চলে বেড়ানো মানুষ।

"এই সব ভাবতে-ভাবতে পাশের ঘরে গিয়ে নক করবার আগেই দেখি, দরজাটার ফাঁক দিয়ে সরু দাগের মতো আলো দেখা যাচ্ছে। ডাকব কি ডাকব না ভাবতে-ভাবতেই ওই সরু চুলের মতো ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যের দৃশ্য দেখে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল।

"জীবনে আমি অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি বহুবার। কিন্তু এইরকমভাবে গায়ে কাঁটা দেয়নি এর আগে।"

পিন্টুমামার গোয়েন্দাগিরি

হঠাৎ পিন্টুমামা কেমন চুপ করে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে

পিন্টুমামা বলল, "মার্কো দরজার দিকে পিছন ফিরে বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে আছে। আর কাতিয়া কোলের উপর পুতুলটাকে শুইয়ে হাসিমুখে দুধ খাওয়াচ্ছে। আমার আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখের সামনে বোতলের দুধ হু-হু করে শেষ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরে তাদের মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই।

"আমি একটা ঘোরের মধ্যে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সারা রাত দু' চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। জানলার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে দেখলাম, অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হল। তখনও মেঘ করে আকাশ ময়লা হয়ে আছে।

"এই রহস্য ভেদ না করতে পারলে আমার পক্ষে অন্য কোনও কাজে মন বসানো অসম্ভব। কাতিয়া আর মার্কো ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাসিমুখে আমাকে গুডমর্নিং বলে রুটি, ফলের রস, দুধ-কর্নফ্লেক্স নিয়ে খেতে বসল। কী স্বাভাবিক আচরণ। সাধারণ একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর মতো হাসাহাসি, গল্পগুজব করতে-করতে দিব্যি খাওয়াদাওয়া সারছে। ওদের দু'জনের জীবনে যে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে চলেছে, তার কোনও চিহ্নই নেই ওদের আচরণে। পাশে যথারীতি প্র্যামটা দাঁড় করানো।

"আমার কেবলই প্র্যামের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। একটা তলায় নিথরভাবে পুতুলটা, যে পুতুলটাকে আমি এতদিন ধরে ওদের মেয়ে ভেবে এসেছি। জামা, জুতো বদলানো। মাথার সোনালি চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ে বিনুনি করা। আর-একটা তলা খালি। সেখানে রাজ্যের জিনিস ডাঁই করে রাখা। আমি এতদিন ভাবতাম, পুতুলটাও ওরই সঙ্গে পড়ে থাকে।

"খাওয়া সেরে মার্কো-কাতিয়া আমাকে 'বাই' বলে প্র্যাম ঠেলে চলে গেল। আমার গলা দিয়ে আজ আর কোনও খাবার নামল না। কেবল মনে হতে লাগল, গত কাল রাতে যা দেখেছি তা কি আমার চোখের ভুল?

"অবশেষে মিঃ কারানিকে গিয়ে ধরলাম, 'খানিকক্ষণ আগে আপনার দোকানের সামনে দিয়ে যে দম্পতিটি প্র্যাম ঠেলে চলে গেল, ওদের বাচ্চার জন্যই কাল দুধ নিয়েছিলাম। চেনেন নাকি ওদের?'

" 'মার্কো আর কাতিয়া তো? ওরা বাচ্চার জন্য শুধু দুধ কেন আরও কত কিছু যে কেনে, ওদের এখানে সবাই চেনে।'

" 'কেন? ওরা এত বিখ্যাত কীসের জন্য?'

"আমি এদিকে মনে-মনে ভাবছি, যার জন্য আমার সারারাত ঘুম নেই, অস্বস্তি আর আতঙ্ক মিলেমিশে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সেটার জন্যই এরা বিখ্যাত নাকি? হয়তো দেখা গেল সমস্ত ভেনিসবাসীই এই ঘটনা জানে। এতই সাধারণ ব্যাপার।

"মনটা একটু দমে গেল। যত অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, আমিই তার সমাধান করব এমন একটা অহঙ্কার তো আমার আছে জানিসই। কিন্তু মিঃ কারানির ক্যাজুয়াল কথার ধরনে মনে হচ্ছে, সমস্ত ভেনিসবাসী জানার মতোই সাধারণ ঘটনা এটা। হয়তো শুনব পুতুলটার মধ্যেই কলকব্জার কিছু কেরামতি আছে।

"গত কাল রাত থেকে যে উত্তেজনায় টানটান হয়ে ছিলাম, তা যেন একটু মিইয়ে গেল। মিঃ কারানির কথা শুনে অবশ্য তখনই ভুল ভেঙে গেল। আমার মতো অভিজ্ঞতা যে এদের কারওরই হয়নি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

"মিঃ কারানি বললেন, 'ওদের ব্যাপারটা খুবই স্যাড। প্রথম-প্রথম আমাদেরও ওদের আদিখ্যেতা দেখে অদ্ভুত লাগত। এখন সয়ে গিয়েছে। ওরা ওদের তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে ভেনিসে বেড়াতে এসেছিল। গন্ডোলায় চড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় কী করে যেন মেয়েটি জলে পড়ে যায়। পড়ার সময় মেয়েটি পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওটা সুদ্ধই তলিয়ে যায়। মার্কো সঙ্গে-সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জলের তলায় মেয়েকে খুঁজে পেয়ে হাঁকপাক করে চুল ধরে উপরে টেনে তুলে দ্যাখে, মেয়ের বদলে পুতুলটাকে তুলে এনেছে। ওদের মেয়েটিরও হুবহু ওইরকম সোনালি চুল ছিল। মার্কো গন্ডোলায় পুতুলটা ছুড়ে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আবার ডুব দেয়। ততক্ষণে অন্য মাঝিরাও জলে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। কিন্তু মেয়েটিকে আর কেউ খুঁজে পায়নি। পরে তার মৃতদেহ টর্সেলো দ্বীপের কাছে ভেসে ওঠে। ওরা ওখানেই সান্টা মার্গারিটায় মেয়েকে সমাধি দিয়ে ফিরে যায়। তারপর থেকে প্রত্যেক উইকএন্ডেই মেয়ের পুতুল আর প্র্যাম সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াতে দেখি। গাদা-গাদা জামাকাপড়, চকোলেট, বিস্কুট, কত কিছু যে কেনে। জামাটামাগুলো বদলে-বদলে পরাতে দেখি। কিন্তু অত খাবারদাবার শুধু-শুধু নষ্ট করে।'

"মার্কো আর কাতিয়ার অদ্ভুত আচরণের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু আমি নিজের চোখে যা দেখেছি, তার রহস্য কে উদ্ধার করবে? মিঃ কারানিদের যদি সে কথা বলি, কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

"দেশে ফেরার সময় হয়ে এসেছে। ভাবলাম, তার আগে আমাকে এই রহস্যের সমাধান করতেই হবে। এই এত বড় আধুনিক শহরে এমন একটা কাণ্ড, সেটা আমারই চোখের ভুল, না সত্যি-সত্যিই কোনও অলৌকিক অবিশ্বাস্য শক্তি ভর করে আছে ওই একরত্তি পুতুলটার উপর, এটা আমাকে জানতেই হবে।

"কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে মার্কো-কাতিয়া আর তাদের প্র্যামটার ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। খুব গোপনে তাদের উপর লক্ষ রাখি। কিন্তু কোথাও আর কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে পড়ে না।

"একদিন প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। রুগি দেখে ফিরছি। টুকিটাকি কয়েকটি দরকারি জিনিস কেনার ছিল, তাই ওয়াটার ট্যাক্সিটা সেন্ট মার্ক স্কোয়ারে দাঁড় করালাম। এই জায়গাটা হচ্ছে তোদের এসপ্ল্যানেড বা গড়িয়াহাটের মতো। ডিউকের প্যালেস, ব্যাসিলিকা, বেলটাওয়ার সব একসঙ্গে থাকার জন্য রাজ্যের টুরিস্টের ভিড় এখানেই। একবার সেন্টমার্ক স্কোয়ারে না ঘুরে গেলে ভেনিসে আসাই বৃথা। ভেনিস মানেই সেন্টমার্ক স্কোয়ার। সেই জন্য এখানেই গড়ে উঠেছে যতরকম বাজার, দোকানপাট।

"সেদিন বৃষ্টির দরুন সেন্টমার্ক স্কোয়ার ঘিরে খোলা রেস্তরাঁগুলোর চেয়ার একটার গায়ে একটা উলটে রাখা। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে খানিকক্ষণ। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। অন্য সময় গমগম করা স্কোয়ারটায় আজ জনমনিষ্যি নেই। না, একেবারে নেই বললে ভুল হবে। স্কোয়ারের ঠিক মাঝখানে দাড়িগোঁফওলা এক সাহেব জলের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে-বসে চারদিকের বৃষ্টিভেজা দৃশ্য স্কেচ করছে, আর তার থেকে একটু দূরে স্থির হয়ে

বসে আছে মার্কো ও কাতিয়া এবং তাদের সামনে যথারীতি প্র্যামটা। আজ অবশ্য পরদা ঢাকা দেওয়া।

"তোদের তো বলেছি, সাহেবসুবোদের বাতিকের শেষ নেই। কেউ কাউকে নিয়ে মাথাও ঘামায় না। যদি ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যেও ওরা বসে থাকত, কেউ ফিরেও তাকাত না।

"আমারও ওখানে থাকতে-থাকতে এত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা হামেশাই চোখে পড়ত যে, আর অবাক হতাম না। অথচ মার্কোদের ব্যাপারটা কেন যে আমার মতো শক্ত লোককেও কাবু করে ফেলেছিল বলতে পারব না।

"নিজেকে কতবার বুঝিয়েছি, যা দেখেছি চোখের ভুল। বাকি সবাই তো ওদের নিত্যি দেখছে। কারওর তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। আর যদি আমারই চোখের ভুল হয়? চারপাশের লোকের নির্বিকার সহজ ভাব দেখে আমারই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল।

"হয়তো মনে একটু খুঁতখুঁতুনি নিয়ে দেশেই ফিরে আসতাম। ভাবতাম, এই রকম কত অদ্ভুত দৃশ্যই তো আমাদের চোখে পড়ে, যদি না ভেনিসের বিখ্যাত মুখোশ উৎসবে হাজির থাকতাম। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের নানারকম কাণ্ডকারখানা চলে। তার মধ্যে একটা এই মুখোশ উৎসব। কত রকম মুখোশ পরে যে এরা নাচে, ভাবতে পারবি না। তার সঙ্গে মানিয়ে পোশাক। সেই পুরনো আমলের রাজারানি থেকে শুরু করে নানারকম লৌকিক দেবদেবী, সব রকম মুখোশই সমান জনপ্রিয়।

"সমস্ত ভেনিস জুড়ে যেখানেই চওড়া উঠোন, যাকে এরা বলে স্কোয়ার, সেই জায়গা জুড়ে নাচ চলতে থাকে। আমার সেন্টমার্ক স্কোয়ারটা প্রিয় বলে কাজকর্ম সেরে ওখানে বসেই এদের কাণ্ডকারখানা দেখি, দিব্যি সময় কেটে যায়।

"এর মধ্যে একদিন ভেনিসের একেবারে শেষ প্রান্তে মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার দূরত্বে টর্সেলো দ্বীপে রুগি দেখতে গেলাম। সেই রুগি নিয়ে নাজেহাল অবস্থা। তার ভারতীয় ডাক্তারের উপর মোটে ভরসা নেই। পেটের গোলমাল শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। কিন্তু সরকারি টিমে আমি যেহেতু একমাত্র ডাক্তার, সেই জন্য রোগ চেপে নিজেই নিজের ডাক্তারি করে কাটিয়ে দিচ্ছে এত দিন। এখন অবস্থা সঙ্গিন হতে বাড়ির লোক খবর দিয়েছে। ওই অবস্থাতেও বুড়োর কী তেজ, ভাবতে পারবি না। আমাকে বলল, 'আমার কী হয়েছে শুধু বলে দাও। সামনের ওষুধের দোকানে সব ওষুধ পাওয়া যায়, আনিয়ে নেব।'

"আমি একটুও না চটে বুড়োর মনস্তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করলাম। 'আমার দেওয়া ওষুধ খেতে তোমার আপত্তি কোথায়? একটু খুলে বলবে কি?'

"সে মুখ টিপে চোখ বুজে শুয়ে রইল। আমি বাড়ির লোককে ইশারায় বললাম, যে-কোনও ফলের রস এক কাপ নিয়ে আসতে। তার মধ্যে আমার উদকম বেশ কড়া ডোজে বুড়োর অলক্ষে মিশিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, আমার ওষুধ তোমাকে খেতে হবে না। এ তোমার বাড়িরই জিনিস। আমি শুধু বলছি, এটা খেয়ে নাও। এতেই তোমার রোগ সেরে যাবে।'

"বুড়ো অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে-তাকাতে কমলালেবুর রসটা খেয়ে নিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মনে হল, তার পেটের যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। আর-এক কাপ ফলের রস খেতে চাইল। আমি তার ক্লান্তি কাটানোর জন্য আমার অন্য আর-একটা ওষুধ, যেটা আমি খুব কমই ব্যবহার করি, মনস-৪৪০, বুড়োর কপালের ঠিক মাঝখানে লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।"

পিন্টুমামার ওষুধগুলো নিয়ে মায়ের আগ্রহ অসীম। বাজারে যা ওষুধ পাওয়া যায় সবই নাকি বাজে। কোনওটাই তেমন কাজ করে না। পিন্টুমামা আবার অন প্রিন্সিপল, নিজের লোকজনদের চিকিৎসা করে না। মা অবশ্য ভাবেন, তেমন বিপদে পড়লে পিন্টুমামা কি আর সম্বোধি-৯৯, উদ্দীপন-৭১, চেতনাযৌধি দিয়ে একটা মিরাকল ঘটাবে না? মনস-৪৪০-এর কথা কিন্তু পিন্টুমামা এর আগে বলেনি। মা জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আবার কী? আগে তো এই ওষুধটার নাম শুনিনি।"

আমি পিন্টুমামার ধাত জানি বলে কখনও এই জাতীয় প্রশ্ন করি না। এবারও ঠিক তাই হল। মা'র অজ্ঞতায় পিন্টুমামা অবাক হয়ে বলল, "তুমি আমার সারা জীবনের গবেষণার ফল এই কয়েকটা মাত্র ঘটনায় আর কতটুকু জানতে পারবে? শুধু এটুকু জেনে রাখো, আমার আবিষ্কৃত ওষুধ দিয়েই একটা ওষুধের কারখানা কোটি-কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে। এই ওষুধটার কথা আগে শোনোনি, কারণটা তো তোমাদের বললামই, এটা আমি খুব কমই ব্যবহার করি।"

এবার তুলি জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"কারণ, এটা সাধারণ ওষুধ নয়। এক গভীর প্রভাব পড়ে মনের মধ্যে। মনের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে একেবারে অব্যর্থ দাওয়াই আমার মনস-৪৪০।"

এতক্ষণ পরে বাবা মুখ খুললেন, "তুমি এই অপূর্ব জিনিসটি পুলিশের হাতে তুলে দাও। যত চোর-ডাকাতের হাঁড়ির খবর টেনে বের করবে, আর দেশ থেকে সব অপরাধ লোপ পাবে। চাই কী, ভারত সরকারও লুফে নিতে পারে তোমার এই আবিষ্কার। যত গুপ্তচর ধরা পড়বে, তোমার ওই দাওয়াইয়ের জোরে এক মিনিটেই তাদের পেটের কথা বেরিয়ে আসবে।"

পিন্টুমামা গম্ভীরভাবে বলল, "এক মিনিট নয়, অন্তত দশ মিনিট। ওষুধের ক্রিয়া মনের গঠনের উপর, প্রতিরোধের চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তবে দশ থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে সে যে তার কেরামতি দেখাবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

গল্পটা থেকে সবাই কত দূরে চলে যাচ্ছি। আমার রাগ হয়ে গেল। পিন্টুমামা এক গেলাস জল খেয়ে মুখ মুছে গল্পটা শুরু করতে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি আর তুলি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে গল্পের আশা ত্যাগ করলাম। হরিপদদা দরজা খুলতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, "বাবুর অফিস থেকে কারা যেন এসেছেন।"

টেবিলের উপর পড়ে থাকা মোটা ফাইল নিয়ে বাবা দরজার দিকে এগোলেন। আমার মনে হল, এই গল্পের আসর ছেড়ে বাবার একটুও উঠবার ইচ্ছে ছিল না। যদিও বাবা এটা মুখে স্বীকার করবেন না।

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে বাবা বললেন, "পিন্টুবাবু, এবার মনের সুখে গল্পের গোরুকে গাছে তোলো। কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।"

বাবার সঙ্গে-সঙ্গে মাও অতিথিদের দেখভাল করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লেন। দু'জনেই ঘরের বাইরে চলে যাওয়ার পর হরিপদদা আস্তে করে বলল, "মামাবাবু, তোমার ওই

৪৪০ নম্বর ওষুধটা বাবুকে একবার খাইয়ে দেখলে হয় না?"

তুলি চেঁচিয়ে উঠে বলল, "হরিপদদা, কিচ্ছু মন দিয়ে শুনছ না। মনস-৪৪০ খাবার নয়, লাগানোর ওষুধ।"

"ওটা খাওয়াও যায়। হরিপদ ঠিকই বলেছে। ওষুধ খাইয়ে আমার গল্প শোনাতে হবে, এত দুরবস্থা হওয়ার আগে গল্প বলাই ছেড়ে দেব। তবে কী জানিস, শ্রোতাদের মধ্যে আমার কথাগুলো কেউ যদি বিশ্বাস না করে বানানো গল্প ভাবে, তাকে আমার জীবনের আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে একদম সুখ পাই না। আর আমার জীবন তো, অন্য পাঁচটা লোকের মতো খেয়ে, ঘুমিয়ে, অফিস করে কেটে যায়নি। এসব কথা আগবাড়িয়ে আমি কাউকে বলতেও যাই না। নেহাত তোরা ক'জন শুনতে চাস তাই বলা।"

আমি আর তুলি সমস্বরে মামার অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করি। খানিক পরে মামা ধাতস্থ হয়ে শুরু করে, "বুড়োকেও আমি মনস-৪৪০ দিতাম না। উদকমই যথেষ্ট ছিল। হয়তো একটু বেশি ডোজে উদ্দীপন দিয়ে দিলেই বাকি অবসাদ দূর হয়ে যেত। কিন্তু মনস-৪৪০ দিলাম অন্য কারণে।

"ভারতীয়দের প্রতি সাহেবদের একটু করুণার মনোভাব থাকেই। আমি সেটা গায়ে মাখি না। তবে এবারে ছবিটা একদম অন্য রকম। প্যাঁচে পড়ে, আমার উদকমের কেরামতি দেখে, এবার আমার খাতিরই অন্যরকম। হোটেলের মালিক থেকে শুরু করে গন্ডোলার মাঝি পর্যন্ত বিনা প্রতিবাদে আমি যা বলছি, মেনে নিচ্ছে। সেখানে এই বুড়োর, ভারতীয়দের উপর যা বিতৃষ্ণা দেখলাম, প্রশ্ন করলে ভাল মানুষের মতো গড়গড় করে সব বলে দেবে এমন তো নয়। সেই জন্য কারণটা জানার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"বুড়োর বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান। বাগানে দাঁড়ালে জলের পাশ দিয়েই আর-একটা ত্রিকোণ গলিপথ চোখে পড়ে। ভেনিসে স্থল কম বলে গলিগুলোর মধ্যে গায়ে-গায়ে বাড়ির ছবিটা প্রায় আমাদের কলকাতার বা বেনারসের গলিরই মতো। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই যা!

"কিন্তু এই গলিটার সামনে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাস্তাটা অন্যান্য রাস্তার চেয়ে সরু আর সমস্ত গলিটা ফাঁকা, শুনশান। একদম শেষে একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ি। খানিক পরে দেখি, একদল মুখোশ পরা লোক বাড়িটার পিছন থেকে নাচতে-নাচতে বেরিয়ে আসছে।

"আমি বেশ খুশি মনেই নাচ দেখছি। কত রকম মুখোশের মেলা। তবে এই মুখোশগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। এগুলো সবই যেন আমার চেনা। কোথায় দেখেছি ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ল, ছেলেবেলা থেকেই এই মুখোশগুলো নানাভাবে নানা জায়গায় দেখেছি। কখনও রথের মেলায়, কখনও ছৌ নাচের আসরে।"

পিন্টুমামা এখানে একটু থেমে দম নিয়ে বলল, "তোদের ঝড়ের বেগে বলে যাচ্ছি, আর তোরাও হাঁ করে গিলে যাচ্ছিস। মগজে কিছু ঢুকছে কি না কে জানে!"

আমরা মন দিয়ে গল্প শুনছিলাম। আচমকা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনটা মগজে ঢুকছে না? জিজ্ঞেস করো, সব হড়হড় করে বলে দেব।"

"হ্যাঁ, একেবারে দাঁড়ি, কমাসুদ্ধ।"

পিন্টুমামা জানলার দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে বসে রইল। আমরা বুঝতেই পারলাম না, পিন্টুমামার অসন্তোষের কারণ কী? আমাদের আগে হরিপদদাই অনুনয় করে বলল, "বলেই দাও না মামাবাবু, কোথায় ত্রুটি হল?"

বরাবর দেখেছি, হরিপদদা হাওয়া বুঝে বেশ সাধুভাষা ব্যবহার করে। পিন্টুমামা গম্ভীর হয়ে বলল, "রথের মেলায়, ছৌ নাচের আসরে ওরকম মুখোশ দেখেছি বললাম। রথের মেলা না হয় জানিস বুঝলাম, কিন্তু ছৌ নাচ কোথায় হয়? কাকে বলে জানিস?"

এবারও আমি আর তুলি চুপ। কিন্তু হরিপদদা সবজান্তার মতো বলে উঠল, "ছৌ এক রকমের নাচ তো জানি।"

মামার ভ্রুকুটি আরও গভীর হল। ভাগ্যিস এই সময় মা ঘরে এসে আমার পাশে বসে বললেন, "বেশি বোধ হয় মিস করিনি, না রে?"

তারপর ঘরের থমথমে অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসু মুখে আমাদের দিকে চাইতেই হরিপদদা একগাল হেসে বলল, "মামাবাবু ছৌ নাচের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। বললাম এক রকমের নাচ, তাই তো চটে গিয়েছেন।"

মা খুব ক্যাজুয়ালি বললেন, "নাচই তো, পুরুলিয়ার লোকনৃত্য। পৌরাণিক কাহিনি থেকে থিমটা নিয়ে একটা নাটকের মতো করে নাচের মধ্যে দিয়ে গল্পটা ফুটিয়ে তোলে। আমি দু' বার দেখেছি। ওদের মুখোশগুলো কী দারুণ দেখতে না?"

পিন্টুমামা বলল, "শুধু নিজে দেখলেই হবে। ছেলেমেয়েগুলোকে দেখাতে হবে না?"

হরিপদদা আবার সবজান্তার মতো বলল, "এক রকমের নাচ।"

"আমার কাছে বেশি চালাকি করবি না বুঝেছিস! ঝন্টে আর তুলির মতো হাঁদা গঙ্গারাম মুখ করে বসে থাকবি।"

সকলের উপর যথেষ্ট পরিমাণ চোটপাট করে বেশ খুশি মনে পিন্টুমামা আবার শুরু করল, "হ্যাঁ যা বলছিলাম, ভেনিসের মুখোশ উৎসবে আমাদের দেশের মতো মুখোশ দেখে একটু ভড়কে গেলাম। শুধু মুখোশ নয়, গাজনের মেলায় ছাইমাখা শিব, বহুরূপী সাজা কৃষ্ণ, নৃসিংহ অবতার, সবই আছে দেখলাম। তবে নাচটা এবং পোশাকটা, এমনকী দেশি মুখোশগুলোতেও আমাদের দেশীয় কাঠামোর উপরে একটা বিদেশি ছাপ পড়ে গিয়েছে। নিজের দেশের জিনিস দেখে এই দূর প্রবাসে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাড়ির মধ্যে থেকে বুড়োর মেয়ে ডাকতে এল।

"ঘরে ঢুকে দেখি মিঃ জর্জিও উঠে বসেছেন। চোখমুখ পরিষ্কার। চেহারায় ক্লান্তির ছাপটা আর নেই বললেই হয়। আমি হেসে বললাম, 'দেখলে তো, ভারতীয়রা একেবারে ফেলনা নয়!'

"মিঃ জর্জিও ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আমি ভারতীয়দের মোটেও অবজ্ঞা করি না। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি বরঞ্চ ভয় পাই বলেই দূরে থাকার চেষ্টা করি।'

"এ বলে কী? একটু অবাকই হলাম। ভয়ের কারণটা কী জিজ্ঞেস করাতে যা বললেন, আমি আমার জীবনে এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি। আমি ঠিক যেমনটা শুনেছি, হুবহু ওরই মুখের

ভাষায় তোদের বলে যাচ্ছি।

"তুমি যদি আমার বাগানের সামনে দাঁড়াও, জলের পাশ দিয়ে একটা খুব সরু গলি তোমার নজরে আসবে। দেখবে, রাস্তাটায় আর একটাও বাড়ি নেই। একদম শেষে শুধু একটা বাড়ি। সেই বাড়িতে যে থাকে, তার পূর্বপুরুষ শুনেছি বহু বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন। তখন এখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডিউকের আমল। সে নাকি জাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা আরও কী কী ভারতীয় ভেল্‌কি জানত। এখানকারই এক ইহুদি মেয়েকে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার পেতে বসেছিল।

"জাদুবিদ্যার কেরামতি দেখিয়ে ডিউকের মনও জয় করেছিল। তারপর কী গোলমাল হল। ডিউক তাকে হাজতে বন্দি করে রেখেছিল অনেক দিন গ্র্যান্ড ক্যানালের উপর জলে ঘেরা কয়েদখানায়। তারপর থেকে তাকে কেউ চোখে দেখেনি। কিন্তু তার জাদুবিদ্যার অশুভ প্রভাব নাকি এখনও আছে ওই বাড়িটায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে তারা নাকি বরাবরই যোগাযোগ রেখে এসেছে। আমরা পাড়াপ্রতিবেশীরা ওদের একটু এড়িয়েই চলি। ওরা যতই বলুক, ওখানে শুধু নির্দোষ ম্যাজিকের চর্চা হয়, আমরা তার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। ওরা ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করে, যার ফল ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। উনি অবশ্য অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কী ভোগান্তি হয়েছে সেটা খুলে বললেন না।

"আমি এতক্ষণে আমার ওষুধ খাওয়ায় মিঃ জর্জিওর আপত্তির কারণটা বুঝতে পারলাম। সে নিশ্চয়ই ভেবেছে, ভারতবর্ষের লোক মানেই ভেল্‌কিবাজিতে ওস্তাদ। তার সঙ্গে মিশেছে চিরকালের আমরা তোমাদের থেকে সব দিক দিয়ে উন্নত, এই গোছের একটা ভাব। বেচারা একঘরে প্রতিবেশী পরিবারের জন্য আমার মনে দুঃখই হল। ম্যাজিক তো একটা বিজ্ঞান নিশ্চয়ই। অচেনা কিছু ম্যাজিক দেখেছে, সেটাকে ডাকিনীবিদ্যা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। সত্যি এত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ালাম, ভারতবর্ষটা যে আসলে কী, তা-ই বুঝতে পারলাম না। তোরা বলতে পারবি নাকি?"

পিন্টুমামা আমার আর তুলির দিকে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে তাকাল। আমরা চোখের ইশারায় ঠিক করে নিলাম, চুপচাপ থাকাই ভাল। এখন যদি বলি আমাদের দেশে চারদিকে কত উন্নতি হচ্ছে, কত রকম মডার্ন টেকনোলজি আসছে, পিন্টুমামা বলবে, তার সঙ্গে তাবিজ, কবচ, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র কী পরিমাণে চলছে জানিস না তো! আর যদি বলি, সাহেবদের ধারণা মিথ্যে নয়, আমরা কত পিছিয়ে আছি। পিন্টুমামা প্রমাণ করে ছাড়বে কত দিকে কত রকম কেরামতি হচ্ছে, শুধু আমাদের অজ্ঞানতার জন্য তা জানতে পারছি না।

সাত-পাঁচ ভেবে চুপ করে থাকাই ভাল মনে করলাম। পিন্টুমামা অবশ্য সেটা বিনয়ের লক্ষণ মনে করে বেশ খুশি হয়ে বলল, "এর পর আমি আরও যা সব ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম, সেটা মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। তবে তার সঙ্গে এও ভাবি, নিজের দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত কম। উপর-উপর যেটা দেখা যায় সেটা আমাদের দেশের আসল চেহারা নয়। ভিতরে হাজার বছরের তন্ত্রমন্ত্র, জাদু, কত রকমের দেবতা-অপদেবতা, সব মিলেমিশে আর-একটা রহস্যময় ভারতবর্ষ আছে। তার চেহারা খুব কম লোকই জানে।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়শিরা ওই বাড়িটাকে এড়িয়ে চলে বলছ, কিন্তু মুখোশ পরা দলটাকে যেন নাচতে-নাচতে বাড়িটা থেকেই বেরোতে দেখলাম?'

"মিঃ জর্জিও বললেন, 'সেইখানেই তো আমার আরও আপত্তি। নিজেরা যা করছিস কর, তা না, একদল বখাটে বাপ-মা তাড়ানো ছাত্র জুটিয়েছিল তোমার দেশোয়ালি। তারা নাকি ওর কাছে ম্যাজিক শিখত। যাই হোক, এদের নাটের গুরুটি হঠাৎ মারা যাওয়ায় ভাবলাম, আপদ বিদায় হয়েছে। এবার বন্ধ হবে এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। তা এরা দেখছি গুরুপত্নীকেও খুব মান্য করে। প্রায়ই যাতায়াত করে ওই বাড়িতে। ওই ছেলের দল, যাদের নাচতে দেখলে, তারা ছাড়া আর কেউ যায় না ওই বাড়িতে।'

"মনের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা কেমন জট পাকিয়ে গেল জানিস। করতে এসেছিলাম এক কাজ, পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়তে চলেছি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যথারীতি সজাগ হয়ে আমাকে সাবধান করছে, আর না এগোবার জন্য। কিন্তু তোরা তো জানিস, বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় এ শর্মা। তার উপর এখানে আমার দেশের লোকের নাম জড়িয়ে আছে। হলই বা তারা বহু কাল দেশছাড়া। বেশ বুঝতে পারছি, এর শেষ আমাকে দেখতে হবে। সেদিনের মতো মিঃ জর্জিওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পথে মুখোশ পরা দল দু'-একটা দেখলেও ওই দলটাকে আর দেখলাম না, কোথায় গেল তারা?

"সন্ধেবেলা হোটেলের ঘর থেকে গ্র্যান্ড ক্যানালের শোভা দেখছিলাম। সত্যি ওই দৃশ্য যেন এখনও চোখের সামনে ভাসে!" এই বলে পিন্টুমামা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর নিজেই আবার শুরু করল, "জানিস, তিনমাস ধরে প্রতিদিন ওই দৃশ্য দেখেও একদিনের জন্যও একঘেয়ে লাগেনি। কখনও মনে হয়নি, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

"সেদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গ্র্যান্ড ক্যানালে গন্ডোলা, ওয়াটার ট্যাক্সি করে ভেসে যাওয়া অজস্র টুরিস্ট, ক্যানালের ওপারে আলো জ্বলা ভেনিস শহর দেখতে-দেখতে ভাবছিলাম, আর কিছু দিন পরে এই শহর ছেড়ে চলে যাব। মার্কো-কাতিয়ার ঘটনারই মাথামুন্ডু বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আবার এসে পড়ল মিঃ জর্জিওর পড়শি। একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ করেছি, আমরা সাদা চোখে যা দেখি তার আড়ালে কত কিছু যে ঘটে, যা আমাদের বুদ্ধির বাইরে যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না।"

গন্ডোলায় কে?

একটু চুপ করে বসে থাকল পিন্টুমামা। তারপর বলল, "আচমকা দেখি, টুরিস্টদের গন্ডোলাগুলোর থেকে একটু দূর দিয়ে দু'টো গন্ডোলা করে ভারতীয় মুখোশধারীর দলটা যাচ্ছে। সবাই মুখোশ খুলে ফেলেছে। তবে কেউ-কেউ পিঠের উপর, মাথার উপর মুখোশ আটকে রেখেছে বলে চিনতে পারলাম।

"ওদের মধ্যে একটা লোক বেশ লম্বা। মাথার চুলগুলো একসঙ্গে করে ঘাড়ের উপর ঝুঁটি বাঁধা। গালের গভীর কাটা দাগটা আর হাতের মধ্যে উঁচু হয়ে ফুলে থাকা শিরা উপশিরাগুলো দূর থেকেও চোখে পড়ছে। কেন জানি না, একদৃষ্টিতে আমাদের হোটেলের দিকে চেয়ে আছে। লোকটার তাকানোর মধ্যে কী ছিল বলতে পারব না, আমার সঙ্গে যেন চোখাচোখিও হল মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই ওরা দৃষ্টির

আড়ালে চলে গেল। ওর মধ্যেই আমার পিঠে কেমন যেন ঠান্ডা জলের স্রোত বয়ে গেল।

"আগে এই রকম কখনও হয়নি বুঝলি! দূর দিয়ে একটা লোক চলে গেল, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কও নেই, অথচ হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল!

"যাই হোক, মন থেকে সমস্ত ঘটনা ঝেড়ে ফেলে কাজ শুরু করবার চেষ্টা করে দেখি, আজকের ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা মনটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছে।

"ফাইলপত্তর গুছিয়ে মাথাটা ঠান্ডা করব বলে হোটেলের বাগানে হাঁটতে বেরোলাম। দিনটা ছিল শুক্রবার। মার্কো আর কাতিয়ার আসার দিন। এরা এখন দেখছি শুক্রবার রাতেই চলে আসে, শনিবার থেকে রবিবার ফিরে যায়। ওদের এখনও আসার সময় হয়নি। আর-একটু রাতের দিকে আসে এবং আমার ঘরে ঢুকে একটা ভদ্রতাসূচক 'হ্যালো' বলতে ভোলে না।

"হাঁটতে-হাঁটতে বাগানের একদম শেষে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।"

আমাদের কৌতূহলকে একেবারে চরমে পৌঁছে দিয়ে পিন্টুমামা হরিপদদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, বকে-বকে যে মুখে ফেনা উঠে গেল। জলটল কিছু দিবি কি দিবি না?"

হরিপদদা ব্যস্ত হয়ে জলের গেলাস এগিয়ে দিতে পিন্টুমামা ধীরে সুস্থে জল খেয়ে সামনে রাখা মা'র বানানো স্পেশ্যাল ছোট্ট একখিলি পান মুখে ফেলে শুরু করল, "দেখলাম, একটা ছোট বাচ্চার মাপ অনুযায়ী শেপ করে ছোট-ছোট তির মাটিতে পোঁতা। তিরের মাথায় লাল সুতো ঝুলছে। তিরগুলো দেখে আলগা করেই পোঁতা আছে মনে হল। কী জানি কে কী উদ্দেশে পুঁতেছে! একটা তির মাটি থেকে তুলে হাতে নিয়ে দেখার কৌতূহল হচ্ছিল খুবই। কিন্তু এ বিদেশ বলে সাত-পাঁচ ভেবে কৌতূহল দমন করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। শুতে যাওয়ার আগে মার্কো আর কাতিয়া যথারীতি নক করে মুখ বাড়িয়ে হাসিমুখে 'হ্যালো' বলে চলে গেল।

"রাতেও ভাল করে ঘুম হল না। মিঃ জর্জিও তার পড়শির অদ্ভুত বাড়িটা, মুখোশ পরা নাচের দল, গন্ডোলায় ভেসে যাওয়া গালে কাটা দাগ লোকটা, মার্কো-কাতিয়ার প্র্যামটা, লাল সুতো বাঁধা তিরগুলো, সব মিলেমিশে বিকট দুঃস্বপ্ন দেখে ভোরবেলা ঘুম ভাঙল।

"ঘুম থেকে উঠেই কীসের টানে বাগানের দিকে রওনা দিলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, ওই তিরগুলো ঠিক সাধারণ নয়। কী যেন একটা বিপদ সংকেত আছে ওগুলোর মধ্যে।"

হরিপদদা আর থাকতে না পেরে বলল, "তুমি গেলে কেন সাধ করে ওর মধ্যে?"

পিন্টুমামা তার স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া হাসিটা হেসে বলল, "বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যাব? বলিস কী? তখনও শিশিরের ভেজা ভাব রয়েছে বাগানের মাটিতে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, মাটিতে ছোট বাচ্চার পায়ের ছাপ। ভাবলাম, হোটেলের কোনও বোর্ডারের বাচ্চার পায়ের ছাপ হতেই পারে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়েই যাচ্ছে। বাচ্চাটা কি একলাই বাগানের মধ্যে ঘুরছিল? সঙ্গে বড় কেউ ছিল না নাকি? শুধু একজোড়া খুদে পায়ের ছাপ বাগানের শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছে।

"আমিও একটা ঘোরের মধ্যে পায়ের ছাপটাকে অনুসরণ করলাম। কোন দিকে চলেছি বুঝতে পেরে হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তোরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস? আমি থামলাম এসে ওই মানুষের শেপ করে তির পুঁতে রাখা জায়গাটায়।

"বাচ্চাটা এখানে কী করছিল? নিশ্চয়ই তিরগুলো নিয়ে খেলা করেছে। সবক'টাই মাটি থেকে আলগা হয়ে এদিক-ওদিক পড়ে আছে। একটা তির শুধু মাঝখানে গেঁথে আছে। কেমন ধাঁধা লেগে গেল। একলা একটা বাচ্চা রাত্রিবেলা বাগানে এসে খেলা করল, কয়েকটা ধারালো কাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করল, সঙ্গের লোকেরা এত উদাসীন কেন? বাচ্চাটারই তো চোখেটোখে ঢুকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত।

"যাই হোক, মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। সেই দিনটা ছিল শনিবার, এখনও মনে আছে। কাজের চাপও বিশেষ ছিল না। অ্যাকাডেমিয়াতেই একজন রোগীকে একটু দেখে গ্র্যান্ড ক্যানালে ওয়াটার ট্যাক্সিটা করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ভাবতে না চাইলেও নানারকম ভাবনা আসছে মনে। এখন মনে হচ্ছে জলের দূষণটাও মিঃ জর্জিওদের দিকেই বেশি হয়েছিল। প্রথম দিকে ওদিকেই দু'-চারজন মারা গিয়েছিল।

"মার্কো-কাতিয়ার গন্ডোলাটা একটু সরু জলপথ ধরে একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। আমিও কিছু না ভেবেই ওদের পিছন-পিছন আমার ওয়াটার ট্যাক্সিটা নিয়ে ধাওয়া করলাম। বাড়িটার সামনে এসে দেখি, দু'টো জলপথ দু' দিকে গিয়েছে। কোন দিকে যাব বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, ওই ঝুঁটি বাঁধা লোকটা জলের মধ্যে থেকে একটা ড্রামের মতো জিনিস দড়ি দিয়ে টেনে-টেনে তুলছে। এত কাছ থেকে দেখছি বলে লোকটার চেহারার মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। প্রথমত, দূর থেকে যেটা গালের কাটা দাগ বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে গাঢ় খয়েরি ও বেগ্‌নি দিয়ে আঁকা একটা লম্বা দাগ। যেটা অনেকটা তিরের মতো দেখতে। এ ছাড়া লোকটার হাতের শিরা-উপশিরাগুলো হাতের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেগুলো এত গাঢ় লাল রঙের যে, মনে হচ্ছে রক্ত জমে আছে।

"আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কী চাও এখানে? কোনও দরকার আছে কি?'

"লোকটার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা তাচ্ছিল্য, চোখের মধ্যে এমন হিংস্র ঠান্ডা ভাব ছিল যে, সেই দিনের আলোতেও চারপাশে অত লোকের মধ্যে আমার গা শিরশির করে উঠল।

"তার মধ্যেই মনে হল, এবার ভেনিসে এত খাতির পেয়েছি। সবাই মোটামুটি আমার মর্ম বুঝে কদর করেই কথাবার্তা বলছে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে রেডক্রশ চিহ্ন আঁকা সরকারি ট্যাক্সিও রয়েছে। লোকটার কি সেসব চোখে পড়ছে না? এই রকম ব্যবহারও তো পাইনি কারও কাছে। একটু অস্বস্তি হওয়া সত্ত্বেও গলায় সাহস ফুটিয়ে বললাম, 'আমার ইচ্ছে করছে তাই দাঁড়িয়ে আছি। তোমার কি কোনও আপত্তি আছে?'

"লোকটা সেই রকম ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাল চাও তো কেটে পড়ো। নয়তো বিপদে পড়ে যাবে।'

"আশ্চর্য! লোকটা যেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে। সাধারণত ভেনিসের লোকেরা বেশ ফুর্তিবাজ, শান্তিপ্রিয়। এই

লোকটা এল কোথা থেকে? মার্কো-কাতিয়ার গন্ডোলাটাও অদৃশ্য। মনের মধ্যে আর-একটা মন থাকে জানিস তো? সেই মনটা বলতে লাগল, মার্কো-কাতিয়ার পুতুল, জর্জিওর সেই পড়শি, এই অদ্ভুত লোকটা, এই সবক'টার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

"আমি লোকটার সঙ্গে আর বাকবিতণ্ডা না করে সরে এলাম। তোরা ভাবছিস, পিন্টুমামা কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেল! লোকটাও নিশ্চয়ই তাই ভেবেছিল। একটা রোগা, পাতলা ইন্ডিয়ানের আর কত মুরোদ হবে?

"আমি যে একটুও ভয় পাইনি সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যই পালিয়ে এলাম, তাও কিন্তু নয়। আমি ভাবলাম, একেবারে রহস্যের মূল ধরে নাড়া দেওয়া দরকার। সেই জন্য ওয়াটার ট্যাক্সিটা ঝড়ের বেগে চালিয়ে সোজা উপস্থিত হলাম জর্জিওর পড়শির বাড়ির সামনে। বাড়িটার সামনের গলিপথটা যথারীতি শুনশান। একবার ভাবলাম, কাজ নেই ঝঞ্ঝাটে, ফিরেই যাই। এত লোক তো ভেনিসে আসছে, যাচ্ছে। আমারই বা কীসের এত পাগলামি!

"ভাবতে-ভাবতেই সোজা চলে এলাম বাড়িটার সামনে। বাড়ির উঠোনে দেখলাম, বেশ কিছু মুখোশ শুকোচ্ছে। পারে উঠে বাড়িটার একদম সামনে এসে দেখতে পেলাম, ঢলঢলে পোশাক পরা সাদা ধবধবে লম্বা-লম্বা চুল এক মহিলা আপন মনে মুখোশগুলো রং করছে। কথাকলি নাচে যেমন খুব রংচং করে মেকআপ করে, অনেকটা সেই রকম ধাঁচের মুখোশ তৈরি হচ্ছে। সাদা চুলগুলোর জন্য মহিলাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে ঠিকই, তবে ইনিই যে তন্ত্রমন্ত্র জানা সাংঘাতিক ডাকিনী, এরকম কিন্তু আমার মনে হল না।

"আমাকে দেখে হাত থেকে মুখোশটা নামিয়ে বাগানের দরজাটা খুলে দিয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমাকে হতভম্ব করে বলে উঠলেন, 'তুমি যে আসবে আমি জানতাম। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি জানি না দানিশা এতক্ষণে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কি না। আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই কিন্তু!'

"বুঝতেই পারছিস আমার অবস্থা। অবাক বললে কিছুই বলা হয় না। শুধু কোনও রকমে বলতে পারলাম, 'আপনি জানতেন আমি আসব?' "

আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ জানতেন

পিন্টুমামা বলে চলল, "এতক্ষণে আমার সত্যি-সত্যি ভয় করতে শুরু করল। তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তবু একটা লড়াই দেওয়া যায়। কিন্তু পাগলের কাছে তো কোনও জারিজুরিই খাটবে না।

"মহিলা আমার মনের কথা কীভাবে বুঝলেন কে জানে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলেন।

"আমি নিজেই এসেছিলাম কত প্রশ্ন নিয়ে। এখন সে সমস্ত চুলোয় গেল, আর-একটা নতুন রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম, যেটাতে আমিই নায়ক।

"এরকম আর কখনও হয়নি। কোনও রহস্যেরই সমাধান হচ্ছে না। কেবল একটা থেকে আর-একটায় চলে যাচ্ছি। বাড়িটার বেসমেন্ট অর্থাৎ একতলার নীচের তলাটা যে কত রকম অদ্ভুত জিনিসে বোঝাই করা, তা বলার নয়। যে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে নেমে এলাম, সেটা একটা নরম থকথকে জেলির মতো জিনিস দিয়ে তৈরি। হাত দিয়ে ধরলে তুবড়ে যাচ্ছে। আবার ছেড়ে দিলেই আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁচার মধ্যে দু'টো সাপ। দাঁড়ে বসে আছে কাকের মতো দেখতে একটা পাখি। কিন্তু রংটা সাদা। ঘরময় সাদা ইঁদুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ঘন মাকড়সার জাল মশারির মতো ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঝুলছে। তার মধ্যে দিয়ে কোথা থেকে যে আলো আসছে বুঝতে পারছি না।

"ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গেল। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব! কত অদ্ভুত গড়নের মাটির, পেতলের, কাচের বাসন এদিক ওদিক ছড়ানো। এগুলোতে কী হয় কে জানে। কোনওটা রঙিন তরলে ভর্তি, কোনওটা আবার খালি, কোনওটা আবার সোনালি-রুপোলি ছোট-বড় পুঁতির মতো জিনিসে ভর্তি।

"আমাকে এই অবস্থায় রেখে ওই মহিলা ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বিশাল একটা লোহার বাক্সের মধ্যে থেকে একটা পাকানো কাগজের রোল নিয়ে এলেন। রোলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'খুলে দ্যাখো।'

"রোলটা হাতে নিয়েই বুঝলাম, যেটাকে আমি কাগজ ভেবেছি, সেটা একটা কলাপাতা। একেবারে টাটকা সবুজ। বিয়েবাড়িতে পাতপেড়ে খাওয়ালে যেরকম কলাপাতা দেয়, তেমন। অবশ্য তোদের বলা বৃথা। তোরা তো বিয়েবাড়িতে আজকাল আর কলাপাতায় খাস না। কাচের প্লেট হাতে নিয়ে ডাল, ঝোল, চাটনি, একসঙ্গে মেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হালুমহুলুম করে পেটটি ভরিয়ে বাড়ি আসিস! ছোঃ, ওটা একটা খাওয়া হল! যাই হোক, ভেনিসে কলাপাতা দেখে আমি যে আর খুব অবাক হলাম না, সে তো বুঝতেই পারছিস। কারণ, ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে ডিকশনারি থেকে 'অবাক' 'অসম্ভব' 'অদ্ভুত' এই শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।

"তবু বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেললাম, 'আপনাদের এখানে কলাগাছ আছে?'

"মহিলা বললেন, 'এটা তো আমার স্বামীর পূর্বপুরুষের জিনিসপত্রের সঙ্গে তিনশো বছর ধরেই আছে।'

"বোঝ একবার! আমার আরও অবাক হওয়া বাকি ছিল। কলাপাতার রোলটা খুলে দেখি, ভিতরে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা আমার মুখ। চুলটা বাবরি আর গোঁফটা ঝাঁকড়া। এ দু'টো বাদ দিলে মুখটা যে আমারই তাতে সন্দেহ নেই। এর গালেও কালো রং দিয়ে একটা চক্র আঁকা। অনেকটা ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন দেখেছি, তেমন দেখতে। আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'আমাকে প্রথম থেকে সব খুলে না বললে আমার এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা সম্ভব নয়।'

"উনি বললেন, 'চলো, উপরে বসে ভাল করে কথা শুনবে। সে অনেক কথা।'

"আমি বললাম, 'এখানেই বসি। এই ঘরটার মতো এমন আজব জায়গা এর আগে কখনও দেখিনি।'

" 'ঠিক আছে।' এই বলে ভদ্রমহিলা ঘরের কোণ থেকে সবুজ রঙের দু'টো তুলোর বিরাট বল দু' হাতে তুলে এনে আমার সামনে রাখলেন।

"আমি ভাবছি এ আবার কী! ভদ্রমহিলা দেখলাম নির্বিকার

মুখে তার উপর বসে পড়লেন। আমিও সাহস করে ভগবানের নাম ঠুকে বসে পড়ে দেখি, জিনিসটা খুবই আরামদায়ক। যেদিকেই শরীর বাঁকাচ্ছি, ওটা তেমনই শেপ নিচ্ছে। ঠেস দিতে চাইলে পিঠের কাছে উঁচু হচ্ছে। হাত রাখতে ইচ্ছে হলে হাতলের মতো হয়ে যাচ্ছে। নেহাত খারাপ দেখায়, নয়তো জিনিসটা আমার নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'প্রথমে আমারও তোমার মতো অদ্ভুত লেগেছিল। এই ঘরটাই তো প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে কৃষ্ণসাগর পার হয়ে এদেশে এসে পৌঁছন প্রায় তিনশো বছর আগে। পথে তুরস্ক থেকে তাঁর সঙ্গী হয় ত্রিদিবেশ। এই যে মুরো, বুরোনো আর টর্সেলো, এই তিনটে দ্বীপ দেখছ, এগুলো তখন একেবারেই জনমানবহীন। টর্সেলোতে তোমরা যেটাকে ভেনিসের সবচেয়ে পুরনো চার্চ বলো, আমার বাড়ির পিছনের ছোট্ট চার্চটা কিন্তু তার চেয়েও পুরনো। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ এই টর্সেলো দ্বীপেই আস্তানা গাড়লেন। ঠিক এই যেখানে আমরা বসে আছি, এটাই তাঁর ঘর ছিল। বাকি বাড়িটা পরবর্তী বংশধরেরা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলেন। আমার স্বামীর সেই পূর্বপুরুষের নাম ছিল পরমেশ।'

"পরমেশ অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে উনি বহু রকমের জাদু শিখেছিলেন। বহু গুণী মানুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শেষে অন্যান্য দেশের বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য উনি তুরস্কে আসেন।

"সেই সময় ভেনিসের বন্দর ব্যবসাবাণিজ্যে একেবারে গমগম করছে।"

পিন্টুমামা মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, "ওদের জিজ্ঞেস করা বৃথা। কিন্তু আশা করি পৃথিবীর মানচিত্রে ভেনিসের অবস্থান এবং তার ইম্পর্ট্যান্স সম্বন্ধে তোমার কিছু-কিছু জানা আছে।"

মা ভয়ে-ভয়ে বললেন, "ভেনিসটা কোথায় তা জানি, কিন্তু কেন ইম্পর্ট্যান্ট তা বলতে পারব না।"

পিন্টুমামা বেশ খুশি হয়ে তাকিয়াটা কোলের উপর টেনে গুছিয়ে বসে তিন নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "তোমাদের একটু গোড়ার কথা বলে নিই তা হলে। তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে, কীভাবে পরমেশ হঠাৎ ভেনিসে এসে হাজির হয়েছিল।"

তারপর আমার আর তুলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাবছিস, ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি কেন? গল্পের ফাঁকে চালাকি করে তোদের ইতিহাস, ভূগোল শিখিয়ে দিচ্ছি কি না। এই ভেবেও ভয় পাচ্ছিস বোধ হয়। ভয় পাস না, শুধু গল্পের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই বলব তোদের।"

পরমেশের ভেনিসে আগমন

পিন্টুমামা বলল, "পনেরো শতকের মাঝামাঝি থেকেই ভেনিস খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তখন ডিউকের আমল। ভেনিস থেকে জাহাজ দিগ্‌বিদিকে পাড়ি দিচ্ছে। ইস্তাম্বুল থেকে নিয়ে আসছে নোনতা মাছ, ধাতু, ফটকিরি। আফ্রিকা থেকে জাহাজ ভর্তি সোনা, রুপো। বেইরুট, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসছে মশলা আর তুলো।

"অতএব বুঝতেই পারছিস, ভেনিস পোর্ট তোদের একশোটা খিদিরপুর ডক এক করলে যা হবে, সেইরকম গমগম করছে তখন। ওই রকমই কোনও একটা বাণিজ্যজাহাজে পরমেশ ইস্তাম্বুল থেকে ভেনিসে এসে পৌঁছয় এবং যা বুঝলাম, নিরিবিলি বলে টর্সেলো দ্বীপে এসে আস্তানা গাড়ে। সঙ্গী ছিল ত্রিদিবেশ। সে কিন্তু ভারতবর্ষের লোক ছিল না। ত্রিদিবেশও মধ্য এশিয়ার কিছু-কিছু জাদু রপ্ত করেছিল। কিন্তু পরমেশের বিদ্যার কাছে তা কিছুই নয়। সেই জন্য পরমেশকে দেখামাত্র সে তার সঙ্গে ভেনিস পর্যন্ত চলে এল। আমি জিনার কাছে যেমনটা শুনেছি, তোদের হুবহু তাই বর্ণনা করছি। জানিসই তো, স্মরণিকার দৌলতে আমার স্মৃতিশক্তি কীরকম প্রখর!

"তা পরমেশ লোকটি গুণী হলেও বড্ড সাদাসিধে ভাল মানুষ ছিল। সে জাদুবিদ্যার সঙ্গে নানারকম গাছগাছড়া শিকড়বাকড়ের গুণাবলি খুব ভালরকম জানত। সব সময় সে যে জাদুর আশ্রয় নিত তা নয়, বরং পারতপক্ষে সে ওদিকে যেতই না। কিন্তু শিকড়ের রস, ফুল-পাতার মিশ্রণ, নানারকম ধাতবচূর্ণ এবং মন্ত্রের গুণাবলি দিয়ে এমন সব কাজ করত যে, এদিকের লোকেরা চমকে যেত। ভাবত, সাংঘাতিক কোনও ইন্দ্রজাল।"

পিন্টুমামা আমাকে বলল, "মনে আছে ঝন্টে, একবার তোর ডেস্কের তালা খুলে দিয়েছিলাম?"

আমার মনে পড়ল, তাই তো! পিন্টুমামা যেন কী একটা তরল মতো জিনিস তালার ফুটোয় ঢেলে দিয়েছিল, আর তালাটা খুলে গিয়েছিল। মামা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ম্যাজিক।' আমি অনেক চাপাচাপি করা সত্ত্বেও আমাকে বলেনি তালার ফুটোয় কী ঢেলেছিল।

আমি ঘাড় নাড়তে পিন্টুমামা বলল, "একটা প্রাচীন পুঁথিতে পেয়েছিলাম, তালোদ্‌ঘাটিনী মন্ত্র আর কীলকমুক্ত শিকড়ের সন্ধান। পৃথিবীর এমন কোনও তালা নেই, যা আমি এ দু'টো জিনিসের সাহায্য নিলে খুলতে পারব না। কিন্তু আমি কি তাই করছি? শক্তির কখনও অপচয় করতে নেই। এখন বুঝতে পারি, কার রক্ত বইছে আমার শরীরে। সত্যিকারের গুণী লোক ছিল ওই পরমেশ। নয়তো তিনশো বছর আগে কী করে ছবি এঁকে বলে দিয়েছিল, ঘোর বিপদের দিনে আমার এ দ্বীপে উদয় হবে।

"তা যা বলছিলাম, পরমেশ তো টর্সেলো দ্বীপে জমিয়ে বসল। নিজের খেয়ালে নানারকম জিনিস সৃষ্টি করে আর বিপদেআপদে স্থানীয় লোকদের সাহায্য করে। জিনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সে স্থানীয় ডাকিনীবিদ্যাও খুব অল্প দিনের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। দু'জনেই এখানকার মেয়ে বিয়ে-থা করে সংসার পাতে। ত্রিদিবেশ ছিল পরমেশের ঠিক উলটো। লোভী, হিংসুটে আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে ভাল মানুষ সেজে পরমেশের সঙ্গে লোকের ক্ষতি করতে লাগল। টাকার বদলে লোকে তাকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাতে লাগল। পরমেশ সেসব কিছুই টের পেত না। সে নিজের ঘরে বসে নানারকম জিনিস সৃষ্টি করেই আনন্দ পেত।

"এদিকে ত্রিদিবেশের কার্যকলাপ ডিউকের কানে গিয়ে পৌঁছয় যথাসময়ে। টর্সেলো দ্বীপে দু'জন বিদেশি জাদুবিদ্যা খাটিয়ে ডিউককে পর্যন্ত হারিয়ে গদি দখল করতে পারে, এই রকম একটা কথা রটে গেল। ডিউক ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি সৈন্য পাঠাল টর্সেলো

দ্বীপে। ত্রিদিবেশ একটা মশলার জাহাজে করে পালিয়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়া। ধরা পড়ল নিরপরাধ অপ্রস্তুত পরমেশ। হাজতে যাওয়ার আগে ডিউকের সৈন্যরা উপরওলার নির্দেশমতো তাকে একটা আলপিনও নিতে দিল না। গন্ডোলায় উঠবার আগে পরমেশের ষোলো বছরের ছেলে বাবাকে বিদায় দেওয়ার আগে জড়িয়ে ধরে হাতের কাছে যা পড়েছিল, সেই রকম দু'-একটা জিনিস তাড়াহুড়ো করে পাচার করতে পেরেছিল। পরমেশের সবচেয়ে দরকারি জিনিসটা কিন্তু বাড়িতেই রয়ে গেল।"

পরমেশের পরিবর্তন

পিন্টুমামা বলল, "এই ভারতীয় গুণী খুবই ভয়ংকর, এই বলে ডিউককে তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বেজায় ভয় দেখিয়েছিল। ডিউক পরমেশকে প্রথমে সাধারণ জেলখানাতেই রেখেছিল। সেখানে সে আপনমনে পুতুল, মুখোশ ইত্যাদি তৈরি করত। অন্য বন্দিদের মতো নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি, ঝগড়া, কাজিয়ায় দিন কাটাত না।

"এদিকে সেই জেলখানার মধ্যে কয়েকটা অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কোনও কয়েদি নাকি বোধ হয় উপরওয়ালা উসকানিতেই পরমেশকে মারতে এসেছিল। কিন্তু পরমেশের কাছাকাছি আসতেই তার হাত-পা এমন চুলকোতে লাগল যে, সে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"তা ছাড়া প্রায়ই দেখা যেত, সে একটা অদ্ভুত সরু নলের মতো জিনিসে ফুঁ দিয়ে কেমন আওয়াজ বের করছে, আর সামনে রাখা পুতুলগুলো নাচানাচি করছে।"

পিন্টুমামা একটু থেমে বলল, "তোরা ভাবছিস, এ আর এমন কী ব্যাপার! বাঁশি বাজিয়ে পুতুলনাচ তো হতেই পারে। কিন্তু একবার ভেবে দ্যাখ, তিনশো বছর আগে প্রায় অদৃশ্য সুতোর টানে পুতুলনাচ ক'টা লোক জানত? তারপর দেখছে কারা? কয়েকটি অশিক্ষিত চোর-ছ্যাঁচড়। অতএব বুঝতে পারছিস, পরমেশের কাণ্ডকারখানা ডালপালায় পল্লবিত হয়ে আবার ডিউকের কানে গিয়ে উঠল। ডিউক যদি একটু বুদ্ধি খাটাতেন, পরমেশকে ডেকে ভাল করে সব কথা জিজ্ঞেস করতেন, তা হলেই গোল মিটে যেত। তোদের তো বলেইছি, পরমেশ জাদু জানলেও সে তা পারতপক্ষে প্রয়োগ করত না।"

তুলি জিজ্ঞেস করল, "পুতুলনাচের ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু ওই লোকটার হাত-পা চুলকোচ্ছিল কেন?"

পিন্টুমামা উদাস স্বরে বলল, "আমার দুঃখ হয়, যখন দেখি আমাদের দেশের 'ভেষজাখ্যান' বইটার কথা জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরাও জানেন না। কী নেই সেখানে? শুধু ফুল, ফল, শিকড়, গাছের ছাল দিয়ে শত্রু থেকে রোগ, সবই সুন্দর মোকাবিলা করা যায়, তা জানিস? চিলিকাংশ গাছের ছালের গুঁড়ো ছড়িয়ে শত্রুকে এইভাবে ঘায়েল করা যায়। সে গা-হাত-পা চুলকে একেবারে পাগল হয়ে যাবে।"

হরিপদদা বোকার মতো বলে ফেলল, "আর যে ছড়াবে তার

কিছু হবে না বুঝি?"

আমরা কিছু জানতে চাইলে পিন্টুমামা বিশদ করে বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বললে ভয়ানক রেগে যায়। এবারও তাই হল। মামা বলল, "চিলিকাংশ গাছের ছাল হাতে নিলে তোর মতো লোক তো মরেই যাবে। ও নাড়াচাড়া করা কি তোর মতো আকাট লোকের কর্ম?" তারপর ওঠার ভঙ্গি করে বলল, "গল্পটা আজ থাক। তোরা হাত-পা চুলকো। আমি উঠি।"

আমি তাড়াতাড়ি মামাকে ঠান্ডা করবার জন্য বললাম, "তুমি কী করে এত জানলে বলো তো? পরমেশ না হয় জাদুকর ছিল। তার কাজই ছিল ওসব ঘাঁটাঘাঁটি করা। তুমি ভেষজাখ্যানটা পেলেই বা কোথায়?"

গলার স্বরে বুঝতে পারি, পিন্টুমামা একটু ঠান্ডা হয়েছে। আবার তাকিয়াটা টেনে গুছিয়ে বসে শুরু করল, "ভেষজাখ্যান পাওয়ার গল্প তো এক মহাভারত। সে আর-একদিন হবে। তবে আমার এই শিকড়বাকড়, প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, এসব বিষয়ে এত উৎসাহ কী করে হল যখন ভাবি, তখন ভেনিসের টর্সেলো দ্বীপের সেই অদ্ভুত ঘরে কলাপাতায় আঁকা আমার মুখটা মনে পড়ে যায়। তোদের বলছি বটে আমার মুখ, কিন্তু আমি শিওর, ওটা আমার পূর্বপুরুষ পরমেশেরই মুখ। ওরকম বাবরি চুল, ভোজপুরি গোঁফ, আর কপালে তিলক, তিনশো বছর আগের ফ্যাশন। তবে ওই যা বললাম, ভেষজে উৎসাহটা নিশ্চয়ই পেয়েছি ওই পূর্বপুরুষেরই কল্যাণে। আর-একটা কথা কী জানিস, এই যে আমার জীবনে পদে-পদে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছি, নিজেরই আশ্চর্য লেগেছে। মনে হয়েছে ম্যাজিক। এখন মনে হয়, এর পিছনে সত্যি-সত্যি কোনও ইন্দ্রজাল কাজ করছে।

"হ্যাঁ, তারপর যেন কী বলছিলাম, পরমেশের কথা! পরমেশের এই সব কার্যকলাপ ডিউকের কানে সাতকাহন করে লাগাবার লোকের তো অভাব ছিল না। অবশ্য ওদেরও দোষ নেই। ভারতবর্ষ যে তখন এসব ব্যাপারে অনেক এগিয়ে ছিল তা তো বুঝতেই পারছিস। পরমেশের বহু কার্যকলাপের পিছনেই যে সহজ বিজ্ঞান কাজ করেছে, তা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। এইবার ডিউক ভয় পেয়ে পরমেশের জন্য এমন একটা জেলখানা তৈরি করলেন, যা আগে কেউ দেখেনি। ডিউকের প্রাসাদের তলায় সরু অন্ধকার গলিপথের শেষে জলের উপর একটা অন্ধ কুঠুরিতে পরমেশকে বন্দি করে রাখা হল। সেই কুঠুরির চারদিকে শুধু জল আর জল। একটা ছোট্ট ফোকর দিয়ে দেখা যায় গন্ডোলায় চড়ে লোকজন যাচ্ছে। টর্সেলো দ্বীপের তুলনায় সেন্টমার্ক স্কোয়ার অনেক বেশি জমজমাট। পরমেশ সারাক্ষণ চারপাশের লোকজন, বাইরের মুক্তজীবনের আভাস পায়। তার নিজের ছেলে-বউদের কথা মনে পড়ে, কিন্তু সে নিজে বিনা দোষে বন্দি। আস্তে-আস্তে শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ পরমেশ বদলে যেতে লাগল। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল চারপাশে ঘুরে বেড়ানো স্বাধীন, নিরীহ ভেনিসবাসীর উপরে। তার মনে হল, এরা তার থেকে দরকারের সময় সুবিধে নিয়েছে অথচ আজ তার বিপদের দিনে কারওর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

"এটা বোধ হয় জানিস না, শান্ত, ভাল মানুষেরা যখন রেগে যায়, তখন তাদের সামলানো মুশকিল। পরমেশের ক্ষেত্রেও তাই হল। সে আগে কখনও যা ভাবেনি, এবার তাই করবার কথা ভাবল। পরমেশ ঠিক করল, ভেনিসবাসীর উপর এমন প্রতিশোধ নেবে, যার প্রভাব তার মৃত্যুর পরও বজায় থাকবে।

"তার কাছে সামান্য যা জিনিস ছিল তাই দিয়ে সে এমন একটা অশুভ শক্তির আধার বানিয়েছিল, যার জন্য পরে সে অনুতাপ করেছে। কিন্তু তখন পুরো ব্যাপারটাই তার হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল।"

তুলি আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "এমন গুণী মানুষ, ইচ্ছে করলে তো নিজেই নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারতেন। ডিউকের সাধ্য ছিল না ওঁকে ধরে রাখেন।"

কী ভাগ্য, পিন্টুমামা এবার আর রাগ না করে বলল, "সেই প্রশ্ন কি আমার মনেও জাগেনি ভাবছিস? আমিও জিনাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"জিনা বলেছিল, 'আচমকা হাজতে যাওয়ায় অপ্রস্তুত পরমেশ খানিকটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। যে মন্ত্রনীলকের জোরে তার তন্ত্রমন্ত্র কাজ করে, সেই মন্ত্রনীলক সে হাজতে নিয়ে যেতে পারেনি।'

"মন্ত্রনীলক শব্দটা এই প্রথম শুনলাম বলে জিজ্ঞেস করলাম, 'জিনিসটা কী?'

"জিনা বলল, 'সেটা আমি অন্তত জানি না। আর কেউ যে সেটা চোখে দেখেছে এমনও শুনিনি।'

"মন্ত্রনীলক যে কীভাবে খোয়া গেল সে বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। পরমেশও কাউকে কিছু বলে যায়নি।

"জিনা বলে চলল, 'ইতিমধ্যে হাওয়া ঠান্ডা হয়েছে দেখে ত্রিদিবেশ ফিরে এসেছে। পরমেশের পরিবারের কাছে গিয়ে শোকপ্রকাশ করে হাজতে পরমেশের সঙ্গে মুলাকাতও করেছে। পরমেশের অবস্থা দেখে দুঃখিত ত্রিদিবেশ নিজে থেকেই পরমেশের পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। আগে যাই করে থাকুক, এখন বিপদের দিনে যথার্থ বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াল। হয়তো পরমেশের এই অবস্থার জন্য সে অনেকটা দায়ী বলে তার মনেও অনুতাপ হয়েছিল। পরমেশের ছেলেকে সে আরও কয়েকরকম জাদু এবং মন্ত্রতন্ত্রে খানিকটা তালিম দেয়।'

"জিনা বলল, 'আমাদের কাজকর্মের মধ্যে সেই জন্য ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য এশিয়ারও ছাপ তুমি লক্ষ করে থাকবে। সে যাই হোক, ত্রিদিবেশ আসায় অবস্থাটা অনেকটা ভল হয়।'

"এবারে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই পর্যন্ত যা বললে বোঝা গেল। এর মধ্যে আমি এলাম কোথা থেকে?'

"জিনা বলল, 'আমি আর কিছু জানি না। শুধু এইটুকু বংশপরম্পরায় শুনে আসছি, একদিন ওই ছবির মতো দেখতে একজন আসবে। সে এলে সমস্যার সমাধান হবে।'

"জিনাকে বললাম, 'এক-এক করে বলো। আগে পরমেশের কথা শেষ করো। শেষ পর্যন্ত তার কী হয়েছিল? পরে সমস্যার কথা শুনব।'

" 'পরমেশের কথা সবটা শুনলে পরে সমস্যাটা হয়তো বুঝতে পারবে। দীর্ঘদিন হাজতে বাস করার ফলে পরমেশের কঠিন অসুখ হয়। আমাদের ধারণা, ডিউক একেবারে মেরে ফেলতে ভয় পেয়েছিল বলে দীর্ঘদিন ধরে খাবারের মধ্যে অল্প-অল্প বিষ

মিশিয়ে দিয়ে পরমেশকে শক্তিহীন করতে চেয়েছিল এবং তাতে বেশ সফলও হয়েছিল।'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পরমেশের ঠিক কী হয়েছিল বলো তো?'

"জিনা বলল, 'আমরা তো মুখে-মুখে এত সব কথা শুনেছি। অদলবদল হয়ে যেতেই পারে। কেউ বলে, ডিউকের লোক মারধোর করে পরমেশের পা ভেঙে দিয়েছিল। কেউ বলেছে, গনগনে লোহার পাত চোখের খুব কাছে ধরে থাকার জন্য পরমেশ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মোট কথা, পরমেশের মৃত্যুর আর দেরি নেই এবং তার থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বুঝে ডিউক যখন তাকে ছেড়ে দিল, তারপর সত্যিই সে আর বেশিদিন বাঁচেনি।'

"আমি ডাক্তারি বুদ্ধি দিয়ে জিনার থেকে যা বুঝলাম, দীর্ঘদিন ওই অন্ধ কুঠুরিতে বন্ধ থেকে, হাঁটাচলা না করে পরমেশের দু'টো পা-ই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। আর হাজতের অস্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং পরিবেশ, তার সঙ্গে মনোকষ্ট, সব মিলিয়ে চোখের অসুখ হওয়াও বিচিত্র নয়।

"জিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শেষ ক'টা দিন পরমেশ কি শুয়েই থাকতেন?'

" 'আমরা শুনেছি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই ঘরে কাটিয়েছেন। সেই সময়েই এই ছবিটা এঁকেছেন। আরও দু'-একটা জিনিস তৈরি করেছিলেন, যা সেই থেকে ওই বাক্সের মধ্যেই আছে।'

" 'তোমাদের বংশের আর কেউ কখনও জিনিসগুলো ব্যবহার করবার চেষ্টা করেনি?'

" 'হয়তো করেছিল, তবে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। পরমেশ নিজে মৃত্যুর দিন গুনলেও, ছেলেকে বলে গিয়েছিল, 'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার কাজের মধ্যেই তার সংকেত আছে। সময় হলে উপযুক্ত কেউ এসে সমস্যার মোকাবিলা করবে।'

"জিনাকে বললাম, 'এবার বলো, পরমেশ কী পাপ করেছিল?'

" 'হাজতে থাকতে তিনি নাকি রাগের মাথায় এমন একটা জিনিস তৈরি করেছিলেন, যার অপশক্তি ধারণ করবার ক্ষমতা আছে। বছরের পর বছর শক্তি সঞ্চয় করে সেই জিনিস মানুষের ক্ষতি করতে পারে।'

" 'পরমেশই বানিয়েছিলেন যখন, উনি নিশ্চয়ই জানতেন কীভাবে সেই শক্তি নষ্ট করে দেওয়া যায়।'

" 'জানারই তো কথা। কিন্তু যা দিয়ে নষ্ট করবেন সেই আসল জিনিস, মস্ত্রনীলকই নাকি উনি আর খুঁজে পাননি।'

" 'ত্রিদিবেশ তখন কী করছিল? এ ব্যাপারে উনি ত্রিদিবেশের সাহায্য চাইলেন না কেন?'

" 'সেটাই তো আশ্চর্য। পরমেশ হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ামাত্র ত্রিদিবেশ উধাও হয়ে গেল। তার কথা আর জানাই যায়নি। পরমেশের মৃত্যুর পর ডিউকও আর উৎপাত করেনি। আমরা বংশপরম্পরায় শুনে-শুনে যেটুকু জেনেছি, ওই ছবির মতো দেখতে একজন এসে পরমেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

" 'এবারে শুনি তোমাদের সমস্যাটা কী?'

" 'এতদিন কোনও গোলমাল ছিল না। আমার স্বামীর পরিবার বরাবর জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে বিশেষ কেউ মেশে না। আমাদেরও কাউকে প্রয়োজন হয় না। দু'-চারজন শিখতে আসে। সত্যি কথা বলতে কী, লোকে আমাদের যতটা ভয়ংকর ভাবে আমরা ততটা খারাপ নই। দু'-চার রকমের পুতুল, মুখোশ তৈরি করা, তার সঙ্গে দু'-চারটে ম্যাজিক, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, প্রধানত এই সবই চর্চা হত। আমার স্বামী ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্র কিছু-কিছু জানলেও সেগুলো কাউকে শেখাতে চাইতেন না।'

" 'তা এর মধ্যে সমস্যাটা কোথায়?'

" 'যারা শিখতে আসে সকলেই যে খুব ভাল মন নিয়ে আসে, তা তো নয়। কেউ-কেউ তুকতাক শিখে সস্তায় বাজিমাত করতে চায়। এই বিদ্যার একটা বিপদের দিক আছে এটা তো মানবে। বদলোকেরা এর অপপ্রয়োগ করবার লোভ সামলাতে পারে না। এই সমস্যা আগেও হয়েছে। আমার স্বামী বেঁচে থাকতেই দানিশা বেগড়বাঁই করছিল।'

" 'দানিশা কি তোমার স্বামীর ছাত্র ছিল?'

" 'ও অনেক পরে এখানে আসে। মিড্‌ল ইস্টের কোথায় যেন ওর বাড়ি। মুখোশ তৈরি এবং আরও দু'-একটা জিনিস শিখবে বলে আমার স্বামীর কাছে এসে ভর্তি হল।'

" 'তারপর?'

" 'আমাদের তো দেখছ, ছেলেপুলে নেই। একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল আমাদের বাড়িতে। দানিশা প্রথমে হাত পাকাবার জন্য সেই কুকুরেরই একটা মুখোশ তৈরি করল। একদম এক রকম। পাশাপাশি দু'টো মুখ দেখলে কোনটা আসল আর কোনটা নকল ধরতে পারবে না। আচমকা আমাদের কুকুরটা মরে গেল। আমাদের খুবই দুঃখ হল। সেই জন্য আমার স্বামী দানিশার থেকে সেই মুখোশটা চেয়ে নিলেন। সেই মুখোশটা আসার পর এখানে দু'-একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।' "

পিন্টুমামা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঝন্টে, এই জীবনে কত রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে তো গেলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি কতবার, ভয় কাকে বলে এই শর্মা জানে না। কিন্তু এই অদ্ভুত ঘরটার মধ্যে বসে থাকতে-থাকতে আমার মনে হচ্ছিল, আমার চারপাশেও যেন নানারকম ম্যাজিক ঘটে চলেছে। দু'শো-তিনশো বছর ধরে আদ্যন্ত আধুনিক পৃথিবীর সেরা পর্যটন কেন্দ্রে এই ঝকঝকে শহরটার ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কী যে ঘটে যাচ্ছে তা কেউ জানে না। বাস্তব-অবাস্তব, কল্পনা-ইন্দ্রজালে মেশা এ কোন জগতে এসে পড়লাম? যত এর থেকে বেরোতে চাইছি, আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছি। এসেছিলাম, মার্কো-কাতিয়ার পুতুলের রহস্যভেদ করতে। এখন জড়িয়ে পড়লাম পরমেশ, ত্রিদিবেশ, দানিশা এদের নিয়ে, যাদের সঙ্গে আপাতত আমার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই।

"ধুত্তেরি বলে উঠে পড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু তোরা তো জানিস, এতদিন ধরে আমাকে দেখছিস, ব্যাপার যতই ঘোরাল এবং গোলমেলে হয় ততই আমার আকর্ষণ বাড়তে থাকে।

"আবার জিনার কথায় ফিরে যাই। সে বলেছিল, 'মুখোশটা এনে আমাদের শোক একটু কমল বুঝতেই পারছ। মুখোশটা আমরা খেতে বসলে খাবার টেবিলে থাকে। রাত্রিবেলা সদর দরজার উপরে টাঙিয়ে দিয়ে ঘুমোতে যাই।

" 'আমাদের বাড়িটা দেখছ তো, পাড়াপড়শি থেকে একটু দূরে। পড়শিরা কেন জানি না, বরাবরই আমাদের একটু এড়িয়ে চলে।

হয়তো আমাদের তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল নিয়ে কাজ কারবার সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না। তাতে আমাদের কোনও অসুবিধে ছিল না। আমরাও খুব একটা মেলামেশা করি না কারও সঙ্গে। রাস্তায় দেখা হলে 'হাই' 'হ্যালো' পর্যন্তই ভাব ছিল। কিন্তু এবার যেটা শুরু হল, তাতে আমাদের আর পড়শিদের মধ্যে সম্পর্কটা ক্রমশই বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একদিন মিঃ জর্জিও আমাদের বাগানটা পর্যন্ত হেঁটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কুকুরটা মারা গিয়েছিল বলে জানতাম। সে খবর কি সত্যি নয়?'

" 'এই প্রশ্নটার মানে কী সেটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেল। আমার স্বামী বললেন, 'হঠাৎ তুমি এরকম একটা কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

" 'কারণ, রাত্রিবেলা তোমাদের বাড়ির ভিতর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে। আর সেটা কোনও বাচ্চা কুকুরের গলা নয়, এগজাক্টলি তোমাদের যে কুকুরটা ছিল তারই গলা।

" 'আমার স্বামী তখনকার মতো, 'তুমি ভুল শুনেছ। রাত্রিবেলা দূরের আওয়াজও খুব কাছের শোনায়। দ্যাখো, কোনও টুরিস্টের সঙ্গে হয়তো তার কুকুরও এসেছে। আমাদের কাছাকাছি বাড়িতে।' জর্জিওকে এই সব বলে বিদায় করলেও, আমার স্বামী নিজে যে একটু চিন্তিত হননি, এমন নয়। আর জর্জিওর মুখের ভাবে অবিশ্বাস, ভয়, কৌতূহল, সব মিশিয়ে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল সেটাও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো, আমরা কিন্তু কিছু শুনতে পেতাম না।'

" 'এর কয়েক দিন পর মিঃ অ্যান্টনিওর বাড়ির পোষা বিড়ালটাকে দেখা গেল বাগানের ধারে মরে পড়ে আছে। ঘাড়ের কাছে ধারাল দাঁতের দাগ। কোনও জন্তু ঘাড়-গলার মাংস খুবলে খেয়ে নিয়েছে। অ্যান্টনিওর বিড়ালটা বেশ বড়সড় একটা হুলো বিড়াল ছিল। ওটাকে ঘায়েল করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। পাড়ার মধ্যে হঠাৎ কোনও জন্তুর আবির্ভাব হল? আমরা সকলে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।'

"তুই বিশ্বাস করবি না ঝন্টে, আমার সঙ্গে-সঙ্গে গ্যালারিয়া হোটেলের মাসির কথা মনে পড়ে গেল। তার অবশ্য কেউ মাংস খুবলে নেয়নি, কিন্তু ঘাড়টা বীভৎসভাবে মটকে দিয়েছিল।"

তুলি আমার গা ঘেঁসে সরে বসল। দেখলাম, ওর হাত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

পিন্টুমামা আবার জিনার কথায় ফিরে গিয়েছে, " 'অ্যান্টনিওর বিড়ালটা মারা যাওয়ার পর আমার স্বামী একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেশিরভাগ সময় এই ঘরে কাটাতে লাগলেন। পরমেশের রেখে যাওয়া একটা সিন্দুক আছে ঘরের কোণে, যার ভিতর থেকে আমি তোমার ছবিটা বের করলাম, সেই সিন্দুকের জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে কাটিয়ে দিলেন ক'টা দিন। আমাকে একদিন বললেন, 'যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয় তবে খুব বিপদ।'

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার রাস্তা পরমেশ কিছু বাতলে যাননি?'

" 'সময় পেলেন কোথায়? আমাদের বাবা-ঠাকুরদার কাছে শুনে-শুনে জানি তো সবই, কিন্তু মোকাবিলা করার উপায় কী, তা তো জানা নেই। জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে একটা তামার পাতের মধ্যে এই পাতায় আঁকা ছবিটা পেলাম। তলায় দ্যাখো, লেখা আছে 'প্রেতসিদ্ধাইকে পরাস্ত করবে।' এ কে, কোথায় থাকে, কিছুই জানি না। কোথায় খুঁজব আমরা?

" 'আমার স্বামী দানিশার কাছে খবর পাঠালেন কুকুরের মুখোশটা নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল। হয়তো সেটা না ঘটলে আমার স্বামী এখনও বেঁচে থাকতেন। একদিন দুপুরবেলা আমরা বাড়ির ভিতরে বিশ্রাম করছি, এই সময় বাইরে বিকট চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসে যা দেখলাম, তাতে আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি, একটা বাচ্চা মেয়ে জর্জিওর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। খেলতে-খেলতে ফাঁকা রাস্তা দেখে আমাদের বাড়ির সামনে আসা মাত্রই নাকি একটা কুকুর আমাদের বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে বাচ্চা মেয়েটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিছন-পিছন বাচ্চাটার মা আসবার আগেই গালের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে কুকুরটা কোন দিকে যে পালাল, সেটা দেখবার আগেই মেয়ের অবস্থা দেখে মা একটা বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান।

" 'অন্যরা যখন মা-মেয়ের চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত, তখন জর্জিও অ্যান্টনিও এবং আরও কয়েকজন আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে এল। জানো, এই প্রথম পড়শিরা আমাদের বাড়ির মধ্যে পা দিল। তুমি যদি ওদের চোখ-মুখ দেখতে! ঢুকেই ভেবেছিল বমাল গ্রেপ্তার করবে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে সকলেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের বাড়িটা সাধারণ লোকের পক্ষে একটু শকিং তো বটেই।

" 'আমার স্বামী বললেন, 'আমাদের বাড়িতে কোনও কুকুর নেই। তোমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দ্যাখো আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়।'

" 'তারা খুঁজে পেল না ঠিকই, কিন্তু আমাদের কথাও বিশ্বাস করল না। এর পর থেকে পড়শিরা আমাদের শুধু ভয় নয়, যেন ঘেন্নাও করতে শুরু করল। তারা ভাবল, আমরা এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির যে, শুধু-শুধু নিরীহ ফুলের মতো সুন্দর বাচ্চাদেরও অনায়াসে মেরে ফেলতে পারি। প্রমাণ নেই বলে ঠিক আইন-আদালত করতে পারল না। কিন্তু ভারত বা ভারতবাসী সম্বন্ধে ওদের একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠল।'

"জর্জিওর আমার ওষুধ খেতে অপত্তিটা কোথায় ছিল সেই রহস্যটা আমার কাছে এত দিনে পরিষ্কার হল।

"জিনাকে বললাম, 'তোমরা দানিশাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে!"

" 'দানিশাকে পাব কোথায়? টর্সেলো থেকে মার্কস্কোয়ার পথও তো কম নয়। তবু এর মধ্যেই আমার স্বামীর এক ছাত্র খবর আনল, দানিশা গিয়েছে পম্পেই। ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। পুরনো শহর খানিকটা বেরিয়ে এসেছে। অনেকটাই এখনও আট-দশ ফুট পোড়া শক্ত পাথুরে ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে আছে। দানিশা সেখানে গিয়েছে লাভায় চাপা পড়া আস্ত একখানি মনুষ্য করোটির খোঁজে। তার নাকি কী দরকার আছে।

" 'এইবার আমার স্বামী সত্যি-সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'দানিশা কি তা হলে প্রেতসিদ্ধ হয়ে গেল? যত দূর

জানি, পরমেশ এই বিদ্যা জানতেন। কিন্তু এর ক্ষতিকারক দিকটার কথা চিন্তা করে তিনি কাউকেই এই বিদ্যা শিখিয়ে যাননি। এদেশে কারও জানার কথাও নয়। তা হলে দানিশা কোথা থেকে শিখল?'

প্রেতসিদ্ধর সন্ধানে

"আমি জিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই প্রেতসিদ্ধ ব্যাপারটা কী?'

"জিনা খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি জানো না? আমাদের ধারণা, ভারতবর্ষের অনেকেই জানে এবং তারা এও জানে প্রেতসিদ্ধর হাত থেকে কী করে রেহাই পেতে হয়।'

"আমি তো জিনার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম।

"জিনা বলল, 'আমি আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, প্রেতসিদ্ধ খুব সহজেই আত্মা বদলাবদলি করে নিতে পারে।'

" 'কী রকম?'

" 'পরিচিত লোকের গলার স্বর নকল করে মাঝরাতে ডাকে। ভুল করে উত্তর দিলেই আত্মা বদলাবদলি হয়ে যায়। আবার হুবহু এক রকম চেহারা করেও আত্মা বদলে নেওয়া যায়।

" 'আমার স্বামীর স্থির বিশ্বাস হল, দানিশা প্রেতসিদ্ধ হয়ে তার মুখোশটার সঙ্গে আমাদের কুকুরের আত্মা বদলাবদলি করে নিয়েছে। যেভাবে সে ছোট মেয়েটিকে আক্রমণ করেছে তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শিগগিরই একটা প্রতিকার না করলে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারত। আমার স্বামী পাগলের মতো পরমেশের রেখে যাওয়া বাক্সের জিনিস হাতড়াতে লাগলেন, যদি কিছু সূত্র মেলে।'

" 'পরমেশ কি কোথাও কিছু লিখে রেখে গিয়েছেন?'

" 'ঠিক পরিষ্কার করে লেখা নেই। তবে নানারকম চূর্ণ ধাতু এক-একটা ছোট-ছোট পুঁটলি করে রাখা আছে। পুঁটলির গায়ে নাম লেখা আছে। খুব পুরনো কয়েকটা পুঁথি আছে।

" 'আমার স্বামী ওই রকম কোনও পুঁটলি খুলে সারাদিন কী পোড়ালেন, তেল তৈরি করে তার মধ্যে কত কিছু গুললেন। দু' দিন ধরে বেশ চিন্তিত হয়ে রইলেন। আমাকে বললেন, 'আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি। সফল হলে ভাল। না যদি হই তবে যেখানে যা আছে হুবহু এভাবেই রেখে দেবে।'

"জিনার বোধ হয় দিনটার কথা মনে করতে গিয়ে চোখে জল এল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'সেদিন ছিল অমাবস্যা, চারদিক অন্ধকার। আমাদের বাড়ির চারপাশের জলপথগুলো দূর থেকে মোটা কালো ফিতের মতো দেখাচ্ছিল। বাড়ি থেকে জলের ধার পর্যন্ত আমার স্বামী কিসের গুঁড়ো ছড়ালেন। উনি সকাল থেকে উপোস করে ছিলেন। চোখ-মুখ একটু শুকনো লাগছিল। সেটা সারাদিন না খাওয়ার জন্য, না অত্যধিক দুশ্চিন্তার জন্য, বলতে পারব না। রাত্রি আরও নিশুতি হলে উনি বেসমেন্টের এই ঘরটায় চলে এলেন। কুকুরের মুখোশটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমাকে শোওয়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে বললেন। আমি ভেবেছিলাম কিছুতেই ঘুমোব না। কিন্তু উনি নীচে নামবার খানিকক্ষণ পর একটা পাতলা ধোঁয়া চার দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর আমি সেদিন যে কী গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ভাবতে পারবে না। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। দৌড়ে নীচে গিয়ে দেখি, এই যেখানে তুমি বসে আছ ঠিক সেখানে কুকুরের মুখোশটা ভেঙেচুরে পড়ে আছে। আর উনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। দেহে যে প্রাণ নেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।' "

পিন্টুমামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের কী মনে হয়, কী হয়েছিল?"

আমরা কিছু বলার আগেই মা বললেন, "হার্ট অ্যাটাক বলেই তো মনে হচ্ছে।"

হরিপদদা বলল, "আমাদের গ্রামে একবার কী হয়েছিল জানো মামাবাবু? মাঝরাতে বন্ধু ডাকছে ভেবে যেই নিশির ডাকে সাড়া দিয়েছে, অমনই মন্ত্রপূত ডাবের খোলায় আত্মা চালান হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু আমরা জানি আসল ঘটনা কী।"

পিন্টুমামা হরিপদদাকে বলল, "অবিশ্বাস্য হলেও জিনারও তোদের মতোই মনে হয়েছে। পরে পরমেশের সিন্দুক ঘেঁটে আমি প্রেতকল্পজ্ঞান পাই। পাতাগুলো হাত দিলে ঝুরঝুর করছে। বহু কষ্টে তার পাঠোদ্ধার করে আমারও মনে হয়েছিল, পরমেশের বংশধর জগদীশ নিজের আত্মাকে শরীরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দুষ্ট আত্মার মোকাবিলা করার উপায়টা বের করলেও, নিজের শরীরে ফেরত নিয়ে আসার কৌশলে কোথাও গোলমাল করে ফেলেছিল।"

এই সময় বাবার অফিসের লোকজন চলে গেলেন। বাবা ঘরে ঢুকে শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে বললেন, "তুমি কি ভেনিসে শেষ পর্যন্ত ভূতের সন্ধান পেলে?"

"এ ঠিক ভূত নয়।"

বাবা বললেন, "ওই হল! আমার আবার ভূতপ্রেতে রুচি নেই। তা ছাড়া এতক্ষণ পরে তোমার গল্পের আর থই পাব না।" এই বলে বাবা অন্য ঘরে চলে গেলেন।

আমি আর তুলিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পিন্টুমামা ঠিকই বলে, অবিশ্বাসী শ্রোতা থাকলে পরিবেশটাই অন্য রকম হয়ে যায়। মামা বোধ হয় আমাদের মনের কথা বুঝেই বলল, "তোর বাবা ভূতপ্রেত বলে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে কী হবে, সেই রঘুবংশের আদি রাজা মান্ধাতার আমল থেকেই রাজপুত্রদের ইহলোকের যাবতীয় শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে প্রেতকল্পজ্ঞান পাঠ একেবারে মাস্ট ছিল, তা জানিস। পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ ধরা হত না।"

মা বললেন, "এখনকার প্ল্যানচেট বোধ হয় তোমার ওই প্রেতপুরাণ থেকেই এসেছে।"

আশ্চর্য! পিন্টুমামা রাগ করবার বদলে খুশি হয়ে বলল, "এগ্‌জাক্টলি। সেই জন্যই তো ওর নাম প্রেতকল্পজ্ঞান। পুরাণ নয়, মনে রেখো, এই পুঁথিকে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান বলেই ট্রিট করেছে।"

পরমেশের সিন্দুকে

পুঁথিপত্র ছেড়ে পিন্টুমামা আবার গল্পে ফিরে গেল, "তোদের এখন এত কথা বলছি বটে, কিন্তু সেই সময় আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। নিজের মনে গবেষণা করি আর রুগি দেখেই দিন কাটে। ওই তোদের বাবার মতো ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল, অলৌকিক যা কিছু, ওটা আমার সাবজেক্ট নয় বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতাম। সেই জন্য সেই সময় জিনার কথা শুনে আমার

যাবতীয় যুক্তি, বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গিয়েছিল।

"পুরো ব্যাপারটাই টর্সেলো দ্বীপের একলা থাকা বাতিকগ্রস্ত এক মহিলার পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, যদি না আমার চোখের সামনে ওরকম টাটকা কলাপাতায় আঁকা আমারই মুখটা দেখতে পেতাম! যদি না অদ্ভুত জাদুঘরে অতক্ষণ বসে-বসে জিনার মুখে দু'-তিনশো বছরের পুরনো জাদুকথা শুনতাম।

"আমি জিনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অবস্থায় আমার কী করণীয়?'

" 'দানিশাকে খুঁজে বের করতে হবে। আর পরমেশ মৃত্যুর আগে ছেলেকে বলেছিলেন, তিনি যে কাজটা করেছেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত। কারাগার থেকে সময়মতো বেরোতে পারলে নিজেই সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। সাধারণ নিরীহ মানুষকে এর ফল ভুগতে হবে বলে পরমেশ দুঃখিত হয়েছিলেন।'

"জিনা বলেছিল, 'দু'শো বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা এসব কথা শুনে আসছি। কিন্তু সেটা কী কাজ, সাধারণ লোক কীভাবে ভুগবে, সেটা কেউ জানি না।'

"এতক্ষণ ধরে যা শুনলাম তার সবটাই একটা মাথা খারাপ বুড়ির প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। কারণ, আমার চোখের সামনে আমারই মুখের আদলে কলাপাতায় আঁকা মুখটা দেখছিলাম।

"গল্প শেষ করে জিনা উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একবার ভাবলাম, ধ্যাত্তেরি! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। আমার কী এসে গেল ভেনিসবাসীর কীসে সর্বনাশ তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? প্রেতসিদ্ধ দানিশাকেই বা এত বড় ভেনিস শহরের মধ্যে কোথায় খুঁজে বের করব? সবচেয়ে বড় কথা, এসব যদি অর্ধেকও সত্যি হয়, আমার বিপদের আশঙ্কাটাও তো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না!

"মার্কো-কাতিয়ার জীবন্ত পুতুলেরও রহস্য জানা হল না। ঝুঁটিবাঁধা লোকটার বাড়িতেই যে ওরা ঢুকেছিল, হাতেনাতে তার প্রমাণ না পেলেও আমার মন বলছে ওই লোকটা মার্কো-কাতিয়া আর জিনার গল্পের একমাত্র যোগসূত্র।

"মাকড়সার ঘন জাল পরদার মতো এদিকে ওদিকে ঝুলছিল। আমি মনস্থির করে উঠে দাঁড়িয়ে যেদিকে পরমেশের সিন্দুক ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

"সিন্দুক না বলে ওটাকে একটা জাদুঘর বললেও কমই বলা হয়। ওখানেই পেয়েছিলাম প্রেতকল্পজ্ঞান পুঁথিটা। জিনা আমাকে বলল, 'তুমি চাইলে এখান থেকে যা খুশি নিয়ে যেতে পার। পরমেশের জিনিস কাজে লাগাব আমার এমন ক্ষমতা নেই।'

"আমি প্রথমেই প্রেতকল্পজ্ঞান পুঁথিটা হস্তগত করলাম। বলাই বাহুল্য, পরলোকে গিয়েও তোদের পিন্টুমামা কিছু কেরামতি দেখাবে না, এ হয় না! কী বল?

"সিন্দুকের মধ্যে বিভিন্ন খোপে কত রকম চূর্ণ ধাতু ছোট-ছোট পুঁটলি করে রাখা, তার ইয়ত্তা নেই। সেসব দেখতে অতি সাধারণ, তার গুণাগুণ সাদা চোখে বুঝবার উপায় নেই। এ ছাড়াও আছে নানারঙের কাপড়ের টুকরো। রঙিন সুতো বাঁধা বিভিন্ন সাইজের হাড়। সেসব মানুষ না জীবজন্তুর বুঝতে পারলাম না। দু'শো বছরের পুরনো সিন্দুকের মধ্যে থেকে কেমন পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমার শরীর শিরশির করে উঠল। হঠাৎ মনে হল, যার সিন্দুক তিনি যদি অন্য লোক ঘাঁটাঘাঁটি করছে পছন্দ না করেন, তবে? তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ করে চলে আসছি, হঠাৎ মনে হল, সিন্দুকটা ভাল করে বন্ধ হয়নি।"

এই পর্যন্ত বলে পিন্টুমামা নাটকীয়ভাবে চুপ করে গেল। পিন্টুমামা গল্প বলা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে। মামার কথাতেই বলি, 'অতিনাটকীয়তা গল্পকে যেমন নষ্ট করে দেয়, একটু নাটক না হলে আবার গল্প বলাটা জমে না।' মামা অবশ্য সেসব ভালই জানে। আমরাই মাঝে-মাঝে বুঝতে পারি না আমাদের কী করা উচিত।

এই এখন যেমন সিন্দুকটা ভাল করে বন্ধ হয়নি বলে মামা চুপ করে গেল। আমরাও চোখে-চোখে ইশারা করে চুপ করে থাকাই ঠিক করলাম। মামা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে তো আছেই। ভাগ্যিস মা বুদ্ধি করে হরিপদদাকে চা আনতে বললেন। হরিপদদা দেখলাম, মাথা খাটিয়ে সঙ্গে গোটা চারেক মাছের চপও নিয়ে এসেছে।

পিন্টুমামাও খুশি হয়ে আবার শুরু করল, "সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা অদ্ভুত জিনিসে সিন্দুকের ডালাটা আটকে গিয়েছে। জিনিসটা সিন্দুক খোলার সময় দেখতে পাইনি তো? সিন্দুকের মধ্যে যে ছিল না এ-বিষয়ে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "জিনিসটা কী?"

"পাগড়ির মতো দেখতে একটা টুপি। তবে সেটা কাপড়ের নয়। নীচে নামার সিঁড়ির রেলিং যেমন নরম জিনিসে হয়, সেই রকম মালমশলা দিয়ে তৈরি। মাথার সাইজ অনুযায়ী টুপিটা বড় আর ছোট হয়। টুপিটা হাতে করে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছি, কী মনে করে মাথায় পরলাম। অমনই যেন চোখের উপর সড়াৎ করে একটা কাচের ঢাকনা চেপে বসল। বুঝলাম, টুপিটার ভিতরেই কী কারসাজি আছে। মাথায় পরলেই ওই ঢাকাটা নেমে আসে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু টুপিটা ছিল কোথায়? সিন্দুক খোলার সময় তুমি তো দেখতে পাওনি?"

"বল তো কোথায় ছিল?"

"পরমেশের জাদুতে তখনই তৈরি হল।" বলল তুলি।

"তোমার চোখ এড়িয়ে হাতের কায়দায় রেখেছিল জিনা।" বললাম আমি।

"ওটা আসলে সিন্দুকেরই ভাঙা কোনও টুকরো," বললেন মা।

পিন্টুমামা হাসিমুখে হরিপদদার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুইই বা বাদ থাকিস কেন, বলে ফ্যাল!"

হরিপদদা বিজ্ঞের মতো বলল, "সিন্দুকের ডালার গায়ে আটকানো ছিল। মামাবাবু ডালাটা বন্ধ করতেই আলগা হয়ে খুলে পড়েছে।"

পিন্টুমামা চোখ বড়-বড় করে বাহবা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "বোকা হলে কী হবে তোর বুদ্ধি আছে! হ্যাঁ, ঠিক সেটাই হয়েছিল। আমার জীবনে এই রকম ঘটনা বারবার ঘটেছে। আচমকা একটা তুচ্ছ জিনিস নাটকীয়ভাবে পুরো ব্যাপারটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেদিন যদি আমি ওই টুপিটা না দেখতাম, তা হলে ভেনিসের রহস্যের সমাধান করতে পারতাম না। তা হলে

যে কী হত, ভেবে এখনও শিউরে উঠি। অবশ্য খুব নিরাপদেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতাম, আর আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতাম না, এটাও ঠিক।

"আমি জিনার কাছ থেকে শুধু প্রেতকল্পজ্ঞান পুঁথিটা আর কলাপাতায় আঁকা ছবিটা এবং একগাদা না বলা প্রশ্ন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।"

টুপির তলায় কী?

পিন্টুমামা বলে চলল, "জিনার ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসামাত্র মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে ওই পাগলি বুড়ির সঙ্গে বকবক করে আমিও কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? হাতের জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে জিনাকে ফেরত দিয়ে যাব কি না ভাবলাম। কিন্তু পুরনো বই পুঁথিপত্রের উপর আমার কী সাংঘাতিক টান সে তো তোরা জানিসই। ভাবলাম, এই পুঁথির মর্ম তো ওই বিদেশিনী বুঝবে না। পেয়েছি যখন নিয়ে যাই, টুপিটা পরে ফেলে দিলেই হবে। এত দূর এসেছি বলে ভাবলাম, একটু জর্জিওকেও দেখে যাই। জর্জিওর বাড়িতে ঢোকার আগে দরজা খুলে সে-ই বাগানে নেমে এসে আমাকে বলল, 'তুমি অতক্ষণ ধরে কী করছিলে ওই ডাইনির বাড়িতে?'

" 'ডাইনি নাকি? তাই একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।' আমি ইচ্ছে করে জর্জিওকে উসকে দিলাম।

" 'দ্যাখো, প্রথম দিন আলাপ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি তোমাকে তোমার দেশের লোকের নামে বলতে চাইনি। কিন্তু আজ ও বাড়িতে অতক্ষণ কাটাবার পর না বলে পারছি না। ও আর ওর স্বামীটা ছিল এক নম্বরের মিথ্যুক এবং বদমাশ। একটা কুকুরকে মানুষ মারার ট্রেনিং দিয়েছিল। হাতেনাতে ধরতে পারলে জেল হয়ে যেত। কিন্তু কোথায় যে কুকুরটা লোপাট করে দিল। আমাদের অতিথি ছোট্ট মেয়েটা ওই কুকুরের আক্রমণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বলেই ঠিক করে বলতে পারেনি কোন বাড়ি থেকে কুকুরটা বেরিয়েছে। তাই সে-যাত্রা ওরা বেঁচে গেল। যাই হোক, স্বামীটা মরে গিয়ে আমাদের হাড় জুড়িয়েছে। তারপর থেকে বলতে নেই, আমাদের এদিকে আর কোনও উৎপাত নেই। কুকুরের ডাকও আর শুনিনি।'

" 'তুমি কুকুরের ডাক নিয়ে বড্ড বেশি ডিস্টার্বড মনে হচ্ছে?'

" 'তুমি যদি শুনতে তোমারও তাই হত। সে যে কী ভয়ংকর ডাক, ভাবতে পারবে না। চেনা কুকুরেরই গলা অথচ সেই ডাক শুনে কী হাড় হিম করা অনুভূতি হত, সেটা যারা শুনেছি তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।'

"মনে অজস্র খটকা, হাতে আজব টুপি এবং ঝুরঝুরে পুঁথি নিয়ে আমার ওয়াটার ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। চার দিকে গন্ডোলা, ভেপো, ওয়াটার ট্যাক্সিতে ভেসে যাওয়া নানা দেশের আধুনিক মানুষজন দেখতে-দেখতে ভাবলাম, এতক্ষণ ধরে যা দেখেছি যা শুনেছি তা স্বপ্ন না সত্যি? তবে সেই স্বপ্নের প্রভাবেই কিনা জানি না, আজ নতুন করে ভেনিসের বাড়িঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। একটু অদ্ভুত লাগছে কি? ভেনিস যেন আদ্যন্ত আধুনিক হয়েও হয়নি। কোথায় একটু পুরনো গন্ধ লেগে রয়েছে।

হঠাৎ-হঠাৎ কোনও বাড়ির নকশার মধ্যে, গন্ডোলার মাঝিদের পোশাকের মধ্যে, জলের ধারে কোনও দোকানের জানলায় ঝোলানো অদ্ভুত গয়না ও মুখোশের মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে।

"অন্যমনস্কতার মধ্যেই অ্যাকাডেমিয়া স্টপে এসে পৌঁছলাম। এক কাপ কফি নিয়ে নিরিবিলি বসে চিন্তা করব বলে হোটেলের পিছন দিকের বাগানে গিয়ে বসলাম।"

প্রেতের আনাগোনা

একটু থেমে পিন্টুমামা ফের শুরু করল, "সন্ধে হয়ে গিয়েছে। পিছনের বাগানটায় আলো জ্বলে না বলে বেশ অন্ধকার। টুরিস্টরা যে-যার ঘরে ফিরে গিয়েছে। চার দিক নিস্তব্ধ বলেই যেন জলের সোঁদা গন্ধ আরও বেশি করে নাকে লাগছে।

"হঠাৎ দূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠল। ভাবলাম, কুকুর-বিড়াল হবে। প্রথমটা তেমন মনোযোগ দিইনি। কিন্তু মনের মধ্যে কিসের একটা কাঁটা যেন খচখচ করছে। আজকের দিনটাই যেন কেমন-কেমন। তোরা তো জানিস, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কী প্রবল! আবছাভাবে মনে হল, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আর বাইরে থাকা ঠিক হবে না। ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে বলে পরমেশের টুপিটা পরব কি না ভাবতে-ভাবতে একটা কী যেন এসে লাগল হাতের টুপিটায়। হাতে তুলে দেখি, একটা তির।

"তিরটায় হাত দেওয়ামাত্র আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। আমার হাত-পা এমন লোহার মতো ভারী হয়ে গেল যে, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা পর্যন্ত রইল না। অথচ আমার মনটা দিব্যি সজাগ হয়ে আছে। অবস্থাটা অনেকটা কীরকম বল তো? অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে অজ্ঞান করবার পর যখন আস্তে-আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে ঠিক তেমন। আমি দূরে জলপথের মাঝিদের হইহট্টগোল মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছি। ঠান্ডা হাওয়া বইছে সেটাও দিব্যি বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে, এবার আমার ঘরে যাওয়া দরকার অথচ একটা আঙুলও নাড়াবার ক্ষমতা নেই।

"মনে-মনে জানি, এখনই মৃত্যু ঘটবে। কেউ জানেই না আমি যে এখানে। দূর থেকে একটা বাচ্চার ছুটে আসার পায়ের আওয়াজ পেলাম। যাক বাঁচা গেল! অন্তত একটা জীবন্ত মানুষ, হোক বাচ্চা, আমার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই কাউকে ডেকে আনবে! নয়তো বাচ্চাটার পিছন-পিছন তার মা-বাবাও হয়তো আসবেন।

"পায়ের আওয়াজটা একদম কাছে চলে এসেছে। একটু যেন খুকখুক হাসির শব্দও পেলাম। আমার বেঞ্চটার চারপাশ ঘিরে ঘুরছে বাচ্চাটা অথচ আমি যে ঘাড় তুলে দেখব, আমার এমন শক্তি নেই।

"জীবনে এমন অসহায় বোধ করিনি। পরমেশের টুপিটা ধরে কে যেন টানছে। সব শক্তি দিয়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারব বলে মনে হচ্ছে না। এখন এই অসহায় অবস্থার মধ্যে বসে-বসেই বুঝতে পারছি, জিনার কাছে যা শুনেছি, পরমেশের জাদুঘরে যা দেখেছি, সব সত্যি। একটা গভীর অশুভ শক্তির চক্রান্ত সেই পরমেশের আমল থেকেই কাজ করে চলেছে। আর এই টুপিটার মধ্যে আছে কোনও গোপন সংকেত। নয়তো পরমেশের বাক্স থেকে এমন অদ্ভুতভাবে এটা আমি পেতাম না। যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। এই টুপিটার মধ্যেই কি আছে সমাধানের সংকেত?

"এই সব কথা তোদের বলতে যত সময় লেগেছে, আমার ভাবতে তার একশো ভাগের এক ভাগও লাগেনি, বুঝতেই পারছিস। টুপির একটা সরু দড়ির মতো জিনিসে আমি আঙুলটা আটকে রেখে ছিলাম বলে বাচ্চাটা টুপিটা টানাটানি করা সত্ত্বেও খুলতে পারছিল না। জলের সোঁদা গন্ধটা যেন হঠাৎ বদলে গিয়ে কেমন পচা গন্ধ আসতে লাগল। গঙ্গা দিয়ে মরা পচা জীবজন্তু ভেসে গেলে যেমন পচা গন্ধ নাকে লাগে, ঠিক তেমনই। ওই রকম অবস্থাতেই মনে হল, নিশ্চয়ই সামনের জলপথ দিয়ে মরা কিছু ভেসে যাচ্ছে।

"এর পর দু'টো জিনিস একসঙ্গে ঘটল। কোনটা আগে কোনটা পরে, নাকি দু'টোই একসঙ্গে, বলতে পারব না। আমার যে আঙুলে টুপিটা আটকানো ছিল, সেটায় তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করে জ্ঞান হারাবার আগে দেখলাম, সমস্ত বাগানটায় আলো জ্বলে উঠল একসঙ্গে। অনেক লোকের চেঁচামেচি। ডান হাতে তিরটা ধরা ছিল। আলোর থেকে চোখটা আড়াল করবার জন্য হাতটা তুলতে গিয়ে তিরটা খসে পড়ল। আর বুঝতে পারলাম, অবশ ভাবটা কেটে গিয়েছে। হাতটা স্বাভাবিকভাবেই তুলতে পারলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

"জ্ঞান হতে দেখি, হোটেলের ঘরে মিঃ কারানি থেকে শুরু করে বেয়ারা, ঝাড়ুদার, সবাই মিলে ভিড় করে আছে। সকলের মুখ-চোখে গভীর আতঙ্ক। হাতটা নাড়তে গিয়ে দেখি, হাতের পাঞ্জায় একটা মোটাসোটা ব্যান্ডেজ। ব্যাপারটা কী? জিজ্ঞেস করামাত্র সবাই মিলে হাইমাই করে যা বলল, বহু কষ্টে তার মর্মার্থ উদ্ধার করে শুনি, হোটেলের ম্যানেজার জিকো কয়েকদিন থেকে হোটেলের এখানে-সেখানে হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখছিল। জিকো ভেবেছিল, সামনের হোটেলটার বদমাইশি। নিজেদের খদ্দের টানবার জন্য গ্যালারিয়ার পিছনে লেগেছে। আজ সন্ধেবেলাতেই বাগানে কয়েকটা তির পোঁতা আছে দেখেছিল। টহল দেওয়ার সময় জিকো সেগুলোকে তুলে ফেলে দেয়। তারপর থেকেই জিকো তক্কেতক্কে ছিল। আটটা নাগাদ আবার একটা মরা কাক করিডরে পড়ে থাকতে দেখে পায়ের আওয়াজ লক্ষ করে চিলেকোঠার ঘরে যায়। তারপর তার বিকট চিৎকারে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে দেখি, ঘাড়টা কে যেন মুচড়ে দিয়েছে। শরীর রক্তে মাখামাখি। ছোট তীক্ষ্ণ নখের মতো কিছু দিয়ে আঁচড়ে রক্তাক্ত করা।

"মিঃ কারানি বললেন, 'প্রচণ্ড শক্তিশালী না হলে কেউ এভাবে মারতে পারে না। আর কী নিষ্ঠুর! মনে হয় না এটা সাধারণ মানুষের কাজ।'

"কার্পেটে রক্তের দাগ অনুসরণ করে সকলেই পিছনের অন্ধকার বাগানে যায়। কারওরই একা যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। আলো জ্বেলে সকলে মিলে বাগানে ঢুকে আমাকে দেখতে পায়। আমার বাঁ হাতেও একই রকম রক্তাক্ত আঁচড় দেখে সকলেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। ছবির মতো পুরো ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, জানিস। ঘাড় ঘুরিয়ে খাটের পাশে টেবিলে টুপিটা আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। সেই রাতটার কথা গ্যালারিয়া হোটেলের বাসিন্দারা কোনও দিন ভুলবে না। এক

হট্টগোলের মধ্যে কিন্তু মার্কো ও কাতিয়ার টিকিটি দেখতে পেলাম না।

"সকলেই বিদায় নেওয়ার পর আমি ভাল করে দরজা এঁটে টুপিটা মাথায় পরলাম। মনে হচ্ছিল, টুপিটার মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। টুপিটা মাথায় পরামাত্র একটা চোখ কালো কাচে ঢাকা পড়ে গেল। প্রথমবার টুপিটা পরেই খুলে ফেলেছিলাম। এবার ধৈর্য ধরে পরেই বসে রইলাম।

"আস্তে-আস্তে কাচের রং বদলাতে লাগল। লালচে আভার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম, জলের উপর ছোট্ট অন্ধকুঠুরির মধ্যে একটা লোক পিছন ফিরে বসে কী যেন বানাচ্ছে। কাচের রংটা সবুজ হওয়ার পর দেখি, লোকটা...কী আশ্চর্য! ওটা তো আমি! মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাচের মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলাম। সবুজ আলোর মধ্যে দিয়ে দৃশ্যটা খুব পরিষ্কার বোঝা না গেলেও গরাদের ফাঁক দিয়ে প্রহরীকে দু'টো জিনিস দিচ্ছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

"একটা আমার মাথার এই টুপিটা, আর দ্বিতীয় জিনিসটা দেখে আমার বুক হিম হয়ে গেল। সেটা কী বল তো?"

এই সময়ে কেউ প্রশ্ন করে? ভাল শ্রোতার কী করা উচিত ভুলে গিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এখন আর একদম প্রশ্ন করবে না। কী দেখলে তাড়াতাড়ি বলো।"

"দেখলাম, মার্কো-কাতিয়ার পুতুলের মতো অবিকল ওই রকম একটা পুতুল। চুলগুলোও সোনালি। তবে পরনের পোশাকটা ঘাগরা জাতীয়। সবুজ আলোর মধ্যে দিয়ে প্রহরীর মুখের হাসিটা চোখ এড়াল না। প্রহরীর আনন্দ দেখে মনে হল, তার কোনও প্রিয় পাত্রীর জন্য মনের মতো উপহার পেয়েছে। হয়তো তার মেয়ে। হয়তো সেই মেয়েরও এমন লম্বা সোনালি চুল। সেই মেয়েও হয়তো কোনও দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল, আর তার প্রাণের অংশ নিয়ে পুতুলটা বেঁচে ছিল। এইভাবে দু'শো বছর ধরে হাতবদল হতে-হতে পুতুলটা মার্কো-কাতিয়ার কাছে এসে পৌঁছেছে। কী সর্বনাশ, মানুষের প্রাণই যে এই পুতুলের বেঁচে থাকার উপায়, এটা বুঝতে আমার আর এক মুহূর্তও দেরি হল না।

"কিন্তু এই ভয়ংকর অপদেবতাকে মারার উপায় কী? দেখতে ছোটখাটো নিরীহ হলেও সময়ে-সময়ে এর গায়ে যে আসুরিক শক্তি ভর করে তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি।

"টুপিটা মাথায় পরাই ছিল। সবুজ রংটা বদলে কাচটা সাদা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর কোনও ছবি ফুটছে না দেখে টুপিটা খুলে ফেলব কিনা ভাবছি, এই সময় খুব অস্পষ্টভাবে দেখলাম, পরমেশের জাদুঘরের ছবি ফুটে উঠেছে। একটা লোক এদিক ওদিক কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখটা এক ঝলক দেখলাম। গালের উপর কাটা চিহ্নটা, যেটা আসলে একটা তিরের ছবি, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর হাতের মধ্যে উঁচু হয়ে ফুলে থাকা শিরা-উপশিরাগুলোর লাল রং আবছা কাচের মধ্যে দিয়েও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

"তার মানে সেই কর্কশ গলায় কথা বলা মুখোশ পরাদের দলের সেই লোকটার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

"কাচের মধ্যে ছবিটা ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। তার মধ্যেই দেখলাম, লোকটা যা খুঁজছিল মনে হয় সেটা পেয়ে হাতের মুঠোয় করে নিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চোরের মতো ঘর ছেড়ে পালাল। এইটাই তবে পরমেশের সেই তুরুপের তাস মন্ত্রনীলক। চোরটি কে তা বুঝতে আর বাকি রইল না। পরমেশের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে পরমেশের মন্ত্রনীলক চুরি করে তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে ফেলেছিল। সিনেমার মতো ছবির মিছিলও যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আশায়-আশায় বসে রইলাম যদি আর কোনও সূত্র মেলে। আমাকে হতাশ করে কাচ যেমন সাদা তেমন সাদাই রইল।

"মাথা থেকে টুপিটা খুলে খুব ঠান্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করলাম। মনের মধ্যে ছবিগুলো পর পর সাজিয়ে নিলাম। ত্রিদিবেশ এবং দানিশার গালে একই তিরচিহ্ন। তার মানে এরা একই শক্তির উপাসক। পরমেশ হাজত থেকে ফেরত আসার পর ত্রিদিবেশ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে মন্ত্রনীলকের জোরে অশুভ শক্তির চর্চা করে শক্তিমান হয়।

"দানিশা এরই জোরে মন্ত্রসিদ্ধ হয়েছে, নয়তো জগদীশ তাকে এত ভয় পেত না।

"পরমেশ, ত্রিদিবেশ, দানিশার সঙ্গে মার্কো-কাতিয়ার পুতুলটার একটা সম্পর্ক আছে। তা না হলে ছবির মিছিলে পুতুলটা থাকত না। কিন্তু সেই যোগসূত্রটা কী এবং কীভাবেই বা আমি তার মোকাবিলা করব, সেই সম্বন্ধে পরমেশ কোনও ইঙ্গিত দেয়নি।

"পরমেশ বেঁচে থাকতে যা ঘটেছে তাই দেখা গিয়েছে। পরমেশের মৃত্যুর পর কী হল বা কী করে প্রেতসিদ্ধকে ঘায়েল করব, সে সম্বন্ধে একটা কথাও নেই।

"ভাবতে-ভাবতে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে শুরু করল। জানলার ধারে ঠান্ডা হাওয়ায় গ্র্যান্ড ক্যানালের দৃশ্য দেখতে-দেখতে মনটা শান্ত করবার চেষ্টা করলাম।"

বিপদের বেড়াজাল

পিন্টুমামা বলে চলল, "আস্তে-আস্তে আমার কাছে কয়েকটি জিনিস আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমত, দানিশা কে সেটা বুঝতে পেরেছি। দানিশা যে প্রেতসিদ্ধ এতে সন্দেহ নেই। পরমেশের সঙ্গী ত্রিদিবেশ যে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'-এ হাত পাকিয়েছিল, দানিশা যে সেই ধারারই জাদুকর, এটা বোঝা গেল। রাগে, দুঃখে পাগল হয়ে পরমেশ জীবনে একবার তার বিদ্যার অপপ্রয়োগ করেছিল। তার জন্য সে অনুতাপও করেছে। অথচ মন্ত্রনীলকের অভাবে সেই ভুল সংশোধন করতে পারেনি।

"আমি পরমেশের কত নম্বর বংশধর সেটা না জানলেও, বংশের শাখাপ্রশাখা ধরে কোথাও যে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে, এটা তো অস্বীকার করা যায় না। আমি পড়লাম মহাফাঁপরে। ডাক্তার হিসেবে ভেনিসের কাজ আমার শেষ। রিপোর্ট জমা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেই হয়। কিন্তু এ কী মহাফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লাম বল দেখি।

"আমি অবশ্য অবাক হই না। কারণ, আমার জীবনের ঘটনাবলি তো কোনও দিনই সোজা পথে হাঁটেনি। পরমেশের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করবার জন্য মনের মধ্যে একটা জোরদার তাগিদ অনুভব করছি সেটা বলাই বাহুল্য।

"হাতের ব্যান্ডেজটা ধীরে-ধীরে খুলে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করলাম। নিঃসন্দেহে দাঁতের দাগ। ওই তিরটা হাতে নেওয়ার পরই সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনার মধ্যে তিরের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিদিবেশ ও দানিশা দু'জনের গালেই তিরের ছবি, বাগানেও লাল

সুতো বাঁধা তির পোঁতা ছিল। আমিও তির হাতে নিয়েই অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম।

"এই রাতেও বাগানে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল আজও মানুষের আকারে তির পোঁতা আছে কি না। মাঝে-মাঝে বিশেষ একটা দিনে তির পোঁতা থাকে। মনে হয় প্রেতসিদ্ধ আর অপদেবতার মধ্যে সেটা একটা যোগসূত্র। রাত্রিবেলা ভেবে-ভেবে মাথাটাথা গরম হয়ে গেল। কেবল মনে হতে লাগল ওই মন্ত্রপূত তিরের মধ্যে কিছু বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ আছে। প্রেতসিদ্ধ এভাবেই তার পোষা প্রেতকে বাধ্য রাখে বা মন্ত্রের গুণ কমে গিয়ে প্রেত শক্তিহীন হওয়ার আগেই শক্তিশালী করে তোলে।

"হঠাৎ আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন...তার মানে, যে বাচ্চা মেয়েটা আমার দরজা ঠেলছিল, সে ঘরে ঢুকলে আমার অবস্থা জিকোর মতোই হত। আস্তে-আস্তে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বাধা পেয়ে সে মাসি বিড়ালটাকে জিকোর মতো অমন করেই ঘাড় মটকে দিয়েছিল। নিজের তৈরি ওষুধ খাওয়ার দরকার আমার হয় না বললেই চলে। আজ কিন্তু সম্বোধি-৯৯ এক ডোজ না খেয়ে আর পারলাম না।

"ভালই হল একদিক থেকে। মন থেকে ধীরে-ধীরে ভয়ের ভাবটা একদম দূর হয়ে গেল। আসলে ব্যাপারটা কী জানিস? এত দিন লড়াই করেছি চেনাজানা, যাকে হাত দিয়ে ধরা যায়, বোঝা যায়, এমন লোকের বিরুদ্ধে। এখানে সব কিছু এত ধোঁয়াশায় ঢাকা যে, চিন্তাভাবনা গুলিয়ে গিয়ে ভয়টাই প্রবল হয়ে উঠছিল।

"নিজের তৈরি ওষুধ খেয়ে ভয়ের ভাবটা চলে যেতেই নিজেই নিজেকে বললাম, এখনও ইচ্ছে করলে মন্দকে দমন করা যায়। এর নিশ্চয়ই কোনও উপায় আছে। আমাকে সেটা বের করতেই হবে।

"একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার সামনে এখন দু'টো কাজ। এক মার্কো-কাতিয়ার পুতুলটাকে ধ্বংস করা। যদিও জানি না এত বছর ধরে মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে থাকা এই অশুভ শক্তিকে কী করে ঘায়েল করব।

"দ্বিতীয় কাজটা আরও শক্ত। দানিশার মোকাবিলা করা।

"যাই হোক, কাজগুলো যখন ঠিক হয়েছে তখন সেটা করবারও একটা রাস্তা পাওয়া যাবে আশা করি।"

প্রেতকল্পজ্ঞান

একটু চুপ করে থাকল পিন্টুমামা। তারপর বলল, "আরাম কেদারায় বসে প্রেতকল্পজ্ঞান পুঁথিটার পাতা ওলটাতে লাগলাম। যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এ যে কী আশ্চর্য বই, বলে বোঝাতে পারব না।

"প্রথমেই রয়েছে, কেন এই পুঁথি সকলের অবশ্যপাঠ্য। একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গল্প রয়েছে প্রথমে।

"রঘুবংশের আদি রাজা মান্ধাতা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যে দেশবিদেশের পণ্ডিতরা মুগ্ধ। সবাই যখন একবাক্যে মান্ধাতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, তখন তিনি বৈতরণী নদীর ধারে দ্বারসেন রাজার কাছে তর্কযুদ্ধে হেরে যান। শুধু এই প্রেতকল্পজ্ঞান পুঁথিটা পড়া ছিল না বলে। এই পুঁথি পাঠ করলে শুধু অশরীরী প্রেতচর্চা নয়, কীটপতঙ্গ, তরুলতা, সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। তারপর থেকে অন্য সব বিদ্যার সঙ্গে রঘুবংশে এই পুঁথি পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য করা হয়।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বিশ্বাস হল এসব কথা?"

পিন্টুমামা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, "আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। অবিশ্বাস করলে তো যত মঙ্গলকাব্য—চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, সবই অবিশ্বাস করতে হয়। সেই সব বইয়েও আছে, এই বই পাঠ করলে সর্ব গুণে গুণী, সর্ব ধনে ধনী হবে। নয়তো কাঁচকলা। আর তোমাদের তো বলেইছি, আমার জীবনে এত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে যে, আমার ডিকশনারি থেকে 'অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, আজগুবি' এই সব শব্দ আমি ছেঁটে ফেলেছি। কাউকে বলতেও যাই না। কী হবে বলে? পোড় খাওয়া অবিশ্বাসী মন কোনও কিছুকে সহজভাবে নিতে পারে না, এ তো জানা কথা।"

এই প্রথম পিন্টুমামা আমাদের দিকে একটু প্রশংসা আর স্নেহ একসঙ্গে মেশালে যেমন হয়, সেই রকম চোখে তাকিয়ে বলল, "ঝন্টে-তুলিদের বলি, কারণ, ওদের মন এখনও পিওর। চোখ স্বচ্ছ। যেদিন ওদের মনে হবে, এ হয় না, হতে পারে না, সেদিন থেকে আর গল্প বলব না।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "সেদিনের কথা সেদিন হবে। এখন এই গল্পটা তাড়াতাড়ি বলো।" ভুল করে গল্প বলে ফেললাম। ভাগ্যিস পিন্টুমামা খেয়াল করেনি। করলেই হয়েছিল আরকি। জল খেয়ে মামা আবার শুরু করল, "পুঁথিটার এক-একটা চ্যাপ্টারে এক-এক রকম প্রেতের বর্ণনা। মৎবিলাসী, বৃক্ষবাসী, দগ্ধানন, শ্মাশানপ্রিয়, অগ্নিভোজী, শবাসীন, আরও কত নাম। সব মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার প্রেতের নাম আছে। এদের উৎপত্তি ও বিনাশ সবেরই বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

"সবচেয়ে মজার কথা কী জানিস, এরা সকলেই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। আমাদের অজান্তে এদের মধ্যে অনেকেই কখনও প্রতিবেশী হয়ে, কখনও গাছগাছড়া, পাখি, জন্তু, ফুল, ফল হয়ে আমাদের রক্ষা করে আসছে।

"কী অদ্ভুত যে লাগছে। যত পড়ছি ততই যেন একটা অলৌকিক অশরীরী জগতের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। ক্রমশ বুঝতে পারছি, যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছি তা মোটেই সহজ হবে না।

"এর কারণটা কি জানিস? ক্ষতিকর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতের চ্যাপ্টারে এসে দেখি, আত্মাভোজী প্রেতের নাম সবার উপরে। আর বাকি যে অশুভ প্রেত, তাদের উৎপত্তি মানুষের মৃত্যুর পর এবং মানুষের বদ্‌গুণগুলোই হাজার গুণ বেশি হয়ে এদের মধ্যে থাকে। এই সব প্রেত বিনাশের সময় ভাল প্রেতাত্মারাও সাহায্য করে। আত্মাভোজীর উৎপত্তি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। আমি আর অন্য কিছু ছেড়ে আত্মাভোজী প্রেতের উৎপত্তি ও বিনাশের চ্যাপ্টারটা ভাল করে পড়লাম। একমাত্র এই প্রেতই জীবন্ত মানুষের আত্মা আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। যত দিন সেই মানুষটার আয়ু থাকে, আত্মাভোজী প্রেত তত দিন সেই আশ্রয়ে বহাল তবিয়তে থাকে এবং আশপাশের জীবন্ত প্রাণী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরা মানুষকে বোকা বানাতে ওস্তাদ। চেহারায় জীবন্ত প্রাণীর হুবহু নকল, বেশিরভাগ সময়ই নিরীহ সেজে থাকে।

"আত্মাভোজীর ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে ভয়ের তা হল, অন্যান্য

প্রেতের মতো এ নিজের ইচ্ছেয় চলে না। একে চালনা করে কোনও জীবন্ত প্রেতসিদ্ধ মানুষ এবং সেটা বহু দূর থেকেও করা সম্ভব। এই প্রেত সম্পূর্ণভাবে প্রেতসিদ্ধর নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্রেতসিদ্ধর মন্ত্র যত দিন আত্মাভোজীর শরীরে প্রোথিত থাকে, ততদিন তার বিনাশ নেই। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কী?

"এ যেন অনেকটা রিমোট কন্ট্রোলের মতো। দূর থেকে সুইচ টিপে এখন কত কিছুই তো হচ্ছে। পাখা চালানো থেকে শুরু করে বোমা ফেলা পর্যন্ত। অত বছর আগে প্রেতবিজ্ঞানীরা দ্যাখ, অনেকটা অমনধারা জিনিসের কথাই বলে গিয়েছেন।"

তুলির চোখ-মুখ দেখলাম, একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। সে মনের ভুলে পিন্টুমামার গেলাস থেকেই ঢকঢক করে জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে বলল, "আমাদের কাছাকাছিও তার মানে আত্মাভোজী প্রেত থাকতে পারে কুকুর, বিড়াল, পাখি কিংবা মানুষ হয়ে?"

পিন্টুমামা গলা একটুও না তুলে বলল, "থাকতেই পারে। চার দিকে যেসব বীভৎস কাণ্ড দেখিস, নিষ্ঠুরভাবে এ ওকে মারছে, সেসব কী কোনও মানুষ করতে পারে? আমরা নিজেরাই তো বলি 'পৈশাচিক কাণ্ড'! তার মানে অজান্তে আমরা মানুষের মধ্যে পিশাচের উপস্থিতি মেনে নিচ্ছি। আর অনেক সময়ই পৈশাচিক কাণ্ড ঘটায় যে মানুষটা, সে নিজেও জানে না কে কাজটা করেছে। কারণ, তাকে চালনা করেছে অন্য লোক। এখন তোরাই বুঝে দ্যাখ।

"যাই হোক, হচ্ছিল আত্মাভোজী প্রেতের কথা। উৎপত্তি পর্ব শেষ করে বিনাশের পর্বে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম এদের ঘায়েল করা খুবই শক্ত। প্রথমত প্রেতসিদ্ধ বেঁচে থাকতে আত্মাভোজীর প্রেতের মৃত্যু নেই। এই প্রেতের নিজে-নিজে কিছু করবার ক্ষমতা নেই। প্রেতসিদ্ধ নানারকম ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে এই প্রেতকে বিশেষ শক্তিশালী করে তুলে তাকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করে।

"সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার কী জানিস? এই ভাবে প্রেতসিদ্ধ যদি একশো আটটা মানুষের আত্মা এবং পাঁচ সহস্র জীবজন্তুর আত্মা সংগ্রহ করতে পারে, তা হলে তার আর বিনাশ নেই। ক্রমশই কাজটা কেমন প্যাঁচালো হয়ে উঠছে লক্ষ করেছিস কি?

"আত্মাভোজী প্রেতের বিনাশের পর্বটা বেশ লম্বা আর ঝন্টের ভাষায় বেশ কমপ্লিকেটেড। প্রেতসিদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে যে মন্ত্রপূত অস্ত্র আত্মাভোজী প্রেতকে দেয়, তার শক্তি দু' রকমভাবে কাজ করে। কোনও মানুষ যদি সেই অস্ত্র প্রথমবার স্পর্শ করে, প্রেতের হাতে তার অবশ্য মৃত্যু ঘটবে বা সেই অস্ত্র যদি প্রথমবার কাউকে আঘাত করে, তা হলেও তার মৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না। নতুন করে অস্ত্র পাওয়ার আগে সেই অস্ত্রই যদি আবার দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয়, তখন তার জোর কমে যায়। এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটবে না, তবে অন্যভাবে ক্ষতি হবে।"

পিন্টুমামা গল্পটা থামিয়ে বলল, "তোদের কাছেও নিশ্চয়ই এতক্ষণে ছবিটা একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গ্যালারিয়া হোটেলের বাগানে তির পোঁতা থাকত। মার্কোরা উইকএন্ডে

বেড়াতে এলে দানিশা পুতুলটার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দিত ওই তিরগুলোর মধ্যে দিয়ে।

"জিকো সেই সময় পাগলের মতো হোটেলের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়িয়ে পাশের হোটেলের বদমাইশি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নয়তো পিছন দিকের ওই বাগানে কারও খুব একটা যাওয়ার দরকার পড়ে না। ওই তিরগুলো দ্যাখ, নিশ্চয়ই রেগেমেগে একটানে তুলে ফেলেছিল। আমি তুলব ভেবেও তুলিনি বলে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম। পরে যখন তির ছুড়ে আমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা হয়, তখন আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যাই।

"বিনাশের পর্বটা তখনও শেষ হয়নি। মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছি। একদম শেষে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম, এ একেবারে অসাধ্য কাজ। এই প্রেতকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হলে নিজের দেহ থেকে আত্মাকে বের করে অশুভ আত্মাকে ঘায়েল করে আবার নিজের শরীরে ফিরে আসতে হবে। দ্বিতীয় উপায় হল, প্রেতসিদ্ধকে বিনাশ করে আত্মাভোজীর শরীরে প্রেতসিদ্ধর প্রোথিত মন্ত্রশক্তি মুক্ত করে উপযুক্ত জায়গায় আত্মাভোজীর শরীর বিনষ্ট করা। যেহেতু আত্মাভোজী প্রেত প্রেতসিদ্ধর দ্বারা যে-কোনও প্রাণী হওয়া সম্ভব, তাই সেই শরীর বিনষ্ট করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। মন্ত্রশক্তি মুক্ত হলেই তার জারিজুরি শেষ, এইটুকুই বুঝতে পারলাম।

"কিন্তু বুঝে করবটা কী। দু'টো পথই আমার কাছে সমান শক্ত বলে মনে হল। নিজের শরীর থেকে আত্মা বের করার উপায় আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই। ওই করতে গিয়ে পরমেশের বংশধর জগদীশের কী হাল হয়েছিল, তা তো নিজের কানে শুনে এসেছি।

"দ্বিতীয় পথটাও ঘোরতর রহস্যে ঢাকা। উপযুক্ত স্থানটা কোথায় সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ নেই। প্রেতের শরীর বুঝে প্রেতসিদ্ধর চারিত্রিক গঠনের উপর সেটা নির্ভর করে। সবার উপরে ভয়ংকর তথ্যটাও ভোলার উপায় নেই। প্রেতসিদ্ধ বেঁচে থাকতে আত্মাভোজীর বিনাশ নেই এবং একটি প্রেত গেলে আর-একটি তৈরি হবে।

"বুঝতেই পারছিস, আমার কাজটা কীরকম শক্ত হয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, মার্কো-কাতিয়ার পুতুলটাকে কোনও রকমে যদি হস্তগত করতে পারি, তা হলেই আমার কাজ শেষ। যেভাবেই হোক ওই ভয়ংকর পুতুলটাকে আমি শেষ করবই মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছি।

"কিন্তু প্রেতসিদ্ধকে কাবু করব কীভাবে? তার মানে দানিশার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে হবে। তোরা বোধ হয় আমাকে ভিতু ভাবছিস, তাই না?"

পিন্টুমামা আমাদের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে উদাস হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

আমার কিছু বলবার আগেই হরিপদদা তড়বড় করে বলে উঠল, "কী যে বলো মামাবাবু, তুমি বলে তাই এতখানি ভেবেছ। অপদেবতার সঙ্গে লড়াই কী চাট্টিখানি কথা!"

পিন্টুমামা বলল, "সে তোরা যাই ভাব না কেন, সত্যি কথা বলতে কী, দানিশার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। কারণ, একটু কর্কশ স্বরে কথা বলা ছাড়া সে তো আমার কোনও ক্ষতি করেনি। চেহারাটা খুনি টাইপের হলেও, কাউকে মারতেও দেখিনি। কিন্তু মার্কো-কাতিয়ার পুতুলটা চোখের সামনে দু'টো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমাকেও জখম করেছে। উপায় না দেখে প্রেতসিদ্ধ বিনাশের চ্যাপ্টারটা খুলে যা হতাশ হলাম, ভাবতে পারবি না।

"প্রেতসিদ্ধ বিনাশের পাতাটা ঝুরঝুরে হয়ে খসে পড়েছে। দানিশার সঙ্গে মুখোমুখি হতে গেলে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করতে পারতাম তার আর উপায় রইল না।"

পথের সন্ধান

পিন্টুমামা বলে চলল, "আমার জীবনে এটা বারবার ঘটতে দেখেছি। জানিস ঝন্টে, যখনই হাল ছেড়ে দিয়েছি, আর কিছু করার নেই বলে পিছন ফিরেছি, তখন একদম অপ্রত্যাশিতভাবে পথের খোঁজ পেয়েছি।"

যাক বাবা, পিন্টুমামা যেভাবে পুঁথিটার পাতা খসে গিয়েছে বলে আর উপায় রইল না, এই বলে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়েছিল, আমি ভেবেছিলাম হয়ে গেল। গল্পটার এখানেই ইতি। কী ভাগ্য, পিন্টুমামা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাটকীয়ভাবে নিজেই আবার শুরু করে দিল, "তোদের বলেছি নিশ্চয়ই, টুপি আর পুঁথিটার সঙ্গে আমি কলাপাতায় আঁকা আমার মুখের ছবিটাও নিয়ে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল দেশে নিয়ে এসে বাঁধিয়ে বৈঠকখানা ঘরে রেখে দেব। সে একটা দেখার মতো জিনিস হত!

"পুঁথিটা থেকে সাহায্য পাওয়ার আর আশা নেই দেখে নিরুপায় হয়ে ঘুমের তোড়জোড় করতে লাগলাম। রাতও হয়েছিল। ক্লান্তও লাগছিল। কলাপাতায় আঁকা ছবিটা ঘরের দেওয়ালে যে ক্যালেন্ডার ছিল, তার উপর টাঙিয়ে নিজেই শেষবারের মতো ছবিটা দেখলাম। তোদের আর কী করে দেখাব!

"সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ পড়ল ক্যালেন্ডারটার গায়ে। আশ্চর্য ব্যাপার। ছবিটা নেই। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দরজা তো আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। উড়ে গেল নাকি! মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি, ক্যালেন্ডারের তলায় শুকনো শালপাতার মতো কী একটা পড়ে আছে। হাতে তুলতেই গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেল। বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এড্রিয়াটিক সি-র উপরে গন্ডোলা ভাসছে। ভেনিসের এই অতি পরিচিত ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডারটার উপর কলাপাতাটা টাঙিয়ে তারিফ করেছিলাম। বোকার মতো ক্যালেন্ডারটার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

"হঠাৎ আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ক্যালেন্ডারের এড্রিয়াটিক সি'র জলটা যেন নড়ে উঠল। ঢেউয়ের মাথায় কালো-কালো কী যেন ভেসে যাচ্ছে। গন্ডোলা নাকি? ঘুমচোখে উঠে এসেছি। আমার একবারও মনে হল না, এটা সম্ভব হচ্ছে কী করে? মনে হল, ছোট পরদায় সিনেমা দেখছি।

"তবে আমার আরও অবাক হওয়া বাকি ছিল। চোখটোখ কচলে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, আমাদের অতি পরিচিত দেবনাগরী অক্ষরগুলো একবার করে ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। ঢেউ-এর মাথায় নাচতে-নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার ভিতরে কে যেন বলে উঠল, অক্ষরগুলো ধরে

ফ্যাল এখনই।

"অত টাটকা পাতাটা শুকনো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাওয়া দেখেই মনে হয়েছিল, পরমেশের জাদুর মেয়াদ শেষ। সে যে শেষ ভেল্‌কিটা এভাবে দেখিয়ে যাবে তা বুঝতে পারিনি। আমার হাতের কাছে প্রেসক্রিপশন লেখার প্যাডটা পড়ে ছিল। সেটা টেনে নিয়ে দেবনাগরী অক্ষরগুলো পরপর লিখে গেলাম।

"এক সময় জলের ঢেউ শান্ত হয়ে নড়াচড়া সব থেমে গেল। ক্যালেন্ডারটা আবার আগের মতো সাধারণ চেহারা নিয়ে হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলতে লাগল। আমি গোটা লেখাটা একসঙ্গে পড়ে ফেললাম।

"কী ছিল বল তো লেখাটায়? কী পেলাম?"

পিন্টুমামা বেশ নাটকীয়ভাবে আমাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আমরা সকলেই যাকে বলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। আমাদের কল্পনাটল্পনা আর কিচ্ছু কাজ করছে না। মামা আমাদের দয়া করেই আবার নিজে-নিজে শুরু করল, "তোরা সারাজীবন ভেবে-ভেবেও বের করতে পারবি না। লেখাটা একটা ছড়া। পুঁথিটার মধ্যে যা পাইনি, পরমেশ তার শেষ জাদুতে তা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

তুলি বলে ওঠে, "এইবার বুঝতে পেরেছি প্রেতসিদ্ধকে বিনাশের উপায়। তাই না পিন্টুমামা?"

"ঠিক ধরেছিস। কিন্তু এর মধ্যে একটা গ্যাঁড়াকল আছে। ছড়াটা একটা ধাঁধা।"

আমরা সকলেই বলে উঠলাম, "ধাঁধা?"

"ধাঁধা কি না তোরাই ঠিক কর। স্মরণকার দৌলতে আমার স্মৃতিশক্তির যে তুলনা হয় না, তা তো তোরা জানিস। ছড়াটা একবার পড়ামাত্রই মুখস্থ হয়ে গেল। তারপর ছড়াটা চার-পাঁচবার নিজের মনেই গুনগুন করে আওড়ালাম। কিন্তু মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

"চানটান করে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখি, সমস্তই টিপটপ সাজানো। এ ব্যাপারে এদের বাহবা দিতেই হয়। গত কাল যে এখানে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, তার চিহ্নমাত্রও নেই। প্রত্যেকে গম্ভীর মুখে নিজের কাজটি করে যাচ্ছে। গেটের মুখে দু'টি পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিকতার চিহ্নমাত্র নেই।

"যথারীতি মার্কো-কাতিয়াও এল প্র্যাম ঠেলে।"

তুলি বলল, "ধাঁধাটা বললে না?"

"বলব-বলব, তাড়া কিসের? আমার তো মার্কোদের প্র্যামটা দেখেই রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠেছে। যত নষ্টের গোড়া ওই পুতুলটা। আর এরা দিব্যি ওই শয়তানকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। একবার ভাবলাম, ওদের খুলে বলি সমস্ত। তারপরেই মনে হল মার্কো-কাতিয়া নিশ্চয়ই জানে না পুতুলটা যে অশুভ শক্তির প্রতীক। জগদীশ এবং জিনাও যেমন প্রথমটা বুঝতে পারেনি। ওখানে জর্জিও বুঝতে পেরেছিল, আর এখানে আচমকা আমি দেখে ফেলেছি। মার্কোরাও দ্যাখে, কিন্তু ওদের শোকটা খুব তীব্র বলে পুতুলটা যে মাঝে-মাঝে মানুষের মতো আচরণ করে, তাতেই ওরা খুশি হয়। ভাবে, মরা মেয়ে ফিরে এসেছে। যদি ওদের বলি, ওদেরই মেয়ের আত্মা ভক্ষণ করে এই পুতুলটা মাসিকে মেরেছে, জিকোর ঘাড় মটকে দিয়েছে, তা হলে কি ওরা বিশ্বাস করবে? কখনওই না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসী বলে আমাকে নিয়েই হাসাহাসি করবে।

"দিনের আলোয় সাহস করে প্র্যামটার কাছে এগিয়ে গেলাম। মার্কো-কাতিয়াকে হাসিমুখে উইশ করে আলতোভাবে পুতুলটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের পুতুলটা এত সুন্দর যে, ঠিক মনে হয় জীবন্ত। দেশে যাওয়ার আগে আমিও এরকম একটা পুতুল কিনতে চাই। কোথা থেকে কিনেছ তোমরা?'

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
Madhyamik English Sahayika
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা
রায়-হালদার- সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শরীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই
মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে
হলে এই বইগুলির সাহায্য চাইই চাই

PRASA-02

প্রান্তিক
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্ত্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৯৩৫১,২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স্ ঃ ২৩৫০-৯৩৫১

"মার্কো বলল, 'সেন্ট পিকালোর কাছে ভেনিশিয়ান কাটগ্লাসের দোকানটার পাশে একটা পাঁচমিশেলি দোকান থেকে আমরা কিনেছিলাম।'

"আমি ইচ্ছে করে খুব নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করলাম, 'গত কালই বোধ হয় ওখানে তোমাদের একঝলক দেখেছিলাম। কাছে গিয়ে আর দেখতে পাইনি। গন্ডোলাসুদ্ধ কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

"কাতিয়া বলতে শুরু করেছিল, 'সে যা অদ্ভুত একটা জায়গা!'

"মার্কো তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে বলল, 'আসলে ওই দোকানদার বলেছিল, আমাদের ডলটার সঙ্গে ম্যাচ করে একটা পুষ্যি বানিয়ে দেবে। আমরা ওটার খোঁজে গিয়েছিলাম।'

"বোঝ একবার, দানিশার তা হলে একটি প্রেত নিয়ে মন ভরছে না। আরও সর্বনাশ করা চাই। জানতাম, উত্তরটা কী হবে। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো! তা কী পুষ্যি আনলে তোমরা?'

"'একটা বিড়াল। এখনও আনিনি। ও বানিয়ে রেখেছে। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম।'

"আমার আর প্রশ্ন করার দরকার নেই। হুবহু মাসির চেহারার একটা বিড়াল যে তৈরি হয়ে আছে, এ-বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই।

"তোরা তো জানিস এমনিতে আমি রাগী নই বটে, কিন্তু রেগে গেলে...। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন রাগের হল্কা বেরোতে লাগল। কী ভেবেছে দানিশা? প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্রমন্ত্রের অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষ, প্রাণী হত্যা করে মানুষকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখবে?

"মনে যতটুকু দ্বিধা, অস্বস্তি, ধুকপুকুনি ছিল, সমস্ত ঝেড়ে ফেলে আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত হলাম।"

প্রেতসিদ্ধর আস্তানায়

আমি আর তুলি ভাল শ্রোতার ভূমিকা ভুলে অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কিন্তু এখনও ধাঁধাটা বললে না।"

পিন্টুমামা অমায়িক হেসে বলল, "বলব, বলব। আমি নিজেই তো মার্কো-কাতিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সারাদিন ধাঁধাটার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ালাম। ছড়াটা ঠোঁটস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। তবু বিন্দুবিসর্গ উদ্ধার করতে পারলাম না। তোদের বলছি, শুনে দ্যাখ—

ডাইনে দু' পা গিয়ে সোজা
আবার বাঁয়ে পথটি খোঁজা।
কুলুপ আঁটা বন্ধ বাটি
হাতের মধ্যে চাবিকাঠি।
পাতাল ঘরে ঘরবন্দি
বনের রাজা বাঘবন্দি।
কায়ার পিছে হয়ে ছায়া
ছায়ায়-ছায়ায় মিশবে মায়া।
চোয়াল আঁটে হাঁ মুখখানি
ছিবড়ে হয় অ-জ্ঞানী।
এইটে যখন হবে পার
কর্ম তোমার আধা কাবার।
খেলার ছলে কিস্তিমাত
প্রেতসিদ্ধ কুপোকাত।
হাড়ে গড়া হারানিধি
কী জাদু জানে রে বিধি!
অস্ত্রখানি নিও বুঝে
রক্তনদী পাবে খুঁজে।
এই নিশানা মাথায় রেখে
কাজ যদি হয় একে-একে।
উধাও তবে ভোজবাজি
অক্কা পাবে আত্মাভোজী
খুঁজে দ্যাখো আত্মাটারে
মুক্তি দিও মনে করে।

ছড়া শুনে আমার আর তুলির হয়ে গিয়েছে, এ আবার কী? মাথামুন্ডু কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। হরিপদদা যে হরিপদদা, সব সময় চালাক-চালাক মুখ করে সবজান্তা ভাব করে, সে পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছে।

পিন্টুমামা বলল, "মিছিমিছি নিজেদের বোকা ভেবে কষ্ট পাস না। ছড়াটায় নানারকম কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে এটা তো বুঝতে পারছিস। কাজগুলো ঠিকঠাক হলে সিদ্ধিলাভ, নয়তো মৃত্যু। এটা ঠিকই, কানে শুনে কাজগুলোর মাথামুন্ডু কিছুই বোঝা যায় না। আমিও যদি অকুস্থলে গিয়ে না পড়তাম তা হলে আমারও এই জীবনে ওই ধাঁধার মানে বোঝা সম্ভব হত না। যাক, সময়মতো সবই জানতে পারবি। এখন আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে দে।

"সেন্ট পাওলোতে ভিনিশিয়ান কাটগ্লাসের দোকানটা সারা ভেনিসের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। বড়লোক টুরিস্টদের ভিড়ে জায়গাটা সব সময় গমগম করে।

"আমি ইচ্ছে করে চেহারাটা সামান্য বদলে নিলাম। ব্যাকব্রাশ করে ওলটানো চুল সিঁথি কেটে আঁচড়ে গোঁফটা কামিয়ে কালোর বদলে একটা সোনালি ফ্রেমের চশমা পরে ফেলতেই চেহারাটা আমূল বদলে গেল। প্রেতসিদ্ধর যেরকম ক্ষমতার বহর দেখছি, আমি যে আমার এই সামান্য ছদ্মবেশটুকু দিয়ে তার চোখে ধুলো দিতে পারব না, এ তো জানা কথা! তবু এই সামান্য চালাকিটুকু করলাম অন্যদের জন্য। ওই সময় ভেনিসে আমার খ্যাতি প্রায় ফিল্মস্টারেরই মতো। আধচেনা, অল্পচেনা লোকেদের কৌতূহল এড়াতে ওইটুকু চালাকির দরকার ছিল। মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে প্রেতকল্পজ্ঞানটায় আর-একবার চোখ বুলিয়ে মনে-মনে পরমেশকে একটা প্রণাম ঠুকে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

"সেন্ট পাওলোর কাছাকাছি গিয়ে দেখি, বিরাট একদল আমেরিকান টুরিস্ট এসেছে ভেনিশিয়ান কাটগ্লাসের জিনিস কিনতে। ভালই হল। আমিও ওদের দলের সঙ্গে মিশে গিয়ে এটা ওটা দেখার ছলে পাশের দোকানটা ভাল করে নজর করলাম।

"দোকানটায় লোক টানার মতো প্রায় কিছুই নেই, বুঝলি! আসলে দোকান তো ধোঁকার টাটি। ভিতরে অন্য কাজকর্ম।

খামোকা লোকজন গিয়ে ভিড় করুক, দানিশা মোটেই তা চায় না। এখানে একটা বিশেষ ইন্টারেস্ট ছাড়া খদ্দের যে আসবে না তা তো জানা কথা।

"আমি একটু এদিক ওদিক চোখ চালিয়ে দলের মধ্যে থেকে একটা বোকা টাইপের আমেরিকানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। একটা অংশে ছোট্ট কাফেটেরিয়া থেকে দু' কাপ কফি নিয়ে বসে একথা সেকথার পর বললাম, 'ভেনিসে এসে কাটগ্লাস, কাঠের ও চামড়ার জিনিসের সঙ্গে এখানকার আরও স্পেশ্যাল দু'-একটা জিনিস কিনবে নিশ্চয়ই?'

"আমার কথার জাদুতেই হোক বা বেস্ট কালেক্টর হওয়ার লোভেই হোক, জানিস না তো, কোনও-কোনও লোকের কেমন বাতিক থাকে যত উদ্ভট্টে জিনিস জমাবার। সে উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী জিনিস বলো তো? আমাদের তো গাইড যা-যা বলেছে সবই কিনেছি।'

"একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম, 'এই সব অর্ধশিক্ষিত গাইডরা জানেই বা কী, আর বলবেই বা কী? ভেনিস যে এক সময় সমুদ্রবাণিজ্যে পৃথিবী সেরা ছিল, তা তো জানো। এশিয়া থেকে ইউরোপ ঢোকার সিংহদরজা ছিল ভেনিস। সেই জন্য ভেনিসে অনেক কিছু দেখবে, যা ইউরোপ ছেড়ে দাও, রাজধানী রোমেই দেখতে পাবে না।'

"টুরিস্ট ভদ্রলোকের চোখ গোল-গোল হয়ে উঠেছে। ভাবছে, জাতভাইদের তাক লাগিয়ে জিনিসটা হাতের মুঠোয় পেতেই হবে। খুবই আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'দু'-একটা উদাহরণ দাও।'

" 'কাটগ্লাস কিনছ ভাল কথা। সে তো কিনতেই হবে। কিন্তু পাশের দোকানটার মুখোশগুলো লক্ষ করেছ কি? ইন্ডিয়া আর মিড্‌ল-ইস্টের সঙ্গে রোমান স্টাইল মিশে কী অদ্ভুত দেখতে লাগছে, সেটা দেখো ভাল করে।'

" 'তুমি চলো আমার সঙ্গে। ভাল দেখে একটা পছন্দ করে দাও তো!'

"আমি তো এটাই চাইছিলাম। দলবল জুটিয়ে কোনওরকমে একবার দানিশার দোকানে গিয়ে ঢোকা। একলা গেলে আমার কার্যসিদ্ধি যে হবে না, এ তো হরিপদর মতো বোকা লোকও বোঝে, তাই না রে?"

হরিপদদাও আমাদের মতো মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনে যাচ্ছিল। পিন্টুমামার গল্পে হঠাৎ নিজের নামটা শুনে সাতপাঁচ কিছু না ভেবেই মাথা নেড়ে দিল।

পিন্টুমামা মুচকি হেসে গল্পে ফিরে এল, "আমাদের পাশের দোকানে যেতে দেখে গুটিগুটি আরও কয়েকজন ভিড়ে গেল।

"দানিশা হঠাৎ এত লোককে দোকানে ঢুকতে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তারপর মহাউৎসাহে মুখোশ, আরবি ভাষায় কীসব লেখা ছবি, হাড়ের তৈরি দাবার ঘুঁটি, আরও কত কী দেখাতে লাগল। আমি তার যত বড় শত্রুই হই না কেন, আমারই দৌলতে তার দোকানে জীবনে প্রথম এত জেনুইন খদ্দের ঢুকল।

"যাই হোক, আমার সুবিধেই হল। আমি সকলের চোখ এড়িয়ে দোকানের পিছন দিকে চলে গেলাম। সামনেই জলের একটা সরু গলিপথ। এইখানে এসেই মার্কোদের আর দেখতে পাইনি। কিন্তু রাস্তা কোথায়? সেদিন এইখানে শুধু খালি গন্ডোলাটা দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা কোথাও একটা উধাও হয়েছিল।

"আমার আবছা করে মনে হচ্ছে, দানিশার আর-একটা শোরুম আছে অন্য কোথাও। সেই শোরুমে সে নিশ্চয়ই বাছা-বাছা খদ্দের নিয়ে যায়। কাতিয়া প্রায় বলেই ফেলেছিল, সেটা কোথায়। মার্কোর চোখের ইশারায় চেপে গেল। ব্যাপারটা গোপন তো বটেই।

"হঠাৎ ধাঁধাটা মনে পড়ে গেল। ওর মধ্যেই আছে প্রেতসিদ্ধ বিনাশের সংকেত। আমি এক মুহূর্ত আগেও ভাবিনি, আজ এখনই দানিশার সঙ্গে লড়াই শুরু করব কি না। আমি ভেবেছিলাম শুধু জায়গাটা দেখে চলে আসব। পরে আটঘাট বেঁধে কাজে নামলেই হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কী একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলল।

"ডান দিকে খানিকটা গিয়ে আবার বাঁ দিকে ঘুরতেই দেখি, রাস্তা বন্ধ। সরু জলপথের খানিকটা অংশ ভরাট করে চারচৌকো ছিরিছাঁদহীন একটা বাড়ি সটান উঠে গিয়েছে। বাড়িটায় কেউ থাকে বলে মনে হয় না। একতলায় জল ছলাৎ-ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে। ত্রিসীমানায় আর-একখানি বাড়িও নেই।

"বাড়িটাতে ঢুকবার একটা প্রবল তাগিদ অনুভব করলাম। অথচ কী করে ঢুকব জানি না। কারণ, বন্ধ দরজার গায়ে একটা মস্ত তালা। এই বিশাল তালা ভাঙতে শাবল-গাঁইতির দরকার।

"ধাঁধার নির্দেশমতো পথ খুঁজে পেয়ে বন্ধ বাটির সামনে এসেছি ঠিকই, কিন্তু হাতের মধ্যে চাবিকাঠির সংকেতটা ধরতে পারছি না।

"চোখের সামনে নিজের হাতটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। দানিশা খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে-থাকতেই বাড়িটায় ঢুকে পড়তে পারলে হয়। খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার।

"তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলাম, বেজায় ভারী। শূন্য হাতের মধ্যে কোথা থেকে যে চাবিকাঠি আসবে বুঝতে পারছি না।

"হঠাৎ চোখে পড়ল নিজের ছায়াটার দিকে। আগে যা কখনও লক্ষ করিনি, আজ সেটা দেখে চমকে উঠলাম।

"রাস্তা দিয়ে যে চাবিওলারা যায়, তাদের ভাল করে দেখেছিস কোনওদিন?" পিন্টুমামা আমাদের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

"হ্যাঁ দেখেছি তো!"

"কী থাকে ওদের হাতে?"

"চাবির বাক্স।"

"আর?"

আর কী, আর? আর? আমি ও তুলি প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করি।

হরিপদদা বলল, "এক হাতে বাক্স অন্য হাতে চাবির থোকা, সেটা বাজাতে-বাজাতে যায়।"

"রাইট! আমি সেটাই জানতে চাইছিলাম। একটা রিঙের মধ্যে লম্বা-লম্বা চাবি ঝোলে, তাই তো?"

আমরা সমস্বরে 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে উঠলাম।

পিন্টুমামা বলল, "অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছিলাম বাড়িটার সামনে। হাত ছুড়ে দিচ্ছিলাম শূন্যে। হঠাৎ দেখলাম, আমার আঙুলগুলো দেখেছিস তো কেমন লম্বা-লম্বা! ছুরি-কাঁচির কারবার করলে কী হবে, এ একেবারে শিল্পীর হাত!" তাই মামা মুগ্ধ হয়ে দশ আঙুল মেলে নিজের দু' হাত দেখতে লাগল উলটেপালটে।

আমরা অধৈর্য হয়ে বললাম, "তারপর কী হল?"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম! আমার লম্বা-লম্বা আঙুলগুলো মনে হল চাবিওলার চাবির থোকা থেকে ঝুলে থাকা চাবি। এই হচ্ছে তালা। তার মানে কী! যেই মনে হওয়া, আর-এক মুহূর্ত দেরি না করে তর্জনী ঢুকিয়ে দিলাম চাবির ফুটোয়। তালা যেমন বন্ধ তেমনই রইল। আশা না ছেড়ে মধ্যমা দিয়ে চেষ্টা করলাম। দু'বার ক্লকওয়াইজ ও একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতেই তালাটা খুলে গেল। হাতের মধ্যেই চাবিকাঠির রহস্যটা পরিষ্কার হল।

"কিন্তু তোরা তো জিজ্ঞেস করলি না, কীভাবে জানলাম ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজই ঘোরাতে হবে?"

আমি এবার প্রস্তুত ছিলাম। পিন্টুমামা প্রশ্ন করামাত্রই বলে দিলাম, "ডাইনে দু' পা গিয়ে বাঁয়ে যাওয়ার কথা তো প্রথমেই বলা হয়েছে। একই সঙ্গে রাস্তা এবং তালা খোলার সংকেত ছিল।"

পিন্টুমামা যে খুবই খুশি হয়েছে তা তার পা নাচানো দেখেই বুঝতে পারলাম। সেই জন্য সাহস করে বলেই ফেললাম, "এবার আর প্রশ্নটশ্ন কোরো না। একবার পেরেছি বলেই কি আর বারবার পারব?"

পিন্টুমামার মুখ দেখে মনে হল, আমার শর্ত মঞ্জুর করেছে। জল খেয়ে আবার শুরু করল, "তালা খোলামাত্র বাড়িটায় ঢুকে দরজাটা চেপে দিতেই কট করে আওয়াজ হয়ে দরজা যেমন ছিল তেমনভাবেই বন্ধ হয়ে গেল।

"বাড়িটার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, একেবারে দানিশার আস্তানার মধ্যে এসে পড়েছি। হাতে কোনও অস্ত্র নেই। এমনকী একটা সেফ্‌টিপিন পর্যন্ত নয়। এই অবস্থায় দানিশার সঙ্গে মুখোমুখি কীভাবে লড়ব জানি না!

"খুব বেকায়দায় পড়লে মনের মধ্যে যেমন একটা বেপরোয়াভাব হয়, আমার ঠিক তেমনই মনে হচ্ছিল। কাকপক্ষীও জানে না আমি যে এখানে। আমার ঘাড় মটকে এই হানাবাড়িতে পুঁতে রেখে দিলে কারও সাধ্য নেই টের পায়।

"অলক্ষুণে সব চিন্তাগুলো দূর করে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। পথ যখন পেয়েছি, তালা খুলে বাড়ির মূল আস্তানায় যখন একবার ঢুকতে পেরেছি, তখন ধাঁধার অন্যান্য অংশগুলোও আস্তে-আস্তে খোলসা হবে আশা করি। খুব সাবধানে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলাম। একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি ছাড়া গোটা একতলাটার মধ্যে আর কিছু নেই। অগত্যা সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই ধীরে-ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। একটুও ভয় করেনি বললে মিছে কথা বলা হবে। আরও বেশি ভয় পাচ্ছিলাম কোথাও জনপ্রাণী নেই বলে। কেবল মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পিছন থেকে, নয়তো পাশ থেকে কেউ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দানিশা কোথাও কোনও পাহারার বন্দোবস্ত রাখেনি বলে একটু অবাকই হলাম।

"বাড়িটার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত কী জানিস? কোথাও আলো নেই। জায়গায়-জায়গায় মাথার উপর মোটা ঘসা কাচের মতো প্লাসটিকের পাত লাগানো। তাই দিয়েই সামান্য আলো আসছে।

"সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম, সেটা মনে করলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।" পিন্টুমামা চোখ বুজে বসে রইল, যেন পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "খুব ভয়ংকর বুঝি?"

পিন্টুমামা বলল, "ভয় পাওয়ার মতো নয়। তবে এতই অদ্ভুত যে, দেখলেই গা-টা শিরশির করে ওঠে। মনে হয়, এর সঙ্গে আমাদের চেনা পৃথিবীর কোনও সম্পর্ক নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা বিরাট চত্বর যেমন হয় তেমনই। কিন্তু সাধারণত চৌকো উঠোন ঘিরে দালান থাকে। এখানে সেসব কিছু নেই। পাঁচিল তুলে দু' পাশ একদম বন্ধ করে দেওয়া। সিঁড়ির মুখোমুখি উঠোনটার শেষে একটা খোলা দরজা। চারপাশটা পাতলা কুয়াশার মতো অন্ধকার হয়ে থাকলেও, ঘরটার ভিতরটা আলো হয়ে আছে। আলোটা কেমন জানিস? অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন জ্বললে আকাশে যেমন একটা আভা দেখা যায়, তেমন। অথচ আগুনটা দেখা যাচ্ছে না।

"আর কোথাও যখন কিছু দেখা যাচ্ছে না, আমার মনে হল, এটা নিশ্চয়ই সেই ঘর, যেখানে ঢুকলে কর্ম অর্ধেক শেষ। দূর থেকেও ঘরের সামনের দরজার কায়দাটা ঠিক আমার চোখে পড়েছে। দরজা মানে পাল্লাটাল্লা নেই, শুধু চারচৌকো দরজার মতো কাটা অংশটার উপরে আর নীচে দাঁতের মতো খাঁজকাটা। ওই বিকট হাঁ-এর মধ্যে দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয়।

"দরজা পর্যন্ত পৌঁছবার রাস্তাটাও মোটেই সহজ নয়। কেউ যে পাহারা দিচ্ছে এমন নয়। ইচ্ছে করলে এক দৌড়ে দরজাটার কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু সেটা যে ঠিক হবে না সেটা ওই উঠোনটার দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যায়।

"তোরা ধাঁধার বইয়ে গোলকধাঁধার ছবি তো নিশ্চয়ই দেখেছিস। পেনসিল দিয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে এদিক ওদিক করে ঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছিস। এখানেও ঠিক সেই রকম একটা গোটা ধাঁধার ছবি দেওয়া। তবে অনেক-অনেক বড়। মানুষ হাঁটার রাস্তা যেমন হয়। দু'টো রাস্তা যেখানে মিশেছে তার প্রত্যেক মোড়ে বুক সমান ঝাঁকড়া-মাথা গাছ। সেই গাছের সংখ্যাও সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও একটা, কোথাও দু'টো। কোথাও বা তার বেশি। চারপাশ থেকে অজস্র রাস্তার কাটাকুটি। কয়েকটা রাস্তা আবার মূল জমি থেকে সামান্য নিচু করা। গোলকধাঁধার ঠিক মাঝখানে পাথরের তৈরি খেলনা বাঘ সাজিয়ে রাখা।

"তোদের খুব বিস্তারিতভাবে গোলকধাঁধাটার বর্ণনা দিলাম, যাতে জায়গাটা কেমন ছিল তোরা ভালভাবে বুঝতে পারিস।

"আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এই গোলকধাঁধা সাধারণ নয়। বুঝতে পারছি, চরম সময় এসে গিয়েছে। এইখানে একটা রাস্তাই ঠিক, সেই জন্যই দানিশা কোনও পাহারা রাখেনি। কারণ, এর চেয়ে সঠিক রাস্তা বের করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই অজস্র গলিঘুঁজির মধ্যে ঠিক রাস্তাটাই বা কে বলে দেবে? এক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

"যত দূর সম্ভব চোখটাকে তীক্ষ্ণ করে রাস্তার নকশাটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। ছড়ার লাইনগুলো মনের মধ্যে বারবার আওড়াচ্ছি—

পাতাল ঘরে ঘরবন্দি
বনের রাজা বাঘবন্দি।

বনের রাজা বাঘ...

তাকে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাকে কে বন্দি করে রেখেছে? বাঘবন্দি কথাটার মানে কী?

"ভেবে-ভেবে মাথাটা গরম হয়ে গেল। যা হওয়ার হবে বলে কপাল ঠুকে সামনের রাস্তাটায় পা দেওয়ামাত্র বাঘটা নড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙতেই, আমি লাফ দিয়ে গোলকধাঁধার বাইরে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে চলে গেলাম।

"দানিশার বদমাইশিটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছিস তো? কী সাংঘাতিক কল করেছে দ্যাখ একবার। ওই ঘরটাই ওর দুর্বলতম জায়গা। ওখানে পৌঁছতে গেলে গোলকধাঁধা না পার হয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আবার গোলকধাঁধার পাহারাদার হলে সাক্ষাৎ শমন ওই বাঘটা।

"আমি পড়লাম মহাফাঁপরে। ছড়াটায় 'বাঘবন্দি' 'ঘরবন্দি' কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে বাঘটাকে বন্ধ রাখার কোনও উপায় আছে। কী সেটা?

"আবার ভাল করে রাস্তাগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার চেষ্টা করলাম। যে কয়েকটা রাস্তা মূল জমি থেকে সামান্য নিচুতে, তার নকশার মধ্যে একটা খেলার চেনা ছক যেন আবছাভাবে মনে পড়ছে।

"আসলে এসব খেলা আজকাল আর কেউ খেলে না। পিন্টুমামা মাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা দশ-পঁচিশ বা ষোলো ঘুঁটি খেলোনি ছেলেবেলায়?"

মা বললেন, "আমি খেলিনি। তবে মা-ঠাকুরমাদের খেলতে দেখেছি।"

পিন্টুমামা বলল, "এই খেলাগুলো এবং পাশা, সব একই ঘরানার খেলা। একটু এদিক আর ওদিক। খেলাগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়ল, বাঘবন্দি, হ্যাঁ বাঘবন্দির ছক ধরেই এগোতে হবে।

"আসল বাঘবন্দির সঙ্গে এই খেলার একটা ছোট্ট তফাত আছে। এখানে ভুল দান ফেললে বাজি হারার বদলে নিজের প্রাণ হারাতে হবে।

"আশ্চর্য ব্যাপার কী জানিস, ওই ছক ধরে এগোতে-এগোতে দরজার অনেকটা কাছে পৌঁছে গেলাম। লাল আভাটা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মনে বেশ আশা জাগছে। ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে পরের রাস্তাটায় পা দিতেই আড়মোড়া ভেঙে বাঘটা জীবন্ত হয়ে উঠল। আমি এক লাফে পিছিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুখ দিয়ে গরগর আওয়াজ করে আমার দিকে রাজার মতো পা ফেলে আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল।

"আমি কি ঠিক জায়গায় দাঁড়াইনি? ভয়ে, আতঙ্কে আমি এ রাস্তা ও রাস্তা ছোটাছুটি করতে লাগলাম। খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে তার থাবার তলায় মাথা পেতে দেওয়াই ভাল। সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভাবলাম, এত দূর এসে এভাবে মরব? জাদুসম্রাট পরমেশের সাহায্য পেয়ে তা হলে কী লাভ হল?

"ধাঁধাটার মধ্যে মরণের কথা আছে। মরণ যদি আসে ধেয়ে, যদি আসে মানে, এসেই তো গিয়েছে। দানিশার সঙ্গে লড়াই করবার আগে এভাবে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে, এ আমার কল্পনারও বাইরে। 'রামের শরণ' কথাটার মানে কী? আমরা তো রামরাজ্য বলতে বুঝি ভাল রাজার শাসন, যেখানে অরাজকতা নেই। এখানে কীভাবে রামের শরণ নেব?

"পরমেশ কি রামনাম জপ করার কথা বলেছে? হতে পারে। রামনাম জপ করলে যত অশরীরী ভূতপ্রেত দূরে সরে যায়, এটা তো জানাই আছে। প্রাণপণে রামনাম জপ করতে লাগলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। বাঘের গায়ের বিকট গন্ধটা পর্যন্ত নাকে যেন ঝাপটা মারল। রামের শরণ কথাটার নিশ্চয়ই অন্য একটা অর্থ আছে। আর সময় নেই। মরিয়া হয়ে মাথা ঠান্ডা করে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, দরজাটার কোনাকুনি যে রাস্তাটা, সেখানে গাছের জটলা একটু বেশি হওয়ার জন্য জায়গাটা একটু বেশি অন্ধকার হয়ে আছে। বাঁচবার জন্য প্রাণপণে সেদিকেই দৌড় লাগালাম। গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ঢুকেছি আর বাঘটা লাফ দিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি অক্ষত রইলাম কী করে?

"বাঘটা রাস্তাটার ধারে গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটার বাইরে বিকট হিংস্র মুখ করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। বসে রইল পাথর হয়ে। তোদের গোটা ঘটনাটা বলতে সময় লাগল বটে, কিন্তু এটা ঘটল যেন ঝড়ের বেগে। বাঘটাকে পাথর হয়ে বসে থাকতে দেখেও আমার বুকের ধুকপুকুনি কমল না। তখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, বাঁচলাম কী করে। এটাই কী তবে রামের শরণ নেওয়া?

"একটু ধাতস্থ হয়ে উপর-নীচে, আশপাশে তাকিয়ে দেখি, আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা গাছ।"

আমি উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "পঞ্চবটী।"

পিন্টুমামা খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস। যদিও আসল লোকের সঙ্গেই মুখোমুখি হওয়া বাকি, তবুও ক্রমশ আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানি না। হঠাৎ দেখি, দানিশা আসছে। সে ঠিক রাস্তা ধরে পাথরের বাঘকে না জাগিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

"এবার আমার আসল পরীক্ষা। দানিশার চোখ এড়িয়ে পা দিলে পাথরের বাঘ জেগে উঠবে। আবার দানিশার পিছু নিলেও সে টের পাবে। দু'টো শত্রুকে খালি হাতে ঠেকাব কী করে? মন্ত্রের মতো ধাঁধার ছড়াটা জপ করতে লাগলাম। ওখানেই লুকিয়ে আছে আমার বাঁচার উপায়। এখনই যদি তার মানে না বুঝতে পারি, তবে মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে এই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

"বনের রাজাকে বন্ধ করে এই পর্যন্ত তো এগিয়েছি। এখন দানিশার সঙ্গে-সঙ্গেই যদি ওই ঘরটায় ঢুকতে পারি, তা হলেই ঢোকা যাবে। কায়ার পিছে হয়ে ছায়া, আমাকে ছায়া হয়ে যেতে হবে। কীভাবে সম্ভব সেটা।

"এই সবই কিন্তু ঘটছে খুব দ্রুতবেগে। দানিশা চলে এসেছে একেবারে পাশের রাস্তায়। আর-একটু এগোলেই দরজা। দানিশা এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে তার লম্বা ছায়া। ধাঁধাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে-ঘামাতে মাথাটা বেশ খোলতাই হয়ে উঠেছে। ধাঁধার আর-একটা সূত্র মিলে গেল। দানিশার ছায়ার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দানিশার ছায়াটার উপরে পড়লাম। ওর পিছন-পিছন খুব সাবধানে।

"ছায়াটা ছেড়ে যেন বেরিয়ে না যাই, সেদিকে লক্ষ রেখেছিলাম। আবার এত হাল্কা পায়ে নিশ্বাস বন্ধ করে, প্রায় হাওয়ার মতো, অদৃশ্য বিড়ালের মতো নিঃশব্দ ছায়া হয়ে দানিশার

পিছন-পিছন হেঁটে যাচ্ছিলাম যে, নিজেই নিজের কেরামতিতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

"দানিশা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত থেকে জড়ানো কালো দড়ির মতো কী একটা খুলে দাঁতের খাঁজের মধ্যে রাখল। আমি প্রথমে দড়িই ভেবেছিলাম। পরে জিনিসটার নড়াচড়া দেখে বুঝলাম, একটা কালো সরু হিলহিলে সাপ।

"আমার চোখের সামনে উপরের দাঁতের পাটিটা নেমে এসে সাপের ধড় আর মাথাটা আলাদা করে দিল। ধড়টা ছিটকে পড়ে কিলবিল করে নড়তে লাগল। কী পৈশাচিক কাণ্ড ভাব একবার! আমি যদি বাঘের হাত থেকে রেহাইও পেতাম, এই দরজার খাঁজে প্রাণ দিতে হত। অজ্ঞানী প্রাণী প্রেতসিদ্ধর সাহায্য ছাড়া দরজা পার হতে পারবে না। আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল। নিজের শক্তি বাড়ানোর জন্য দানিশা যে এভাবে কত প্রাণী হত্যা করে চলেছে, সেই কথাটা ভেবে রাগে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। দানিশা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের এক দিকে একটা শোকেসে পেঁচা, বাদুড়, বিড়াল, কুকুর, গুবরেপোকা, কত রকমের মুখোশে যে বোঝাই হয়ে আছে, তার ঠিক নেই। এগুলো তার মানে দানিশার আসল পসরা। মন্ত্রশক্তির বলে ইচ্ছেমতো সে এদের পরিচালনা করতে পারে। ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর আর লুকিয়ে থাকার দরকার হল না, বুঝতেই পারছিস।

"তোরা যদি সেই সময় দানিশার মুখ দেখতিস, অমন বিকট, নিষ্ঠুর, হিংস্র মুখ আমি সারা জীবনে দেখিনি। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন তার রাগ ফুটে বেরোতে লাগল। সুযোগ পেলে সে যে ওই সাপটার মতোই ধড় আর মুন্ডু আলাদা করে ফেলবে, এতে সন্দেহ নেই।

"দানিশা হিসহিস করে বলল, 'আর-একটা মাত্র আত্মা হলেই আমি সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতাম। আমাকে মারতে পারে এই রকম অস্ত্র আর কেউ কোনওদিন খুঁজে পেত না। আজ পর্যন্ত কোনও প্রেতসিদ্ধ যা পারেনি, তাই হত। আমি অমর হয়ে যেতাম। তুই তার আগেই বাগড়া দিলি? তোকে আমি ছাড়ব না।'

"দানিশা আমাকে মারবার জন্য ছুটে এল। আমি ওই দানবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ফায়ার প্লেসের আগুনটার কাছে সরে গেলাম। তার মধ্যেই ভাবনাগুলো ঝড়ের মতো মাথায় খেলে যাচ্ছিল।

"প্রথমত, দানিশা এত ভয় পাচ্ছে কেন? আমার চেয়ে দশ গুণ বেশি শক্তি ধরে ও। আমাকে পোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে পারে ইচ্ছে হলে। তবে কী এই ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঢুকলে প্রেতসিদ্ধর শক্তি কমে যায়?"

পিন্টুমামার গল্পে বাধা পড়বে জেনেও বলে উঠলাম, "নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের মতো? মেঘনাদ যজ্ঞ শেষ করার আগেই লক্ষ্মণ ঢুকে পড়েছিল বলে মেঘনাদকে মারা গেল। নয়তো তাকে তো কেউ বধ করতে পারত না, তাই না?"

পিন্টুমামার গল্পটা রামায়ণের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করায় মামা যে খুব খুশি হল তা বলাই বাহুল্য।

মামা মুখে কিছু না বলে একটু হেসে আমার কথাটা সমর্থন করে আবার গল্পে ফিরে গেল, "ধাঁধার লাইনগুলো অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে এত দূর আসবার জন্যই বোধ হয় আমার আত্মবিশ্বাসটাও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

" 'প্রেতসিদ্ধ কুপোকাত' এই কথাটার সঙ্গে মাথার মধ্যে দানিশার বলা আর-একটা কথাও ঘুরছিল। দানিশাকে মারবার অস্ত্রটা তা হলে এখনও অদৃশ্য হয়ে যায়নি। ওটা এ ঘরের মধ্যেই কোথাও আছে। ইতিমধ্যে দানিশা আমার খুব কাছে চলে এসেছে। আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে তার গলার তিরচিহ্নটা। এই একমাত্র অস্ত্র ছাড়া আর তো কোনও কিছু চোখে পড়ছে না।

"দানিশা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে আসছে, আর আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য তার মুখে হাতের ঝাপটা মারতেই যেন দ্রুত প্রলয় ঘটে গেল।

"আমার হাতে হাড় দিয়ে তৈরি একটা তির কীভাবে চলে এল? আমার অভিজ্ঞ ডাক্তারি চোখ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলাম, এটা মানুষের হাড়। তোদের বোধ হয় ধাঁধার সব কথাগুলো মনে নেই। 'হাড়ে গড়া হারানিধি' এখন আমার হাতের মুঠোয়।"

পিন্টুমামা হাত মুঠো করে আমাদের দেখাল, যেন এখনও অদৃশ্য অস্ত্রটা ধরে আছে। আমিও সুযোগ বুঝে বিদ্যে ফলিয়ে বলে ফেললাম, "দধীচির বজ্র।"

যথারীতি পিন্টুমামা দারুণ খুশি হল। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "শাবাশ ঝন্টে। একেবারে লাগসই তুলনাটা দিয়েছিস। কী রে তুলি, দধীচির বজ্রের কথা জানিস তো?"

এই রকম সময় গল্পে বাধা পড়ায় তুলি রেগে গিয়েছিল। ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "সকলেই জানে বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য দধীচির হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি হয়। সেটা দিয়েই ইন্দ্র অসুর বধ করেন।"

পিন্টুমামাও সন্তুষ্ট হয়ে গল্পে ফিরে যায়, "আর-একটু দেরি হলেই এই অস্ত্র চিরতরে মিলিয়ে যেত। হয়তো দানিশার শরীরের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেত। কোনওদিন আর তাকে বধ করা যেত না। অস্ত্র তো পেলাম, তিরটা হাতে আসামাত্র দানিশা মুখ চেপে বসে পড়েছিল। একটু পরে সে যখন মুখ তুলল, কী দেখলাম জানিস? ওই রকম বীভৎস দৃশ্য আমি সারাজীবন ভুলব না। দানিশার গালে যেখানে তির আঁকা ছিল, সেই অংশটা ফাঁকা, কালো অন্ধকার লম্বা জায়গা। সমস্ত মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। নরখাদক বাঘ যেমন গুলি খেয়ে শেষ মরণকামড় দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, দানিশার অবস্থাও তেমনই মনে হল।

"হাতের উপর ভর দিয়ে দানিশা উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাতে চাপ পড়ার দরুনই বোধ হয় শিরা-উপশিরাগুলো আরও ফুলে উঠেছে।

"আর বেশি কিছু ভাবার আগেই দানিশা ছুটে এসে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার গলা টিপে ধরল। আমার মুখ থেকে একটু তফাতে দানিশার মুখ। গ্যালিলিয়া হোটেলে যেমন পচা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেই রকম বিকট গন্ধে আমার নিশ্বাস আটকে আসতে লাগল।

"গলার উপর দানিশার হাতের চাপ ক্রমশই বাড়ছে। গড়পড়তা বাঙালির তুলনায় আমার গায়ে বেশি জোর থাকলেও, এই দানবের সঙ্গে শক্তিতে এঁটে ওঠা অসম্ভব।

"সেই সংকট মুহূর্তেও মনে হচ্ছিল, হাতে অস্ত্র পেয়েও কিছু করতে পারলাম না। এইভাবে হানাবাড়ির মধ্যে একটা লোকের বিদ্‌ঘুটে পাগলামির জন্য সকলের চোখের আড়ালে অজান্তে আমার মৃত্যু ঘটবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মরিয়া হয়ে হাতের তিরটা দিয়ে দানিশার চোখে আঘাত করলাম। বললে বিশ্বাস

করবি না, ঠিক যেন হাওয়ার মধ্যে ঢুকে গেল তিরটা। দানিশার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। দানিশা বিকটভাবে অট্টহাস্য করে উঠল। কালো অন্ধকারটা আমার চোখের সামনে বড় হয়ে যেন আমাকেই গিলে খেয়ে ফেলবে।

"আমার ভিতরটা হায়-হায় করতে লাগল। অস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও কিছু করতে পারলাম না! এই আফশোস আমার মরার চেয়ে বেশি হয়ে উঠল। শেষ লাইনটা মাথার মধ্যে চরকি পাক খেতে লাগল। মৃত্যু আর কিছুক্ষণের মধ্যে। চোখের সামনে হাজার-হাজার সরষে ফুল। দানিশার দু'টো থামের মতো হাত আমার গলায় চেপে বসেছে। চোখের এত কাছে সমস্ত হাত জুড়ে শিরাগুলো নদীর নানা শাখাপ্রশাখার মতো নেমে এসেছে লাল টকটকে হয়ে। যেন রক্তের নদী!

"মরতে-মরতেও খড়কুটো আঁকড়ে ধরে যেন বাঁচতে চাইলাম। এই তো পেয়েছি 'রক্তনদী', যা থাকে কপালে! হাতের তিরটা চালিয়ে দিলাম সবচেয়ে মোটা শিরাটার উপর। দানিশার মুখের পৈশাচিক হাসিটা মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে। স্রোতের মতো রক্ত ছিটকে এসে লাগল আমার চোখে-মুখে। সমস্ত লালে-লাল হয়ে গেল। আমি জ্ঞান হারালাম। এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। চোখ মেলে দেখি, দানিশা আছড়ে পড়েছিল ফায়ার প্লেসের কাছে। সেখান থেকে কীভাবে যেন আগুন ওর মাথার চুলে লেগে মুখটুখ পুড়িয়ে শরীরের নীচের দিকে নামছে।

"প্রেতসিদ্ধর সদ্‌গতির ব্যবস্থা আপনা থেকেই হয়ে গেল দেখে খুশি হলাম। সবচেয়ে আজব কাণ্ড কী জানিস? ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি, বাঘবন্দি খেলার ছক, পাথরের বাঘ, সব উধাও। দানিশার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তার ল্যাবরেটরি পাহারা দেওয়ার দরকারও ফুরিয়েছে।

"এবার আমার দ্বিতীয় কাজ। এটি শেষ হলেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব। আমাকে কী করতে হবে তা স্থির করে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। দানিশার মৃত্যুর পর পুতুলটার মধ্যে বারবার শক্তি বাড়িয়ে চালনা করবার কেউ নেই। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করি। মার্কো-কাতিয়ার সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয়। কুশল জিজ্ঞেস করি। তারাও দু'-চারটে কথা বলে। মার্কো-কাতিয়া সাধারণত বোলনিয়া থেকে ভেনিস পৌঁছয় শুক্রবার বিকেলে। আমি ইচ্ছে করেই শনিবার আমার রোমে ফেরার টিকিট করে রাখলাম।"

এই সময় মা উসখুস করতেই পিন্টুমামা বলল, "আর বেশি নেই। একটুখানি বাকি আছে, এইটুকু শুনে যাও।"

মা বললেন, "তুলির ঘরে কাচের বাক্সে মস্ত যে পুতুলটা আছে, হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়ে গেল। সেটা তুলির ঘরে আর না রেখে এবার কাউকে দিয়ে দিলেই তো হয়। বড় হয়ে গিয়েছে, পুতুল দিয়ে কী করবে?"

পিন্টুমামা মাকে আশ্বস্ত করে বলল, "আমাকেই দিও। দেখব, কাকে দেওয়া যায়! এখন ছটফট না করে বাকিটা শোনো।

"যথারীতি ভেনিসের জলপথে মার্কো-কাতিয়ার সঙ্গে দেখা হল। প্র্যামটা এক ধারে রেখে ওরা দু'জনে কখনও দৃশ্য দেখছে,

আবার মাঝে-মাঝেই গল্পেও মশগুল হয়ে পড়ছে। আমি খুব দূর থেকে ওদের গতিবিধির উপর খেয়াল রেখে চলেছি।

"একটা সরু জলপথের আড়ালে আগে থেকেই গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। ওদের গন্ডোলাটা কাছাকাছি আসতেই আমি বাঁকের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ-বেগে বেরিয়ে ওদের গন্ডোলায় লাফ দিয়ে পড়ে পুতুলটা তুলে নিলাম এবং ওরা কিছু বুঝবার আগেই আঁকাবাঁকা সরু গলিপথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। পিছনে হট্টগোল, দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজ শুনতে পেলাম খানিকক্ষণ। আমি আর কোনও দিকে তাকাইনি। যত রকম প্যাঁচালো গলিপথ ধরে চোখের আড়ালে দূরে চলে যাওয়া যায়, সে চেষ্টাই করে যেতে লাগলাম একমনে। খানিকক্ষণ পরে পিছনের হট্টগোল কমে গেল। আমার সঙ্গে ওরা পারবে কেন? রুগি দেখার সুবাদে ভেনিসের জলপথ আমার একেবারে হাতের তালুর মতো চেনা। একটা অন্ধকার সাঁকোর নীচে খানিকক্ষণ জিরিয়ে টর্সেলো দ্বীপে সান্টা মার্গারিটা গ্রেভইয়ার্ডে গিয়ে পৌঁছলাম।

"আগেই দেখে রেখেছিলাম, 'আওয়ার বিলাভেড ডটার' ইত্যাদি লেখা অপেক্ষাকৃত নতুন মার্বেলের ফলকটা। পুতুলটার ফরসা, সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, যেন তার চোখের কোণে জল টলটল করছে। নিজের নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হল। এমন সুন্দর পুতুলটাকে অশুভ শক্তির প্রতীক ভেবে আমি বোধ হয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি। তা ছাড়া দানিশা যখন নেই তখন একেও আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার কাজ যে এখনও শেষ হয়নি, সেটা আমি ভুলেই গেলাম।

"আমার মনটা আস্তে-আস্তে নরম হয়ে এল। পুতুলটার মুখের মধ্যে কেমন যেন সম্মোহনী শক্তি আছে। এত কাণ্ডের পরেও আমি ভুলে গেলাম, গত দু'শো বছরে কত প্রাণের বিনিময়ে এই পুতুলটা বেঁচে ছিল।

"হঠাৎ হাতের মধ্যে মৃদু স্পন্দন অনুভব করলাম। মনের দুর্বলতা ও দ্বিধার জন্যই বোধ হয় হাতের বাঁধনটা আলগা হয়ে পুতুলটা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেল খানিকটা। গড়িয়ে-গড়িয়েই চোখের আড়ালে চলে যেত, যদি সান্টা মার্গারিটা চার্চের আওয়াজে আমার হুঁশ না ফিরে আসত। চটকা ভেঙে দৌড়ে গিয়ে একটা সমাধির পিছনের ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া পুতুলটাকে চেপে ধরলাম। এবার বুঝলাম, প্রেতসিদ্ধ না থাকলেও তার পুষ্যি প্রেতের কেরামতিও কম নয়।

"ধাঁধাটার শেষ দু' লাইন মনে পড়ে গেল, 'খুঁজে দ্যাখো আত্মাটারে/মুক্তি দিও মনে করে।' এটাই সবচেয়ে জরুরি কাজ। নয়তো পরমেশের তৈরি করা এই অশুভ শক্তি অন্য কোনও প্রেতসিদ্ধর হাতে পড়ে নতুন দেহ ধারণ করে আবার তার খেলা শুরু করে দেবে। উপযুক্ত জায়গাটা কী হতে পারে, সেটা আগেই দেখে রেখে ছিলাম। আর দেরি না করে মার্কো-কাতিয়ার মেয়ের সমাধিটা খুঁড়ে পুতুলটাকে শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়ার আগে একটুও মায়া না করে পুতুলটার মাথা থেকে পেট পর্যন্ত চিরে ফেললাম। বুকের মাঝখান থেকে একটা নীল রঙের পাথর গড়িয়ে পড়ে গেল।

"এইটাই যে আত্মা, তাতে আর সন্দেহ রইল না। কারণ, এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত প্রাণপণ শক্তিতে পুতুলটাকে চেপে রাখতে হচ্ছিল। পাথরটা পড়ে যাওয়ামাত্রই পুতুলটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

"মার্কো-কাতিয়ার কথা ভেবে একটু কষ্ট হল। তাদের সাধের পুতুলের কী অবস্থা! অবশ্য এটা ঠিকই, তারা প্রথম-প্রথম ক'দিন একটু পাগলামি করবে। তারপর আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। যদি এত কাণ্ড না-ও ঘটত, যদি পাঁচটা পুতুলের মতো স্বাভাবিকও হত, তা হলেও আমার মতে ওরা পাগলামিই করছিল। মরা মেয়ের পুতুল নিয়ে মাসের পর মাস অন্য কাজকর্ম ফেলে ঘুরে বেড়ানো পাগলামি বইকী।

"আমার আর সেই মুহূর্তে ওদের কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না। নয়তো উদ্দীপন সাড়ে সাত-এর আড়াই ডোজ করে দু'জনকে খাইয়ে আসতাম।"

পিন্টুমামা গল্প শেষ করে কোল থেকে তাকিয়া নামিয়ে বলল, "তাই বলছি, তোদের বাবার তো দেখা হল না। তোরা যদি কখনও ভেনিস যাস, সান্টা মার্গারিটা গ্রেভইয়ার্ডে আমার কীর্তিটা দেখে আসতে ভুলিস না!"

আমি বললাম, "এ কী পিন্টুমামা, মন্ত্রনীলকের কী হল বললে না তো? ত্রিদিবেশ যেটা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, ওটা দানিশার কাছে পাওয়া যাবে।"

পিন্টুমামা অবাক হয়ে বলল, "ওঃ হরি, তোরা যে মন্ত্রনীলকের ব্যাপারটা ধরতেই পারিসনি, বুঝতে পারিনি। পুতুলটার আত্মাটাই তো মন্ত্রনীলক। ওটার মধ্যেই আসল মন্ত্রশক্তি। পরমেশ পুতুলটা তন্ত্রমন্ত্র, ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়ে তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু ভিতরে মন্ত্রনীলক না থাকলে আত্মাভোজী প্রেত এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠত না। ত্রিদিবেশ ও দানিশা ওই মন্ত্রনীলকের শক্তিতেই যা খুশি তাই করে বেড়িয়েছে।

"পরমেশ যখন দেখল তার মন্ত্রনীলক চুরি গিয়েছে, সে বুঝতে পেরেছিল, এটা কার কীর্তি। এদিকে হাজতের প্রহরীটিকে সে ওই রকম একটা জিনিস বানিয়ে দিয়েছে। পরমেশ বুঝতে পেরেছিল, ত্রিদিবেশ মন্ত্রনীলকের জোরে মহাশক্তিমান ওই পুতুলকে খুঁজে বের করবেই। ওটাই হবে তার হাতিয়ার। সে নিজে তখন বৃদ্ধ, অন্ধ। চলার শক্তি নেই। তার উপর টর্সেলো থেকে সেন্টমার্কের দূরত্বও কম নয়। কীভাবেই বা সেই প্রহরীকে খুঁজে বের করে পুতুল ফেরত নেবে, সেই সময় কিছু করতে না পারলেও পরমেশ তার ক্ষমতাবলে আমার কথা জানতে পেরেছিল। সেই জন্যই ধাঁধার সংকেতের মধ্যে প্রেতসিদ্ধর বিনাশের উপায় বলে গিয়েছিল। যাই বলিস, পরমেশ লোকটাকে কিন্তু বাহবা দিতেই হয়। এত বছর আগেও ঠিক বুঝতে পেরেছিল, আমি ছাড়া ও ধাঁধার সমাধান করা আর কারও কম্ম নয়।"

তুলি উত্তেজিত হয়ে বলল, "তার মানে ওই মন্ত্রনীলকটা এখন তোমার কাছে?"

পিন্টুমামা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলল, "আমার কাছে শুধু যে আছে তাই নয়, প্রতিদিন সকালবেলা ওটা দিয়ে আবার দু'টো আখরোটও ভেঙে খাই, তা জানিস?"

(সমাপ্ত)

সম্পূর্ণ রঙিন জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স **রাঙ্গা রায়ের কাণ্ড** পঞ্চমাংশ ● গল্প ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

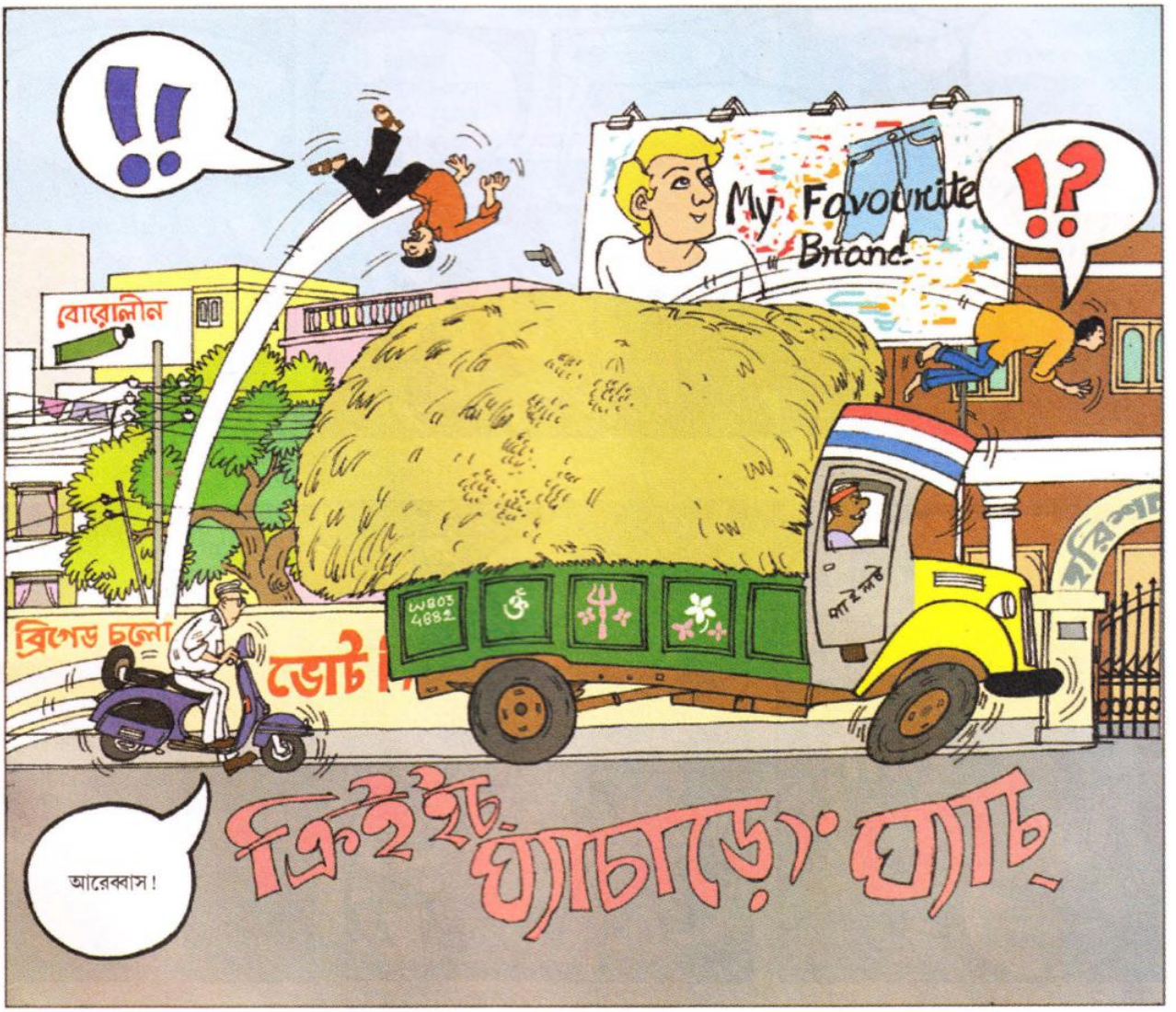

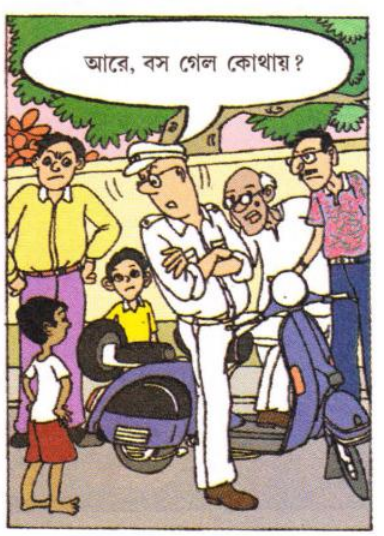

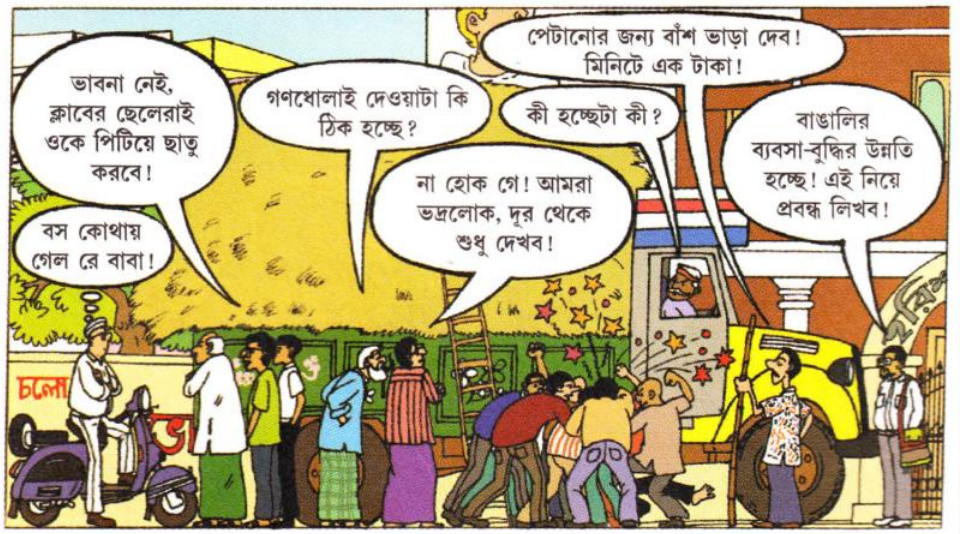
ভাবনা নেই, ক্লাবের ছেলেরাই ওকে পিটিয়ে ছাতু করবে!
বস কোথায় গেল রে বাবা!
গণধোলাই দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?
না হোক গে! আমরা ভদ্রলোক, দূর থেকে শুধু দেখব!
কী হচ্ছেটা কী?
পেটানোর জন্য বাঁশ ভাড়া দেব! মিনিটে এক টাকা!
বাঙালির ব্যবসা-বুদ্ধির উন্নতি হচ্ছে! এই নিয়ে প্রবন্ধ লিখব!

কয়েক মিনিট পর...
একবার দেখুন, দাগিটাকে পিটিয়ে কী হাল করেছি!
4882
TOP

ব্যাটার কাছে আবার বন্দুক ছিল!
সে কী! বন্দুক থাকার তো কথা নয়!

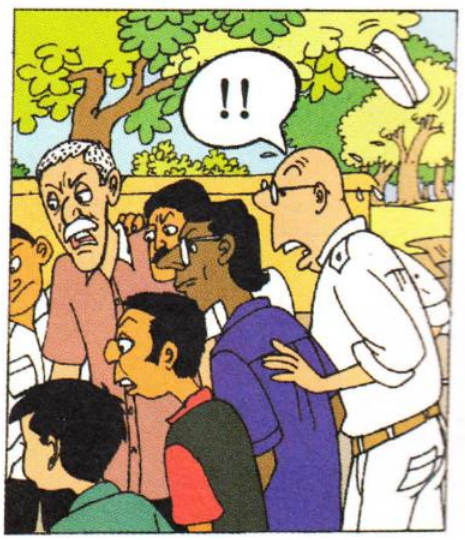
!!

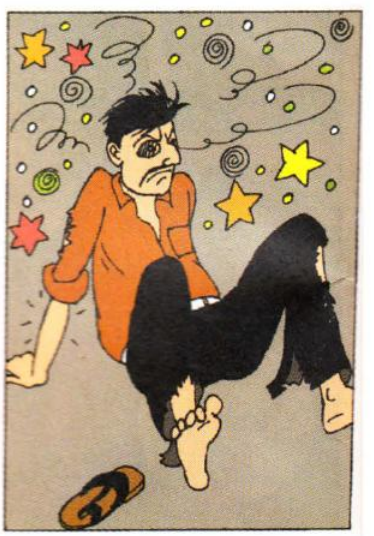

এ ব্যাটাও লরি চেপেই যাচ্ছিল! তার মানে এ ব্যাটাও পাজি! অতএব পেটাও!
মোটেই না! আমি কিচ্ছু জানি না!

খবরদার, আর পেটাবে না! আইন নিজের হাতে নেবে না! এখন আহত লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! যাকগে, ওর বন্দুকটা কোথায়?
WB-03 4882

সেটা কে যেন ছুড়ল, পাশের পুকুরে গিয়ে পড়ল।
ওফ, বস আমাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে!

কিছুক্ষণ পর...
এ কী! তুমি আবার কে! ডাকাত নাকি!
না, না কাকু, আমি কলেজে পড়ি! এখানে জ্যামে পড়ে দেরি হয়ে গিয়েছে। সামনের মোড় অবধি যাব!
GOODS
RRIAGE
কাকু, কাকু বলে খোশামোদ করতে হবে না! চলো পৌঁছে দিচ্ছি!
পরে...
খাচ্ছদাচ্ছ, ঘুরছ-ফিরছ আর গোলমাল পাকাচ্ছ! বিচ্ছুর দল! যাও, আমার হাঁপানির ওষুধ কিনে আনো, আর বাচ্চাগুলোকে পাচারের ব্যবস্থা করো!
হ্যালো, আমি থানার ওসির সঙ্গে কথা বলতে চাই! হ্যাঁ...
...সবই তো শুনলেন। আজ সকালে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছি। এখন ফোর্স পাঠান!
আরে, বিচ্ছুটা তো ফোন ছাড়তেই চায় না!
ওরা সতর্ক হয়ে গিয়েছে! আমি অবশ্য নজর রাখছি!
এই যে ভাই, লাইনে আছ?
দেখতেই তো পাচ্ছেন!
PCO
STD
ISD
হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না! দেখছি, কত তাড়াতাড়ি কী করা যায়!

ফোর্স পাঠানো হল দু' দিন পর!
বিচিত্রা বুটিক
কলকাতা পুলিশ
পুলিশের গায়ে খুব জোর? ওরা কী খায়?
সব খায়!
হ্যালো, কে রাপ্পা? দু' দিন ধরে বাড়ি ফিরছ না... কী? গুন্ডাদের বাড়ির কাছে ঘর ভাড়া নিয়েছ? নজর রাখছ?
!!
ওই গুন্ডাদের দলেই নাম লেখাও! আর বাড়ি ফিরতে হবে না! হতচ্ছাড়া, হাড় জ্বালিয়ে দিলে!
ওদিকে...
এই ছেলেরা, চুপচাপ যেখানে যেতে বলছি, সেখানে চলো! একটাও কথা নয়!
না, কোথাও যাব না! আমরা বাড়ি ফিরব! আমাদের...
আমাদের কেন ধরে এনেছ? উঃ...
অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ...
লাল মারুতি করে সব কটাকে এখান থেকে পাচার করে দাও!
তার আগে একটু টাইট দিয়ে নিতে হবে!

দড়াম
খুক, খুক!
চোখ জ্বালা করছে!
খানিক পরে...
এখনও যতীন বাগচির কাছে মুক্তিপণ চেয়ে ফোনই করা হল না!
বস বলেছে, ওদের বেচে দিলেই পয়সা উঠে যাবে!
এ কী, চাবিটা তো গাড়িতেই লাগানো ছিল! ঘরে খুঁজে দ্যাখো!
আমি একা গিয়ে বসের দাঁতখিচুনি খেতে পারব না! তুমিও চলো!
WB20E8841
!!!
ভ্রুউঁম ভ্রুউঁম

ওফ, খুব জোর পালাতে পেরেছি! ভাগ্যিস চাবিটা হাতিয়েছিলাম!
বাচ্চাগুলোকে অজ্ঞান করে পাচার করে দিচ্ছিল! নাঃ, আগে হাসপাতালে যাওয়া দরকার!
থানায়...
কী ব্যাপার অফিসার? ডেকেছেন কেন?
একটা সূত্র পেয়ে অভিযানে যাচ্ছি! ছেলেকে পাওয়া যেতে পারে, চলুন!
দেখবেন, আপনাদের সঙ্গে অভিযানে গিয়ে আবার গুলিটুলি খেয়ে মরব না তো!
আরে, ভয় নেই! একদল পুলিশ আগে গেছে!
গোলাগুলি ওরা চালাবে। মরলে ওরা মরবে। আমাদের ভয় নেই, চলুন!
পথে যেতে-যেতে...
আরে, ওকী!
অফিসার গাড়ি ঘোরান! ওই গাড়িটায় আমার ছেলে রয়েছে!
!!
এই বার ধরেছি। যাবি কোথায়!
হ্যা, হ্যা, এবার? কোনও চালাকি চলবে না, বুঝলে!
তার মানে?

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া বন্ধ!
পাবলিক বলে, পুলিশ নাকি কোনও কাজই করে না!
পাবলিক মানেই বোকা!
ওদের নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম!

তা হলে তুমিই পালের গোদা!
কী যা-তা বলছেন?
ন্যাকা, যেন কিস্‌সু জানে না!

আপনাকে তো আমিই খবর দিলাম! এর আগে তো কয়েকবার থানায় গেছি!
তবেই বুঝুন!
সেটাই তো সন্দেহজনক! খবর দেওয়াটা হল চালাকি!

আপনার খুব বুদ্ধি! আগে বাচ্চাগুলোকে হাসপাতালে নিয়ে যান, পরে আমাকে জেলে পুরবেন!

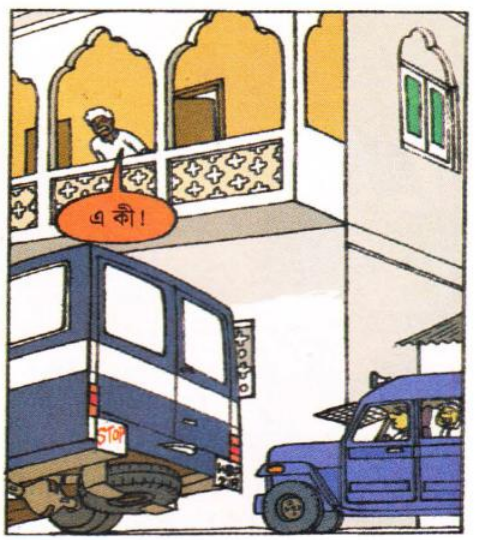
এ কী!

এই, চারদিক ঘিরে ফ্যালো! কুইক!

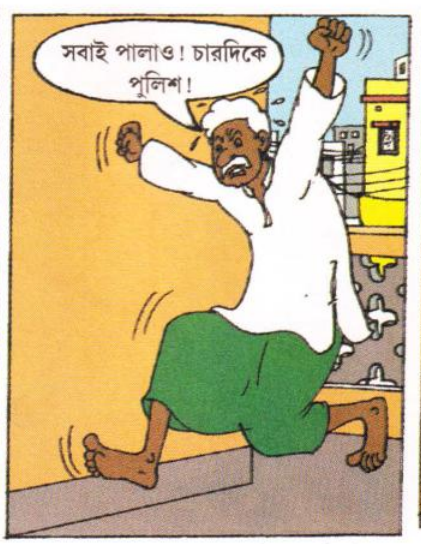
সবাই পালাও! চারদিকে পুলিশ!

সক্কলে এই ঘরে চলে এসো!

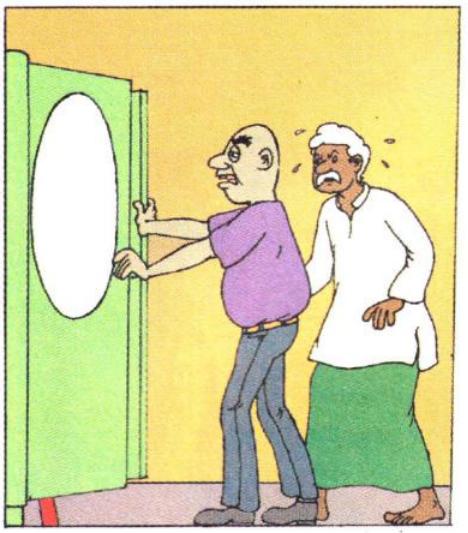

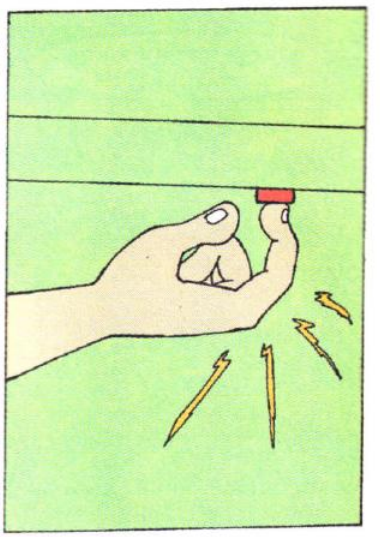

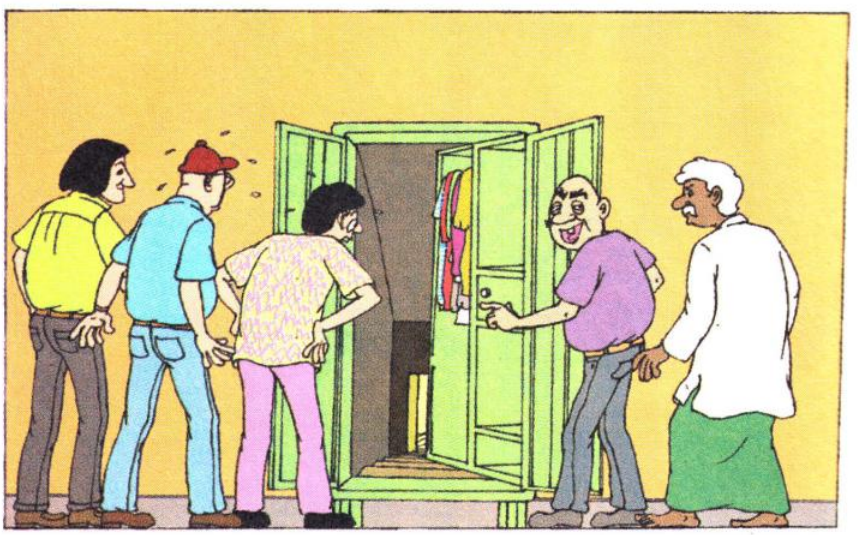

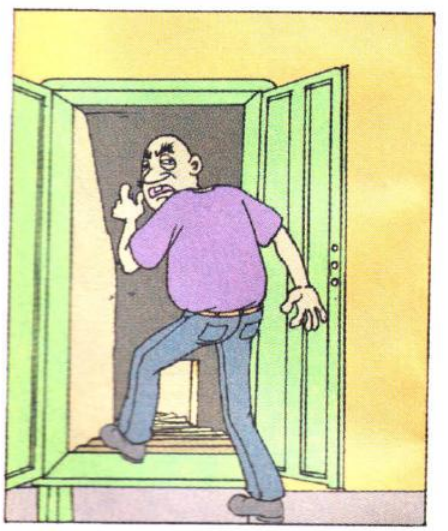

বস গেলেন কোথায়?
তুমি এদিকে এসো!

দাঁড়িয়ে রেডিও শুনছ নাকি? দরজাটা ভাঙার ব্যবস্থা করো!

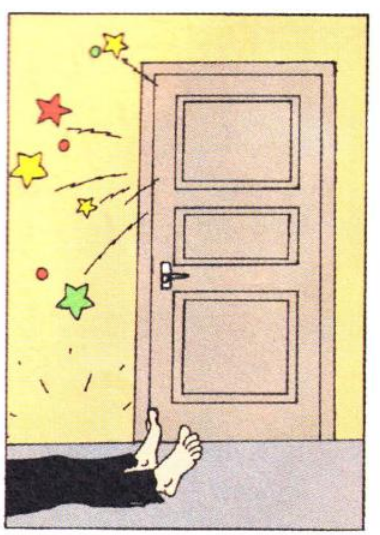

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে! এটাকে গাড়িতে তোলো!
বডিটা রইল। তুই গাড়িতেই থাক!
সে তো ভাল কথা!
যাক, দৌড়োদৌড়ি করার চেয়ে এই ভাল! একটু খইনি খাওয়া যাক!
তোমাকেও একটু দেওয়ার ইচ্ছে ছিল...ওঁক...

আঃ, ঠেলছ কেন?
কারণ, পিছনে পুলিশ!
ভাগ্যিস গাড়িটা ছাড়িয়ে এনেছিল!
উঠে পড়ো চটপট!
মোবাইলটা ফেলে এসেছি!
WBJ 226
বেশ করেছ!
ওটা পুলিশ পেলে সকলে ধরা পড়ব। দাঁড়াও!
এই আলমারিটা দেখা দরকার!

একদম নড়বে না!
জন এত দেরি করছে কেন?
যা ভেবেছি! এখান থেকে পালানোর রাস্তা আছে!
পুলিশ আসছে! গাড়ি ছাড়ো!
গুলি না চালালেই হত! ওদেরও বন্দুক থাকতে পারে!
গুমুম
ওফ, কী টার্গেট! এক গুলিতেই টায়ার ফাটিয়ে দিলেন!
সবাই বেরোও। হাত তোলো!
আমি ড্রাইভারটাকে মারব ভেবেছিলাম!
কেউ চালাকি করবে না। গুলি চালিয়ে দেব কিন্তু!
ওদিকে...
পুলিশগুলো তো আচ্ছা! আমাকে জেলে পুরে দিল!
দেখে মনে হচ্ছে নতুন!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

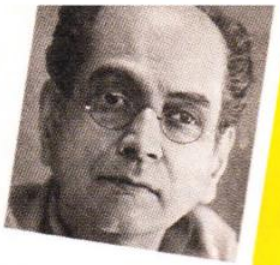

কুইজ়

রংবেরঙের, মজাদার কতরকমের যে পুতুল আছে সারা বিশ্বে, তার ইয়ত্তা নেই। পুতুলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক বিখ্যাত মানুষের নামও। দেশবিদেশের এরকম সব পুতুল নিয়েই এবারের কুইজ়।

১ রুথ এবং এলিয়ট হ্যান্ডলার নামের এক দম্পতি এই পুতুলটি ১৯৫৯ সালে প্রথম তৈরি করেন। সারা বিশ্বে ভীষণ জনপ্রিয় এই পুতুলটির নাম কী?

২ মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডর রুজভেল্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোন পুতুলের নাম?

৩ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় দেখা যায় বেনি পুতুলের নাচ। নদিয়ায় দেখা যায় তারের পুতুলের নাচ। কোন জেলায় ডাং বা লাঠি পুতুলের নাচ বিখ্যাত?

৪ আরব দেশগুলোতে বার্বিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলে দিয়েছে 'দ্য মুসলিম ডল'। এই পুতুলটির নাম কী?

৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মার্কিন সৈনিকদের আদলে তৈরি কোন পুতুল প্রথম ১৯৬৪ সালে বাজারে আসে?

৬ কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 'কাটুম কুটুম' পুতুলের নাম?

৭ কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মের ২৫০ বছর উপলক্ষে জার্মানিতে এ বছর তাঁর আদলে তৈরি হয়েছে পুতুল?

৮ কথাবলা পুতুলের খেলা যাঁরা দেখান, তাঁদের কী নামে ডাকা হয়?

অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

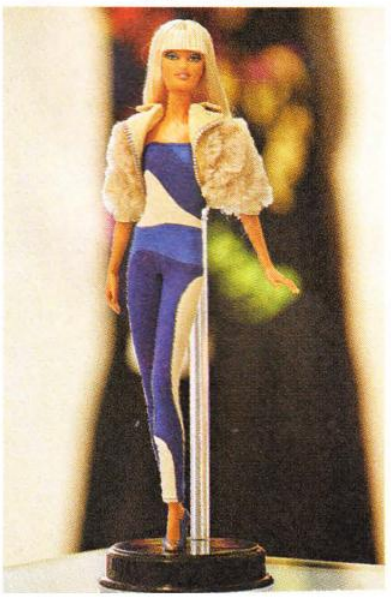

গত সংখ্যার উত্তর

১. ইরফান পাঠান।
২. নিউজ়িল্যান্ড।
৩. কোর্টনি ওয়ালশ।
৪. জিমি ম্যাথিউজ়।
৫. টেস্টে প্রত্যেকের দু'টো করে হ্যাটট্রিক আছে।
৬. এঁরা প্রত্যেকেই অভিষেক টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন।
৭. পাকিস্তানের জালালউদ্দিন।
৮. অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্পফর্থ।

জবাব চাই

১. কে লিখেছেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বইটি?
২. টেস্ট ক্রিকেটে অনিল কুম্বলের ৫০০তম শিকার কে?
৩. মোহন আগাসে, অনুপকুমার, রবি ঘোষ এবং বিভু ভট্টাচার্য, এই অভিনেতাদের মধ্যে মিল কোথায়?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. হরভজন সিংহ। ২. রুদ্রপ্রতাপ। ৩. মুথাইয়া মুরলিধরন।

সঠিক উত্তরদাতা

অনীক নন্দী, সপ্তম শ্রেণি, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়; **স্নেহাশিস সোম**, একাদশ শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক), উত্তর চব্বিশ পরগনা; **অভীক গোস্বামী**, পঞ্চম শ্রেণি, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা; **অর্ণব মহাপাত্র**, সপ্তম শ্রেণি, বাঁকুড়া জিলা স্কুল; **অর্ক মুখোপাধ্যায়**, একাদশ শ্রেণি, গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর; **দেবদীপ রায়**, সপ্তম শ্রেণি, বাদুড়িয়া এল এম এস হাই স্কুল (উঃ মাঃ), উত্তর চব্বিশ পরগনা; **এনাক্ষী মল্লিক**, একাদশ শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা; **বৃতি রায়**, একাদশ শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম গার্লস হাই স্কুল; **প্রিয়াঙ্কা সূত্রধর**, একাদশ শ্রেণি, মধ্যমগ্রাম গার্লস হাই স্কুল; উত্তর ২৪ পরগনা; **তিতলি সাঁতরা**, ষষ্ঠ শ্রেণি, বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া; **উদ্ভাস হাজরা**, ষষ্ঠ শ্রেণি, উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **রূপায়ন নন্দ**, চতুর্থ শ্রেণি, সাঁতরাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া; **বিদিশা হাঁসদা**, একাদশ শ্রেণি, বারাসাত গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা; **দীপ ঘোষ**, পঞ্চম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, হুগলি; **সত্যেন্দ্র মণ্ডল**, সপ্তম শ্রেণি, রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়; **অর্চিষ্মান মজুমদার**, নবম শ্রেণি, হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন; **শিল্পা দাস**, দশম শ্রেণি, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা; **অভিষেক দাস**, অষ্টম শ্রেণি, ইলিয়স মেয়র স্কুল, কলকাতা।

ই-মেল-এ যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে:
রায়া নন্দী, তৃতীয় শ্রেণি, হোলি চাইল্ড গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল; **তৃষা নন্দী**, নবম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল; **সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়**, বার্নপুর রিভারসাইড স্কুল; **পীযূষ নন্দী**, পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ; **চৈতালি রায়**, অষ্টম শ্রেণি, নিউ বারাকপুর কলোনি গার্লস হাই স্কুল, ২৪ পরগনা (উত্তর); **জয় ভৌমিক**, দশম শ্রেণি, দ্য সেন্ট্রাল মডার্ন স্কুল, ঘোলা কাজিপাড়া, বারাসাত, কলকাতা।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

হারানো হিরের আংটি

দেবব্রত পাল

যশরাজ সেনগুপ্ত এই ছোট শহরটায় দিনদুয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছে। সে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তিরিশ বছর বয়স। সুঠাম, লম্বা চেহারা। কাটা-কাটা মুখ। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। টিকলো নাকের নীচে পুরুষ্টু গোঁফজোড়া ওর ব্যক্তিত্বটাকে আরও ভারী করে তুলেছে।

যশরাজ অবশ্য এখানে কোনও গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার পরমেশ মিত্রর ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই চলে এসেছে।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান মিটে গেলে, পরদিন সকালে ডাক্তার মিত্র বললেন, "চলো যশরাজ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। এখানে অবশ্য দর্শনীয় তেমন কিছুই নেই। তবু গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমার ভালই লাগবে। কাছেই দুলকি গ্রামে একটা হাট বসে। আজ হাটবার। হাটেও দু' চক্কর পায়চারি করতে পারবে। কী রে অর্ক, যাবি নাকি তুই?"

ডাক্তারের আট বছরের ছেলে অর্কপ্রভ খুশিতে লাফিয়ে উঠল। বলল, "যাব। হাটতলায় সেই ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাবে তো?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "প্রতি হাটবারেই তো তাকে দেখি ম্যাজিক দেখিয়ে জলছবির কেমিক্যাল আর মলম বিক্রি করছে। আজ যদি না থাকে তো ব্যাড লাক।"

ডাক্তারের নতুন কেনা লাল মারুতিতে চেপে যেতে-যেতে গল্প জমে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন, "হাটের পাশেই খুব চালু একটা ওষুধের দোকান আছে। সেখানে প্রতি হাটবারে আমি রুগি দেখি। আমার চেম্বারের ঠিক পাশেই একটা হেলেপড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে রোজই দেখি, একটা তালঢ্যাঙা ছেলে ম্যাজিক দেখিয়ে এটা-ওটা বিক্রি করছে। ছেলেটার ভাবভঙ্গি বেশ ইন্টারেস্টিং। তবে সবচেয়ে মজা লাগে, যখন একটা কথাবলা খেলনা কাকাতুয়া নাকিসুরে নানা মন্তব্য করে।"

যশরাজ জিজ্ঞেস করল, "কীরকম?"

"যেমন ধরো, ছেলেটা হঠাৎ তোমার হাতে একটা পাঁচ টাকার কয়েন ধরিয়ে দিয়ে বলল, হাত মুঠো করতে। তুমি করলে। দিব্যি অনুভব করছ মুঠিতে কয়েন আছে। কিন্তু কয়েনটা ফেরত দিতে গিয়ে বেকুব বনে গেলে। দেখলে, কয়েন ভ্যানিশ! কোথায় গেল কয়েনটা? হঠাৎ শুনতে পেলে, কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচু ডালে বসানো খেলনা কাকাতুয়াটা খোনা গলায় বলছে, 'টাঁকা এঁখানে। টাঁকা এঁখানে!' দেখতে পেলে, সত্যি-সত্যিই পাখিটার ডানার উপর চকচক করছে কয়েনটা।"

ডাক্তারবাবুর বর্ণনা শুনে অর্ক বলল, "কী মজা, কী মজা!"

গল্প

কথা বলতে-বলতে অনেকটা রাস্তা চলে এসেছিল ওরা। সামনেই একটা ছোট্ট নদী। নদীর নামটাও খুব সুন্দর, টিটুং। দু' পারে রবি শস্যের চাষ হয়েছে। হাল্কা শীতের ছোঁয়ায় কচি-কচি সবুজ পাতার উপর নরম সোনালি রোদের স্পর্শ দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়।

নদী পেরিয়ে হাট। গ্রামের হাট যেমন হয়। কয়েক বিঘে এলাকা নিয়ে বসেছে দোকান-পসারির মেলা। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকও জমেছে প্রচুর। হাটে ঢুকতেই আনাজপাতির পট্টি, মাছ পট্টি। এক পাশে কাপড় পট্টিতে রংবেরঙের শীতের পোশাক নিয়ে বসেছে দোকানিরা। এক জায়গায় অনেকটা এলাকা নিয়ে বসেছে বাঁশ-বেতের কারিগররা। বেত দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে দিচ্ছে ঘর সাজাবার সুন্দর-সুন্দর উপকরণ।

ঘুরে-ঘুরে দেখতে মন্দ লাগছিল না যশরাজের। ডাক্তারবাবু কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "ওই দ্যাখো, ম্যাজিশিয়ান পবনকুমার। তোমরা ম্যাজিক দ্যাখো। আমি চেম্বার সামলে আসছি।"

যশরাজ দেখল, হেলেপড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখানোর সঙ্গে-সঙ্গে মোম দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট সাবানের মতো কিছু জিনিস আর মলম বিক্রি করছে পবনকুমার। হিলহিলে লম্বা চেহারা। চোখে খেলা করছে ধূর্ততা। ছেলেটার পোশাকটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত। চামড়া-লেপটানো কালো রঙের প্যান্ট আর গেঞ্জি। তার উপর চুমকি বসানো লাল জোব্বা। মাথায় চোঙা টুপি। আর নাকের ডগায় সার্কাসের ক্লাউনের মতো লাল বল। সামনের কাঠের টেবিলে ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম, জাদুলাঠি। একটা কর্ডলেস মাইক্রোফোন। এক পাশে স্তূপাকৃতি মলম, মোমের সাবান আর অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, মলম আর ক্রিমগুলো সবই নকল। যেমন, যে ক্রিমটা দেখতে অবিকল নামী কোম্পানির মতো, তার নাম 'বোরোলামা'। তেমনই পেন বামটার নাম 'অমরাঞ্জন'।

পবনকুমার গিলি-গিলি-গে করে ম্যাজিক দেখিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করছে। আর ওর শাগরেদ পটকাই ওই সব দু' নম্বরি জিনিসগুলো চড়া দামে বিক্রি করছে। ছেলেটার অঙ্গভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে হাটুরে লোকজন যেন ছেঁকে ধরেছে ওকে।

ভিড়ের মধ্যে যশরাজ অর্কর হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ শুনতে পেল, কাকাতুয়াটা খোনা গলায় বলছে, "পঁবনকুমার, নঁজর কঁরো। তোঁমার জাঁদুর খেঁলা দেঁখতে শঁহর থেঁকে দঁর্শক এঁসেছে। ডাঁক্তারবাবুর রিঁলেটিভ।"

পবনকুমার আড় চোখে যশরাজকে দেখে নিয়ে কাকাতুয়াকে বলল, "তাই নাকি? তা হলে ওকে ওয়েলকাম জানাও মিস্টার কাকাতুয়া।"

কাকাতুয়া বলল, "ওঁয়েলকাম স্যাঁর। স্বাঁগতম।"

যশরাজের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। অর্কও যেন খুশিতে নেচে উঠল। কাকাতুয়াটা এবার বলল, "ডাঁক্তারের ছেঁলেকে জাঁদু দেঁখাবে নাঁ? ভাঁল ম্যাঁজিক দেঁখালে ইঁনাম দেঁবে।"

পবনকুমার বলল, "বেশ তো! তুমিই দেখাও না একটা ম্যাজিক। চট করে বলে দাওদিকি, খোকাবাবুর প্যান্টের পকেটে যে রুমালটা আছে তার রং কী?"

কাকাতুয়াটা বলল, "লাঁল আঁর সাঁদায় ডোঁরাকাটা!"

অর্কর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সত্যিই তার রুমালের রং সাদা আর লাল ডোরাকাটা। দেখতে-দেখতে বেশ খানিকটা সময় গড়িয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার মিত্র চেম্বার সামলে ফিরে এসে বললেন, "কেমন বুঝলে যশরাজ?"

যশরাজ বলল, "ছেলেটা করিতকর্মা আছে মানতেই হবে। চলো, যাওয়া যাক।"

ওরা ফিরে আসছে, এমন সময় কাকাতুয়াটা আবার বলে উঠল, "জাঁদুকর, ডাঁক্তারবাবুকে জাঁদু দেঁখাবে নাঁ?"

পবনকুমার হি-হি করে হাসতে-হাসতে বলল, "ডাক্তারবাবুকেও ম্যাজিক দেখাতে হবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।"

"কিন্তু আগের ম্যাজিকের ইনাম তো পেলাম না মিঃ কাকাতুয়া?"

"এঁবার দেঁবে। এঁবার দেঁবে। হাঁজার টাঁকার ইঁনাম দেঁবে।"

পবনকুমার চোখ বড়-বড় করে বলল, "হাজার টাকা? তা হলে তো দেখাতেই হয়।" বলে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, মিস্টার কাকাতুয়া আপনাকে ম্যাজিক দেখাতে বলছে। আপনি কি ওর মনে দুঃখ দিয়ে চলে যাবেন?"

ডাক্তারবাবুর হয়ে অর্ক উত্তর দিল, "না-না, যাব না।"

পবনকুমার পেশাদারি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, "বেশ! তা হলে এক কাজ করুন। আপনার আঙুলের আংটিটা খুলে হাতের তালুতে রাখুন।"

ডাক্তার মিত্র একটু ইতস্তত করছিলেন। পবনকুমার এবার নিজেই এগিয়ে এসে ওঁর হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে মুঠোয় ধরিয়ে দিল। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনার মুঠোয় আংটিটা আছে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আছে।"

"কই, সকলকে দেখান তো!"

তাজ্জব! আংটি নেই। কাকাতুয়াটা গাছের ডাল থেকে বলল, "এঁ হেঁ, স্যাঁর নিঁজের আংটি নিঁজেই গাঁয়েব কঁরলেন!"

পবনকুমার ধমক দিল, "আঃ, ডাক্তারবাবুর মতো মানী লোকের সঙ্গে মশকরা করতে নেই। এখনই বলে দাও আংটি কোথায় আছে।"

কাকাতুয়াটা খোনা গলায় বলল, "সঁরি স্যাঁর। ভেঁরি সঁরি। ভঁয় নেঁই। খুঁজে দেঁখুন আংটি আঁপনার পঁকেটে।"

আশ্চর্যের ব্যাপার। পকেট হাতড়াতেই মিলে গেল সেই আংটি। ডাক্তার মিত্র খুশি হয়ে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিলেন। কিন্তু কেন কে জানে, যশরাজের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। এত থাকতে পবনকুমার সেই পুরনো ম্যাজিকটাই দেখাল কেন?

ওরা তিনজন একটা মিষ্টির দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে পদ্মপাতায় করে গরম-গরম জিলিপি খাচ্ছিল। দোকানের সামনেই এক পাশে বিশাল উনুন। তাতে বিশাল কড়াইয়ে রস ফুটছে টগবগ করে। আর মোদকমশাই দু' হাতের তালুতে ছানার ছোট-ছোট গোলক তৈরি করে টপটপ ফেলে দিচ্ছেন তার মধ্যে। যশরাজ লক্ষ করল, ছানার গোলক তৈরির সময় টুক করে একটা নকুলদানা ভরে দিচ্ছেন ছানার ভিতর।

যশরাজ জিজ্ঞেস করল, "দাদা,

রসগোল্লার মধ্যে নকুলদানা ভরার কারণ?"

মোদকমশাই দাঁত বের করে হাসলেন। বললেন, "আজ্ঞে কর্তা, এর ফলে রসগোল্লার সাইজ বড় হয়।"

জিলিপি খেতে-খেতে ডাক্তার মিত্র হঠাৎই বিস্ময়ের গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ! আমার আংটি?"

যশরাজ অবাক হল। বলল, "ওই তো তোমার আঙুলে দিব্যি জ্বলজ্বল করছে আংটিটা।"

"না। এটা সেই আংটিটা নয়। সেটা ছিল হিরের। আর এটা সেটার মতো অবিকল দেখতে কাচ বসানো নকল আংটি।"

যশরাজ বলল, "হিরের আংটি! সে তো অনেক দাম!"

"হ্যাঁ, হাজারপঞ্চাশেক হবে।"

অর্ক বলল, "তার মানে ওই বজ্জাত ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখানোর ফাঁকে বদলে নিয়েছে আংটিটা।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কিন্তু ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! আংটিটা সেই একই রকম পুরনো-পুরনো।"

যশরাজ আংটিটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ওটা ফেরত দিয়ে বলল, "নতুন সোনাকে নিমেষের মধ্যে পুরনো করে দেওয়াটা কোনও কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ও অবিকল একই রকম এটা জোগাড় করল কী করে? অবিশ্যি তোমার আংটির মডেলটা খুবই সাদামাটা। আচ্ছা, ছেলেটা কী কোনও দিন ম্যাজিক দেখানোর নাম করে আংটিটা তোমার কাছ থেকে নিয়েছিল?"

"না। তবে ছেলেটা একদিন পেট ব্যথার জন্য চেম্বারে এসেছিল। সেদিন সৌজন্যবশত ওর ম্যাজিক নিয়ে দু'-চারটে কথাও বলেছিলাম।"

"ব্যস-ব্যস। আর বলতে হবে না। সেদিনই ব্যাটা পরিকল্পনা ছকে ফেলেছিল। অপেক্ষায় ছিল, কবে মওকামতো বদল করে নেবে আংটিটা।" বলতে-বলতে ঝটিতি উঠে পড়ল যশরাজ। বলল, "চলো ডাক্তারবাবু, ব্যাটাকে পাকড়াও করি। আর দেরি করলে পাখি উড়ে যাবে।"

কথা বলতে-বলতে ওরা সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে চলে এল। পবনকুমার ঠিক একই রকম ঢঙে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। তবে ওর শাগরেদকে একটু যেন ব্যস্ত মনে হল। যেন তল্পিতল্পা গোছাচ্ছে। দু'-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ম্যাজিক শেষ করে চম্পট দেবে।

যশরাজের তীক্ষ্ণ নজরে ধরা পড়ল, তাদের অমন করে ফিরে আসতে দেখে পবনকুমারের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া খেলা করে গেল। কিন্তু সামলে নিল তখনই। তারপর কাকাতুয়ার বুলি ছেড়ে নিজের গলায় বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম দাদারা, আজকের মতো ম্যাজিক দেখানো আমার শেষ। আর মাত্র এক ডজন জলছবির কেমিক্যাল আছে। এই ক'টা বিক্রি হয়ে গেলেই চলে যাব। বলুন ভাই, কে নেবেন? পাইকারি দা-আ-ম...।"

পবনকুমারকে ঘিরে জড়ো হওয়া অনেকেই ভিড় ফাঁকা করে দিল। দু'-একজন হাত বাড়িয়ে মলম আর কেমিক্যালও কিনল। ওদিকে পটকাইয়েরও গোছানো কমপ্লিট। এবার কেটে পড়লেই হয়। বক্তৃতা শেষ করে নাকের লাল বলটা খুলে টেবিলের উপর রাখল পবনকুমার। তারপর পরিশ্রান্তভাবে ধপ করে চেয়ারে বসে বলল, "ওঃ, খিদেয় পেট জ্বলছে রে পটকাই। জলদি ময়রার দোকান থেকে জিলিপি আর কচুরি নিয়ে আয়।"

পটকাই প্রভুর আদেশ পালন করতে চলে গেল। যশরাজ এবার দৃঢ় পায়ে পবনকুমারের দিকে এগিয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, "অনেক ম্যাজিক তো দেখানো হল পবনকুমার। আংটিটা এবার ফেরত দাও।"

পবনকুমার প্রথমটায় একটু ভড়কে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, "আংটি! সে কী! আংটি তো আমি তখনই ফেরত দিয়েছি। কী ডাক্তারবাবু, আপনি আংটিটা ফেরত পাননি?"

ডাক্তার মিত্র বলতে যাচ্ছিলেন, 'হ্যাঁ পেয়েছি...' কিন্তু যশরাজ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না, সেই আংটিটা তুমি ফেরত দাওনি। যেটা দিয়েছ সেটা নকল।"

"সে কী! সকলের সামনে ডাক্তারবাবু ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আঙুলে পরলেন। আর এখন বলছেন নকল?" বলতে-বলতে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল পবনকুমার, "আমি বেকার ছেলে। ম্যাজিক দেখিয়ে কেমিক্যাল বেচে পেট চালাই। আমার এমন বদনাম দেবেন না বাবুরা।"

যশরাজ ওর কান্নাকাটিতে কান দিল না। ধমক দিয়ে বলল, "সিনক্রিয়েট করে পার পাবে না পবনকুমার। ভালয়-ভালয় আংটিটা বের করে দাও।"

এর মধ্যেই পটকাই পদ্মপাতার ঠোঙায় কচুরি আর গরম রসগোল্লা নিয়ে এসেছে। বলল, "পওনদা, গরম রসগোল্লা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই..."

পবনকুমার বিতৃষ্ণার সঙ্গে ঠোঙাটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, "আর রসগোল্লা! হায়-হায়, কী কুক্ষণেই ডাক্তারবাবুকে ম্যাজিক দেখাতে গেলাম আজ!"

যশরাজ আবার বলল, "কী হল? আমার কথা কানে গেল না?"

পবনকুমার করুণ গলায় বলল, "স্যার, আমি গরিব হতে পারি কিন্তু চোর নই। যদি আমার মুখের কথায় বিশ্বাস না হয় তো আমাকে সার্চ করুন।"

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুর মোবাইল থেকে থানায় ফোন করা হয়েছিল। পুলিশ এসে গিয়েছে। যশরাজ বলল, "শোনো ভাই, যদি নিজে থেকে আংটিটা বের করে দাও, তা হলে তোমাকে পুলিশের হাতে দেব না। নইলে কিন্তু তোমার শ্রীঘর বাস অনিবার্য।"

পবনকুমার অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমি চুরি করলে তবে তো ওটা বের করব স্যার?"

যশরাজ এবার কিছু বলার আগেই পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ সামন্ত বলে উঠলেন, "বটে! তুমি চুরি করোনি? ঠিক আছে, চুরি করেছ কি না বুঝিয়ে দিচ্ছি।" বলে কনস্টেবল দু'জনকে অর্ডার করলেন, "এই শ্রীপত সিংহ, ওর যা কিছু আছে সার্চ করো তো।"

মিঃ সামন্তর নির্দেশে কনস্টেবল দু'জন একে-একে ওর অবিক্রিত মলমের শিশিগুলো পরীক্ষা করল। ছোট-ছোট মোমের সাবানগুলোও খণ্ড-খণ্ড করে ভাঙল। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে আংটিটা নেই।

মিঃ সামন্ত রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে বললেন, "বটে! আমার

গল্প

সঙ্গে বুদ্ধির খেলা? শ্রীপত সিংহ, তুমি ওর ব্যাগটা সার্চ করো। আর হরমোহন, তুমি ওই কাকাতুয়াটা ভাঙো।"

কনস্টেবল দু'জন মিঃ সামন্তর নির্দেশমতো পবনকুমারের জিনসের ব্যাগটাকে হাতড়ে তছনছ করে ফেলল। তুলো দিয়ে তৈরি কাকাতুয়াটাও বাদ গেল না। কাকাতুয়ার পেটের ভিতর সেট করা রয়েছে ছোট্ট একটা অ্যাম্প্লিফায়ার। ফলে, কর্ডলেস মাইক্রোফোনের সামনে ঠোঁট না নাড়িয়ে কথা বললেই মনে হয়, কাকাতুয়াটা কথা বলছে। বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পুলিশ ইনস্পেক্টর ওর ওই বুদ্ধির বহরকে খাটো করে দেখছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ও জানত পুলিশের খপ্পরে পড়তে হতে পারে। তাই এমন একটা জায়গায় আংটিটা লুকিয়ে রেখেছে, যা পুলিশের নজরে পড়বে না।

অর্কপ্রভ অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা বলবে বলে ছটফট করছিল। যশরাজ সেটা লক্ষ করে বলল, "কী অর্কবাবু, কিছু বলবে মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, যশকাকু। ওই লোকটা নাকের বলটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে টেবিলের নীচে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলল।"

যশরাজ মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। টেবিলের তলার পাটাতনে আটকে রাখল ওটা। কিন্তু ওটা ওর ধোঁকাবাজি। বলের মধ্যে নেই আংটিটা। তবে তুমি দেখতে পার টেবিলের নীচটা।"

অর্ক টেবিলের নীচে গুড়ি মেরে লাল রঙের বলটা বের করে আনল। উত্তেজনায় ওর চোখ চকচক করছে। হাল্কা রবারের বলটার আধাআধি চেরা। বলটার দু' দিকে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই হাঁ-এর মতো ফাঁক হয়ে যায়। সেই ফাঁকের মধ্যেই নাকের ডগাটা ক্লিপের মতো আটকে যায়। যশরাজ বলটাকে ফাঁক করল। কিন্তু না। ওর মধ্যেও নেই আংটিটা।

পবনকুমারের পোশাক থেকে শুরু করে জাদুলাঠি পর্যন্ত প্রতিটা জিনিসই আঁতিপাতি করে খুঁজে পরিশ্রান্ত হয়ে কনস্টেবল দু'জন শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "স্যার, আংটিটা সম্ভবত ব্যাটা গিলে খেয়ে ফেলেছে।"

মিঃ সামন্ত অনেকটা 'ইউরেকা' স্টাইলে বলে উঠলেন, "ইয়েস। ওর পক্ষে এটাই সম্ভব। থানায় নিয়ে গিয়ে দু' ডান্ডা দিলেই... এই, ওকে জিপে তোলো।"

যশরাজ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পবনকুমারের দিকে তাকাল। মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ছেলেটার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। এত মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দিব্যি কেমন অভিনয় করে চলেছে। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই ওর কাল হল। ও ভেবেছিল, ওর চালাকি ধরার ক্ষমতা কারওর নেই।

যশরাজ ওর টেবিলের একেবারে গা ঘেঁসে এগিয়ে গেল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "পবনকুমার, তোমার চেয়েও বড় ম্যাজিশিয়ান এই যশরাজ সেনগুপ্ত। তখনই বলেছিলাম, নিজের থেকে আংটিটা বের করে দাও, তা হলে পুলিশে দেব না। কিন্তু তুমি শুনলে না। নিজের কর্মফল ভোগ করো এখন। এরই নাম অতি চালাকের গলায় দড়ি।" বলে যশরাজ পিছন ফিরে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। ডাক্তার মিত্রকে বলল, "আমার কাজ শেষ।"

যশরাজের কথা শুনে পবনকুমারের চোখে একটা অবিশ্বাসের ছায়া খেলা করে গেল। পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে টেবিলের উপর কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু পেল না। হতাশায় ভেঙে পড়ল হঠাৎই। পুলিশ ওকে টেনে নিয়ে জিপে তুলল।

গাড়িতে বসে ফিরতে-ফিরতে ডাক্তার মিত্র বললেন, "তোমার ব্যাপারস্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না যশরাজ। তুমি কী আমার আংটিটা উদ্ধার করতে পেরেছ?"

যশরাজ হাসল। বলল, "পেরেছি।"

"কোথায় সেটা?"

যশরাজ ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অর্ককে জিজ্ঞেস করল, "অর্কবাবু, তুমি কি অনুমান করতে পেরেছ আংটিটা কোথায়?"

অর্ক মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বলল, "পেরেছি। ওই পদ্মপাতার ঠোঙায় ভর্তি রসগোল্লাগুলোর একটায়।"

"শাবাশ। কী করে বুঝলে তুমি অর্কবাবু?"

অর্ক বলল, "আমি লক্ষ করেছিলাম, সকলের অজান্তে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে তুমি ওই ঠোঙাটা সরিয়ে নিলে।"

"ভেরি গুড।"

ডাক্তার মিত্রর আর তর সইছিল না। বললেন, "এই আটখানা রসগোল্লার মধ্যে কোনটার মধ্যে আছে আংটিটা?"

যশরাজ এবার রসগোল্লাগুলোর মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত ছোট, সেটাকে চাপ দিয়ে দু' টুকরো করে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মৃদু আলোয় ঝকমক করে উঠল হিরের আংটিটা।

ডাক্তার মিত্র বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার। এমন একটা সম্ভাবনার কথা তো আমার মাথাতেও আসেনি।"

যশরাজ বলল, "আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ছেলেটা কিছুতেই আংটিটা ওই সব মলমটলমের মধ্যে রাখবে না। তাই সন্দেহ গিয়ে পড়ে ওই লাল বলটার উপর। কিন্তু ওর শাগরেদ পটকাই যখন জিলিপির অর্ডার সত্ত্বেও রসগোল্লা নিয়ে এল, তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতো ময়রার দোকানে রসগোল্লা তৈরির দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। মোদকমশাই বলেছিলেন, 'ছানার ভিতরে নকুলদানা ভরলে রসগোল্লার সাইজ বড় হয়।' বুঝতে বাকি রইল না, ওর শাগরেদ অন্য এক রসগোল্লার দোকানে আংটিটা মুহূর্তের মধ্যে পাচার করে দিয়েছিল। লক্ষ করো, এই রসগোল্লার আকারটা একটু ছোট, আর রংটাও হলদেটে।"

"কিন্তু মোদকমশাইও তো এটা গাপ করে দিতে পারতেন?"

"তা হয়তো পারতেন। মোদকমশাইয়ের সঙ্গে সম্ভবত ওর সাঁট ছিল। এর আগেও হয়তো পবনকুমারের ম্যাজিকের দরকারে মোদকমশাই অনেকবার রসগোল্লার মধ্যে আংটি কিংবা সন্দেশের মধ্যে নাকছাবি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই এবারেও কোনও সন্দেহ করেননি। ফরমাশ মতো কাজ করে দিয়েছেন।"

"অ্যাঁ!"

ডাক্তার মিত্রর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের মধ্যে একটা বড় সাইজের রসগোল্লা ঢুকিয়ে দিতে-দিতে যশরাজ বলল, "যাই বলো ডাক্তার, গ্রাম দেশের রসগোল্লার স্বাদই আলাদা!"

ছবি: দেবাশিস দেব

শীতের শুরুতে উৎসবে মাতে মনার্ক প্রজাপতিরা

প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি এই প্রজাপতি শীতের ছুটি কাটাতে চলে আসে মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে। আশ্রয় নেয় ফার বা ইউক্যালিপটাস গাছে। লিখেছেন **অয়ন মণ্ডল**

এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে জাহাজের কেবিন বা প্লেনের সিট বুকিং করারও দরকার নেই। ইচ্ছে হলেই যখন-তখন আকাশে ভাসিয়ে দেয় ডানা, কেউবা চলে জলে সাঁতার কেটে আর অন্যরা ডাঙায়। পশু-পাখিদের ভ্রমণের এই রীতি বা মাইগ্রেশন চলে আসছে বহু যুগ ধরে। এদের বলে মাইগ্রেটরি বার্ড বা পরিযায়ী পাখি।

প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বহু পাখি উড়ে চলে আসে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায়। শীতে খাবারের জোগানেও টান পড়ে ওদের। আর তাই দল বেঁধে হাজার-হাজার মাইল উড়ে আসার ঝুঁকি নেয় ওরা। আবার শীত ফুরিয়ে গেলে দল বেঁধে ফিরে যায় নিজেদের দেশে।

গবেষক ফ্রেড আর্কহার্ট ১৯৭৫ সালে খুঁজে পেলেন প্রাণিজগতের এক রহস্যময় মাইগ্রেশন। ১৯৭৬ সালের অগস্ট মাসে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হল ফ্রেড সাহেবের এই আবিষ্কারের কথা।

একদল ছোট্ট প্রজাপতির মাইগ্রেশনের কথা ছিল ফ্রেড সাহেবের এই লেখাটিতে। কমলা ও কালো রঙের এই প্রজাপতিদের নাম হল মনার্ক। উত্তর আমেরিকার বাসিন্দা এরা। শীতের শুরুতে মনার্ক-এর দল কানাডা ও উত্তর-পূর্ব আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে ওদের দীর্ঘ যাত্রা। অবিশ্বাস্য হলেও প্রায় তিন হাজার মাইল উড়ে এই প্রজাপতির দল পৌঁছে যায় মধ্য মেক্সিকোর ফার গাছের জঙ্গলে। আর, রকি পর্বতমালার পশ্চিম দিকের বাসিন্দা যেসব মনার্ক, তারা আশ্রয় নেয় ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের কয়েকটি ইউক্যালিপটাস জঙ্গলে।

এই দীর্ঘ পথে মনার্কদের নানা বিপদে পড়তে হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পথের ক্লান্তিতে বহু মনার্ক মারা যায়। এই সময় দিনে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পথ উড়তে পারে এরা। আর তাই প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ফুলের মধু খেয়ে নিজেদের উড়ে চলার শক্তি জোগাড় করে।

প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মনার্ক শীতের ছুটি কাটাতে চলে আসে মোক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে। এই বিশাল প্রজাপতির দল একসঙ্গে আশ্রয় নেয় ফার বা ইউক্যালিপটাস গাছে। দীর্ঘ পথ উড়ে এসে ক্লান্ত মনার্কের দল একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আশ্রয় নেয় এই গাছগুলোয়। নিজেদের শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য এরা এইভাবে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের প্যাসিফিক গ্রোভ নামের একটি ছোট্ট শহর সারা বছর অপেক্ষা করে বসে থাকে এই প্রজাপতিদের আসার জন্য। শীতের শুরুতে মনার্করা দল বেঁধে আসতে শুরু করলে রীতিমতো উৎসবে মেতে ওঠে সারা শহর। কমলা-কালো রঙের পোশাক পরে ছোটরা প্যারেড করে শহরে। প্রতি বছরই হয় এই উৎসব।

ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের শুরুতে যখন শীত কমে আসে, তখন মনার্কদের ঘরে ফেরার সময়। ফেরার পথে এরা 'মিল্কউইড' নামে একটি বিষাক্ত আগাছায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে যে শুঁয়োপোকা হয়, তারা সেই আগাছাই প্রচুর পরিমাণে খায়। এতে ওদের নিজেদের কোনও ক্ষতি হয় না, বরং শত্রুর হাত থেকে বাঁচার এক অদ্ভুত প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। মনার্কের শরীরের এই বিষের জন্য পাখিরা সাধারণত এদের এড়িয়ে চলে। কোনও পাখি যদি ভুল করে একবারও এদের খেয়ে ফ্যালে, পরে আর কখনও একই ভুল করে না।

ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি হতে মনার্কদের সময় লাগে প্রায় এক মাস। আর পিউপা থেকে 'শিশু' প্রজাপতি হওয়ার পরেই এরাও যোগ দেয় উত্তর দিকে যাওয়ার মাইগ্রেশনে। মনার্ক শিশুরা অর্থাৎ কিনা এদের শুঁয়োপোকারা কেবল মিল্কউইড গাছের পাতাই খায়।

নতুন প্রজন্মের এই মনার্কদের কেউ শিখিয়ে দেয় না কোথায় যেতে হবে। গ্রীষ্ম, এমনকী, পুরো একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি হয় শীতের দীর্ঘ অজানা পথে পাড়ি দেওয়ার জন্য।

কোন অদ্ভুত ক্ষমতায় এই প্রজাপতিরা প্রতি বছর অনেক পথ পেরিয়ে একই জায়গায় ফিরে আসে, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। মেক্সিকো ও ক্যালির্ফোনিয়ার যে কয়েকটি হাতে গোনা জঙ্গলে এরা শীতের ছুটি কাটায়, সেখানে গাছ কেটে ফেলায় জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। আগাছা মারার নানা রাসায়নিকের ব্যবহারে মিল্কউইডের সংখ্যাও কমতির দিকে। ফলে, মনার্কদের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

এভাবেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনার্ক প্রজাপতিরা শরীর গরম রাখে

ফোটো: লেখক

গল্পবলিয়ে ভুলুমামা

সুদীপা দে

তিন দিন হল গরমের ছুটি পড়েছে। কিন্তু সব আনন্দই মাটি হয়ে গেল এই প্রচণ্ড গরমে। স্কুল ছুটি পড়ার আগে অনেক পরিকল্পনা ছিল, এটা করব, ওটা করব! কিন্তু কত আর গাছে চড়া যায়, মাছ ধরা যায়, সাঁতার কাটা যায়! দুপুরে বাড়িতে দু' দণ্ড থাকার উপায় নেই। কারণ, থাকলেই মা বলবেন, "একটা বাংলা কবিতা মুখস্থ কর।" দিদি বলবে, "পিন্টু, অঙ্ক বইটা নিয়ে আয়।" দাদুর কাছে গেলে দাদু গ্রামার বইটা আনতে বলবেন। তারপর বলবেন, "কোথায় প্রিপোজিশনের গন্ডগোল আছে, সেটা দেখে নিবি আয়!"

অগত্যা খেয়েদেয়ে সরে পড়ার তালে আছি। পাশেই নিপুদের বাড়ি। সেখানে আস্তে-আস্তে বিলু আর সান্টুও আসবে। ক্যারম, লুডো, অথবা চোরপুলিশ খেলা হবে। এমনি করে দুপুরটা কাটিয়ে দিতে পারলে আর ভাবনা নেই। আজ রবিবার, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল না। উঠোনে বাবা বসে কাগজ পড়ছেন। আজ নির্ঘাত কিছু একটা হবে। কীভাবে সরে পড়া যায়, তাই ভাবছি। পাঁচিল টপকাব, নাকি খিড়কির দরজা দিয়ে পালাব? কিন্তু যদি শব্দ হয়, তখন কী হবে? পেটভর্তি ভাতের উপর আড়ং ধোলাই খেতে হবে। এই সব যখন ভাবছি, তখন দরজায় টোকা পড়ল। বাবা দরজা খুলতেই এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়ায় মনটা ভরে গেল। যাক বাবা বাঁচলাম, ভুলুমামা এসে উপস্থিত। বললেন, "কী রে পিন্টু, কোথায় গেলি রে? সব চুপচাপ কেন?"

"এই যে মামা," বলতে বলতেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম আমার ঘরে। বললাম, "তোমার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিলাম একেবারে। এত দিন কোথায় ছিলে বলো তো ভুলুমামা?"

"আরে, থাম, থাম। আগে একটু বসি। ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে গেলুম একেবারে। পাখাটা জোর করে দে। আর,

মাকে বলে আয় শরবত করতে," আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না ভুলুমামা।

"মামা, ওদের সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি," বলে ভুলুমামার দিকে তাকাতেই তিনি এমন করে আমার দিকে তাকালেন, যেন কী এমন একটা কথাই না বলে ফেলেছি আমি। ছুটে গিয়ে ফিরে এলাম যখন, তখন ভুলুমামা বালিশে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছেন। চারজন মেঝেতে বসে পড়লাম। আমি, বিলু, নিপু আর সান্টু। ভুলুমামা অবজ্ঞার সুরে বললেন, "অ, এসে গেছিস!"

আমরা চারজনে হাঁ করে বসে আছি। ভুলুমামা সিগারেট শেষ করে পকেট থেকে একটা পানের ডিবে বের করলেন। এক খিলি পান আর জরদা মুখে ফেললেন। সারা ঘর জরদার মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল। ভুলুমামার আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলাম। ভুলুমামাকে একটু না খোঁচালে ওঁর স্টক থেকে আজগুবি গল্প বের করা মুশকিল।

ভুলুমামা আমার আপন মামা নন। মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই এই ভুলুমামা ওরফে ভুজঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মায়ের মুখে শুনেছি, দাদুর একমাত্র ছেলে তিনি। দাদু অগাধ টাকাকড়ি রেখে স্বর্গে যান এবং ভুলুমামা সেই অগাধ সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। শুনেছি, কোনও কাজই নাকি করেন না! অবশ্য এই কথাটার সত্যতা স্বীকার করেন না তিনি। গোবরডাঙায় ভুলুমামাদের তিন পুরুষের বসতবাড়ি। আমরা ছাড়া আর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই, তাই এক-এক সময় আমাদের বাড়িতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়ে। আর তখনই তাঁকে খুঁচিয়ে কয়েকটা আগডুমবাগডুম গল্প বের করা যায়। ভুলুমামাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, তাঁর আসল বয়স কত! তবে পঞ্চাশের আশপাশে তো হবেই। সব সময়ই পাজামা আর পাঞ্জাবি পরেন। তবে, সে পাজামা হবে ঢোলা, আর পাঞ্জাবি হবে হাঁটু পর্যন্ত। কিছুদিন হল, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা নিয়েছেন। মাথার সামনের দিকের চুল বেশ পাতলা হয়ে গিয়েছে। তবু আশপাশের চুল দিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটাকে ঢাকা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। নেশা বলতে পান আর সিগারেট। ভুলুমামাকে চেনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তাঁর নাকের ঠিক মাঝখানে একটা বেশ বড় আঁচিল। ভুলুমামার হাবভাব দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, তাঁর মতো উদ্ভট গল্প কেউ বলতে পারে!

॥ ২ ॥

শুরুটা আমিই করলাম। নিপুকে বাঁ চোখটা টিপে বললাম, "জানিস, আমার এক দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। কত সাহেবকে গুলি করে মেরেছিলেন?"

নিপু, সান্টু অবাক হওয়ার ভান করে আকাশ থেকে পড়ল। এদিকে আড়চোখে ভুলুমামাকে দেখে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু ওঁর যেন কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজের মনেই সিগারেটে সুখটান দিয়ে যাচ্ছেন। বিলু বলল, "আমার এক কাকু মস্ত বড় শিকারি ছিলেন। আস্ত একটা ডাইনোসরকে গুলি করে মেরেছিলেন?"

পাশ থেকে আমি একটু কাশলাম। বিলু বুঝতে পারল যে, সে একটা ভয়ানক গুল দিয়ে বসে আছে। ওর কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সান্টু বলে উঠল, "একবার আমার পিসেমশাই এক গুলিতে একটা গন্ডার মেরে ফেলেছিলেন।"

আমি বললাম, "এ আর এমন কী বড় কথা!"

সান্টু বলল, "জানিস, সেই গুলিটা সাত দিন গণ্ডারের শরীরে ঢুকে ছিল।"

আমরা অবাক চোখে তাকালাম সান্টুর দিকে। আচমকা চোখে পড়ল, ভুলুমামার পাঞ্জাবির বাঁ দিকের বুক পকেটের কাছে কিসের যেন একটা লাল দাগ লেগে রয়েছে। তবে দাগটা বেশ ফিকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভুলুমামা তোমার পাঞ্জাবিতে ও কিসের দাগ লেগেছে গো?"

"রক্ত," ভুলুমামার উত্তর।

"রক্ত!" সমস্বরে বলে উঠলাম আমরা।

"তোমার কোথাও কেটে গিয়েছে নাকি?"

"না।"

"তবে ও কার রক্ত?" অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি আমরা।

"হাতির।"

"হাতির!" বিস্ময়ে হতবাক আমরা।

"হুঁ, হাতির," ভুলুমামা শুরু করলেন, "আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথা। গাঁধীজির নেতৃত্বে তখন ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলছে। আমি তখন সবে কলেজ ছেড়েছি। পাশটাস করে শিকারে হাত পাকাচ্ছি। ছেলেবেলার নেশা আরকি। পাখি মারার বন্দুক দিয়ে বক, ঘুঘু, চড়াই, তিতির, শকুন মারা প্র্যাকটিস করছি। এমন সময় খবরের কাগজে দেখলাম, দলমা পাহাড় থেকে চার-পাঁচটা হাতি নেমে এসে গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে। শস্য নষ্ট করছে, বাড়িঘর ভাঙছে, গাছ উপড়ে ফেলছে, পায়ে চেপটে লোক মারছে। আচমকা রোখ চেপে গেল আমার। বন্দুকটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে, ভেবে সেখানে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে জিম করবেট উপস্থিত! কী করব! মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে আসতে হবে। কারণ, তাঁর মতো অত বড় শিকারি ভারতে আর নেই। একদিন করবেটের গেস্ট হাউসে উপস্থিত হলাম। তাঁকে প্রণাম করলাম। নানা কথা হল। হাতিটার কথা বলতেও ভুললাম না। করবেট বললেন, 'গ্যাংলি তুমিই বরং হাতিটাকে মারো।' কথাটা শুনে আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না তখন। হঠাৎ এই মত পরিবর্তনের কারণ কী, জিজ্ঞেস করলাম জিমদাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'সাতদিন ধরে হাতিগুলোর পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, রোদ, জল, ঝড় উপেক্ষা করে। আচমকা সর্দিগর্মি হয়ে গেল। যেদিন পাগলা হাতিটাকে মারার জন্য গুলি চালালাম, এমন ভয়ংকর একটা হাঁচি হল তখন, কী বলব! গুলিটা গিয়ে লাগল হাতিটার দাঁতে। দাঁতটা ভাঙল, কিন্তু আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই প্রথমবার আমার টিপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তাই ওটাকে আমি আর মারব না,' " এই পর্যন্ত বলে ভুলুমামা থামলেন।

॥ ৩ ॥

ভুলুমামার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই বিশেষ মুহূর্তে কেউ থামে! আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। কিছু বলতেও ভয় করে, পাছে মামা রেগে যান! অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আর-এক খিলি পান মুখে পুরে ভুলুমামা বললেন, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?"

গল্প

"ওই যে জিম করবেট হেসে ফেললেন!" আমি খেই ধরিয়ে দিলাম।

ভুলুমামা আবার শুরু করলেন, "একটা বেশ বড় সুযোগ এসে গেল। তার উপর জিম করবেট আমার উপর বিশেষ নজর দিয়েছেন, কিছু একটা না করলে সম্মান থাকে না। অগত্যা পাঁজিতে একটা ভাল দিন দেখে কাঁধে পাখি মারার বন্দুকটা নিয়ে রওনা হলাম। ছোট-ছোট টিলা, পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি একা। তখনও বুঝতে পারিনি যে, এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। সে যাই হোক, ঘন্টাদুয়েক হাঁটার পর হাতির পালটা নজরে পড়ল। সাত-আটটা হাতির একটা দল, এর মধ্যে আবার দু'টো হস্তিশাবকও আছে। সামনে হেঁটে চলেছে দাঁতভাঙা পাগলা দলপতি। আমি তখন চুপিসারে অনুসরণ করছি ওদের। এদিকে রোদ খুব চড়া হয়ে উঠেছে। এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি তোদের। তখন ওখানে এক ব্রিটিশ নীলকর সাহেব থাকতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পিসতুতো ভাই ওয়ারেন পেস্টিংস। চাষিদের উপর অত্যাচার, বিপ্লবীদের খুন করা ছিল ওঁর প্রতিদিনের রুটিন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, হাতিগুলো ওখানেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তৈরি হলাম। দাঁতভাঙা দলপতিকে লক্ষ্য করে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুড়লাম।" ভুলুমামা আবার থামলেন।

"কী হল ভুলুমামা, থামলে কেন?" বিরক্তি প্রকাশ করলাম আমি।

"আগে মাকে গিয়ে বলে আয় চায়ের জল চাপাতে।" ভুলুমামার আদেশ শিরোধার্য। অগত্যা দৌড়ে বলতে গেলাম।

ভুলুমামা শুরু করলেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, গুলি তো ছুড়লাম, কিন্তু ও দিকে আবার ওয়ারেন পেস্টিংস গিয়েছেন মাছ ধরতে। আমার থেকে হাতিগুলো মাইলখানেক দূরে ছিল। আবার হাতিদের থেকে মাইলটাক দূরে একটা দিঘি ছিল। সেই দিঘিতে তখন পেস্টিংস কড, ম্যাকারেল হেরিং, ভ্যাঙ্কুভার, হ্যালিবাট মাছ ধরতে ব্যস্ত। যাই হোক, গুলি তো ছুড়লাম, সেটা নিমেষের মধ্যে হাতিটার কানের ভিতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেল।" বলতে বলতেই পাঞ্জাবির পকেটটা উঁচু করে বললেন, "এই হল গিয়ে হাতিটার কানের রক্ত। হঠাৎই শুনতে পেলাম একটা মানুষের গোঙানির শব্দ। কান খাড়া করে শুনে, দু' মাইল দৌড়ে গিয়ে সাহেবের দেখা পেলুম। সাহেব তখন মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। আর গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না যে, এ আমারই কীর্তি। সাহেব হাত সরাতে দেখলুম, আমার ছোড়া গুলিতে তাঁর সামনের পাটির নীচের একটা দাঁত খসে পড়েছে। সাহেব তখন চুরুট খাচ্ছিলেন। অগত্যা এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল। হাতিও ঘুমোল, আবার সাহেবও ভারত ছেড়ে পাততাড়ি গোটালেন।"

"কেন, কিসের জন্য সাহেব দেশ ছাড়লেন?" নিপু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল।

"আরে গর্দভ, এটাও বুঝিস না যে, ওঁদের প্রেস্টিজ খুব। আমি যে ওতেই ঘা দিয়েছিলাম। পরাধীন ভারতের কে না কে এক ছেলের হাতে এমনভাবে অপদস্ত হয়ে সাহেব একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। তড়িঘড়ি একটা সোনার দাঁত লাগিয়ে তবে পেস্টিংস শান্ত হলেন। সাহেবের কোথাও যদি কোনও ছবি দেখিস, তবে দেখবি, ভাঙা দাঁতের জায়গায় একটা সোনার দাঁত চকচক করছে।" ভুলুমামা এক ঢোকে চা-টুকু শেষ করে উঠে পড়লেন।

॥ ৪ ॥

"কিন্তু মামা, শেষে কী হল সেটাই তো বললে না?" বিলুর খোঁচা।

"শেষে আর কী হবে। দলপতিকে ঘায়েল দেখে দলের অন্য সব হাতিরা মানে-মানে সরে পড়ল। বনদপ্তর ঘুমন্ত দলপতিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এল। আর দলমার লোকেরা আমার নামে ধন্য-ধন্য করতে লাগল।"

"আর হাতির দাঁতটা কী হল, যেটা করবেট ভেঙে দিয়েছিলেন?" সান্টুর কৌতূহল।

"আমিই সেটা ফেভিকল দিয়ে আবার হাতির ভাঙা বাদবাকি দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। ওকে জঙ্গলে রেখে আসার আগেই।" ভুলুমামা থামলেন।

"মামা, আমার দু'টো প্রশ্ন আছে।" গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন রকল নিপু।

"বল।"

"আচ্ছা, পাখি মারা বন্দুক দিয়ে কী হাতি মারা যায়? আর যদিও বা হাতি মারা যায়, সেই বন্দুক দিয়ে কী ঘুমপাড়ানি ওষুধমাখা গুলি বের হয়।"

"তোরা বুঝি বন্দুকের খুটিনাটি সব জানিস?" খেঁকিয়ে উঠলেন ভুলুমামা।

"তা হলে মামা তুমি নিশ্চয়ই তাম্রপত্র পেয়েছিলে?" আমাদের হয়ে বিলুই প্রশ্নটা ছুড়ে দিল ভুলুমামার দিকে।

"খেপেছিস! আরে আমি কী আর সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলাম। আমি তো নকল রে। এমন কত আসল স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে আছেন, যাঁরা প্রাপ্য সম্মানটুকু, এমন কী দু' বেলা পেটভরে খেতে পর্যন্ত পান না। আর আমি তো কোন ছার। গুলিটা তো কাকতালীয়ভাবে লেগে গিয়েছিল। তা ছাড়া আমি একেবারে পেস্টিংসকে তো আর মেরে ফেলিনি।"

"কিন্তু ভুলুমামা, আমার একটা জায়গায় খচখচ করছে। সেটা হল, এর প্রমাণ তো তোমার কাছে নেই।" বিলুর মনের সন্দেহ প্রকাশিত হল।

"আগেই বুঝেছি যে, তোরা আমায় বিশ্বাস করিস না। তাই তো সেদিনের পাঞ্জাবিটাই পরে এসেছি। তা ছাড়া নিজেরাই তো দেখলি, হাতির রক্ত লেগে রয়েছে। আর..." কথা বলতে বলতেই ভুলুমামা ডান পকেট থেকে একটা দাঁত বের করে আমাদের দেখিয়ে বললেন, "আর এটা হল ওয়ারেন পেস্টিংসের দাঁত। ওঁর থেকে চেয়ে রেখে দিয়েছিলাম। একটা স্মৃতি হিসেবে।" কথাটা শেষ করেই ভুলুমামা পিঠটান দিলেন। তাঁর টিকিটিও আর খুঁজে পেলাম না আমরা।

আমাদের আড্ডাটা ভেঙে গেল। নিপু যেতে-যেতে বলল, "যত্ত সব আলতু ফালতু গল্প। কী না কী বললেন বল তো। এদিকে বললেন, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। সেটাই যদি হবে, তবে ভারত ছাড়ো-ই বা আসছে কোথায়, আর নীলকর সাহেবই বা আসছে কোথায়...।" বুঝলাম ও বেশ চটে গিয়েছে।

যাই হোক, পরে অবশ্য মায়ের কাছ থেকে জেনে ছিলাম যে, ওই দাঁতটা হল আমার মামাতো ভাই ফুঁচুর দুধের দাঁত।

ছবি: দেবব্রত সরকার

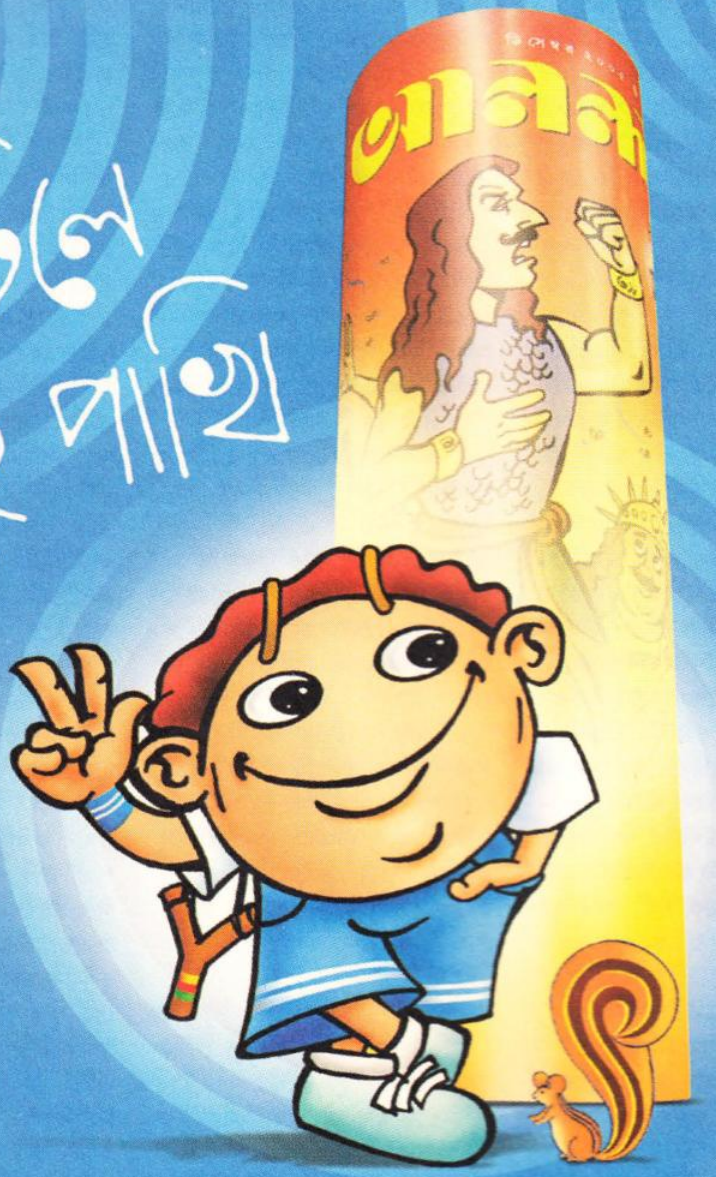

আনন্দমেলা
CLUB
হিজিবিজি
আনন্দমেলা
দেদার দস্যিপনা, জমাটি মজা।
এক ঢিলে
দুই পাখি
আনন্দমেলা নাও,
আনন্দমেলা ক্লাব
মেম্বারশিপ পাও !*
৬ মাসের আনন্দমেলা + ৬ মাসের আনন্দমেলা ক্লাব মেম্বারশিপ = ৯০ টাকা
১ বছরের আনন্দমেলা + ১ বছরের আনন্দমেল ক্লাব মেম্বারশিপ = ১৭০ টাকা
২ বছরের আনন্দমেলা + ২ বছরের আনন্দমেলা ক্লাব মেম্বারশিপ = ৩৩০ টাকা
* পেমেন্ট করতে হবে কলকাতায় প্রদেয় ABP Pvt. Ltd.-এর নামে ডিমান্ড ড্রাফটে।
চেক বা ক্যাশ গ্রহণ করা হবে না।
এই অফার শুধুমাত্র কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জন্য।
আরও জানতে ফোন কর (০৩৩)২৪৫৪৬২১২ অথবা চিঠি লেখ এই ঠিকানায়
'আনন্দমেলা' এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা - ১, ই-মেল কর anandamela@yahoo.co.in
BATES ENTERPRISE 2021

ডাকাতের চিঠি

রজত ঘোষ

গত বুধবার সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

ঘটনার সূত্রপাত দু' দিন আগে অর্থাৎ সোমবার। ব্যাপারটা দু' দিন ধরে ধামাচাপা পড়েছিল চিন্টুর জিওমেট্রিক্যাল বক্সের মধ্যে। ওর খেয়ালই ছিল না। সন্ধেবেলা তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি খেতে-খেতে হঠাৎ খেয়াল পড়ল, কে নাকি দু' দিন আগে রাস্তায় ওকে একটি চিঠি দিয়েছিল জেঠুকে দেওয়ার জন্য। সাদা খামে ভরা সেই চিঠি জেঠুকে দিতে বেমালুম ও ভুলেই গিয়েছে।

চিন্টু আমার খুড়তুতো ভাই। আমার চেয়ে দু' বছরের ছোট। কেয়ারলেস স্বভাবের জন্য এমনিতেই ওর বদনাম আছে। জানা অঙ্ক ভুল করে আসে পরীক্ষার খাতায়। চিঠি ভুলে যাওয়ার কথা শুনে কাকিমা যথারীতি ধমক দিয়ে বললেন, "এই করেই তো রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে প্রতি বছর।"

সারাদিন ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির জন্য বুধবার বাবা আর জেঠু বিকেল-বিকেল বাড়ি ফিরেছিলেন। এমনিতে কাকু একটু রাত্তির করেই বাড়ি ফেরেন প্রতি দিন। কিন্তু সেদিন কাকুও সন্ধের আগেই ফিরলেন। বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধেবেলা তাই মুড়ি, আলুবড়া, বেগুনি দিয়ে জমিয়ে জলখাবার চলছিল বসার ঘরে। জেঠু, বাবা, কাকু, দাদাভাই, আমি, চিন্টু, মুন্নি সকলেই কাচুমকুচুম করে মুড়ি-

তেলেভাজা চিবোচ্ছিলাম। শুধু দিদিভাই খাচ্ছিল শুকনো মুড়ি। ডায়েটিং করছে বলে ও তেলেভাজা খায় না। এই সময় চিন্টুর হঠাৎ খেয়াল পড়ল সেই চিঠির কথা।

খেয়াল পড়তেই ও এক ছুটে জিওমেট্রিক্যাল বক্সসহ চিঠিটাকে এনে হাজির করল। জিওমেট্রিক্যাল বক্সটাকে আনার কারণ, ঢাকনার সঙ্গে খামে ভরা সেই চিঠি আটকে যাওয়ায় চিন্টুর পক্ষে তা খোলা সম্ভব হয়নি।

দাদাভাই ঢাকনা খুলে চিঠিটা জেঠুর হাতে এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, "চিঠির তো পিণ্ডি চটকে দিয়েছিস রে চিন্টু।"

মুন্নি বসে ছিল আমার পাশে। যত না খাচ্ছে তার দ্বিগুণ ছড়াচ্ছে। আমি ওর মাথায় একটা গাট্টা মেরে মুড়ি ছড়ানোর জন্য শাসন করতে যাওয়ায়, ও আমার হাফপ্যান্ট পরা খালি পা'টা কটাস করে চিমটি কেটে দিল। তা দেখে চিন্টুর হ্যা-হ্যা করে সে কী হাসি। কে বলবে কাকিমার কাছে একটু আগেই ও বকুনি খেয়েছে? একদম নাক-কান কাটা!

বাবা আর কাকু চিঠির ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেননি। কী একটা অফিসের কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। জেঠুর দিকে আমারই প্রথম চোখ গেল। এ কী অবস্থা জেঠুর! চোখ দু'টো কপালে উঠে যাওয়ার জোগাড়! এই ঠান্ডা ওয়েদারেও দরদর করে ঘামছেন। চিন্টুর দেওয়া সেই একফালি কাগজ হাতের মধ্যে কাঁপছে থরথর করে। মিথ্যে বলব না, সেই মুহূর্তে জেঠুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, তিনি নির্ঘাত কারেন্টে শক খেয়েছেন। পাশে বসা দিদিভাই মনে হয় আমার আগেই জেঠুকে দেখে ফেলেছিল। দিদিভাই চিৎকার করে উঠল, "বাবা, কী হয়েছে তোমার?"

দিদিভাইয়ের চিৎকার শুনে প্রথমে সকলে হকচকিয়ে গিয়েছিল, আমি অবশ্য ততটা ভয় পাইনি। ভয় পেয়ে মুন্নি আমার গা ঘেঁষে এগিয়ে এল অনেকটা। চিন্টুরও কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। রান্নাঘর থেকে মা, জেঠিমা, কাকিমা সকলেই ছুটে এলেন। কী ব্যাপার কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। এর মধ্যে বাবা অবশ্য জেঠুর হাত থেকে সেই কাগজের টুকরোটি নিয়েছেন। ডান দিক, বাঁ দিক দু'বার চোখ বোলানোর পর যথারীতি তাঁর চোয়ালও ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল। কাগজের টুকরো হাত বদল হয়ে চলে গেল কাকুর হাতে। তাঁরও একই প্রতিক্রিয়া।

আমরা সকলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি তিনজনের দিকে। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ওই এক চিলতে কাগজে এমন কী লেখা থাকতে পারে, যা তিনজনকেই একদম থ' বানিয়ে দিল!

চিন্টু হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সমস্যা যে জটিল তা ও ভাল মতোই আন্দাজ করে ফেলেছে। সমস্যাটি যেহেতু ও বয়ে এনেছে, তাই আমি নিশ্চিত, এবার ওর পিঠে উত্তম-মধ্যম পড়বে। সকলের দৃষ্টি একযোগে ঘুরে গেল চিন্টুর দিকে। কাকু থমথমে মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, "এ চিঠি তোকে কে দিয়েছে?"

কাঁদো-কাঁদো গলায় চিন্টু বলল, "আমি চিনি না লোকটাকে। আগে কখনও দেখিনি।"

কাকিমা আবার ধমক দিলেন, "তোকে কতবার বলেছি, অচেনা কোনও লোকজনের কাছ থেকে কিছু নিবি না।"

চিঠি ততক্ষণে ঘরের সকলের হাতেই গিয়েছে একবার করে। শুধু আমি, মুন্নি আর চিন্টু বাদে। মুন্নি অবশ্য পেলেও কিছু বুঝতে পারত না। অক্ষর পরিচয় হলেও ও বানান করে পড়তে শেখেনি এখনও।

দিদিভাই যখন পড়ছিল, আমি উঁকি মেরে দেখেছি কাগজটা। এটাকে মোটেই চিঠি বলা যায় না। আমাদের ক্লাসে শিখিয়েছে, চিঠি লিখতে গেলে 'ডিয়ার' অথবা 'স্যার' দিয়ে শুরু করতে হয় এবং শেষে 'ইওরস এভার' বা 'ইওরস ওবিডিয়েন্টলি' লিখে তার তলায় নিজের নাম লিখতে হয়। সেসব কিছুই নেই এখানে। এটাকে বরং একটা চিরকুট বলা যেতে পারে। যাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে:

'সামনের বুধবার আমি আমার দলবল নিয়ে রাত বারোটার সময় আপনার বাড়িতে যাব। টাকাপয়শা, গয়নাগাটি যা আছে গুছিয়ে রাখবেন। বেশী চালাকী করলে ফল ভাল হবে না। আর-একটা কথা, পুলিশের কাছে খবর গেলে কিন্তু হীতে-বীপরিত হতে পারে, সাবধান।'

দিদিভাই পড়ে বলল, "এ তো দেখছি বানানে পিএইচ ডি করেছে।"

কাকু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দ্যাখ মিঠু, এটা মজার সময় নয়। চোর-ডাকাতদের চিঠিতে কেউ বানান দেখে না।"

এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকল, এটা কোনও চোর বা ডাকাত দলের পাঠানো চিরকুট। নীচে নাম না লিখলে বুঝব কী করে? চোর-ডাকাতের কথা শুনে আমারও এবার বেশ ভয় করছে। আড় চোখে দেখলাম, চিন্টু কাঁদছে বলে মুন্নি ওকে জিভ বের করে ভেংচি দেখাচ্ছে।

বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে-করতে বললেন, "আমার মনে হয়, ইমিডিয়েট পুলিশকে ইনফর্ম করা দরকার।"

জেঠিমা সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বড় করে বললেন, "তুমি পাগল হলে ঠাকুরপো? শেষ লাইনটা পড়লে না কী লিখেছে?"

কাকু চিন্টুকে এক রামধমক দিয়ে বললেন, "বোকাটা দিনদিন গোবর গণেশ হচ্ছে! সোমবার দিয়েছে আর আজ ওর মনে পড়ল? আগে জানতে পারলে তবু কিছু করা যেত। এখন আর...। ইচ্ছে করছে তোকে...।"

চিন্টু আরও জোরে কেঁদে উঠল। দিদিভাই ওকে কোলে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করছিল।

ঘড়িতে তখন আটটা বাজে। আঙুলের গাঁট গুনে হিসেব করলাম, বারোটা বাজতে আর চার ঘণ্টা মাত্র বাকি। ডাকাতদের কথামতো আমাদের তো তা হলে টাকাপয়সা, গয়নাগাটি গোছগাছ করতে শুরু করে দেওয়া উচিত। ওরা এসে যদি দ্যাখে, আমরা ওদের কথা শুনিনি, তা হলে কী যে হবে কে জানে! কিছুদিন আগে একটা গল্পে পড়েছি, ডাকাতদের হাতে বল্লম, ভোজালি, মশাল আরও কত কী সব থাকে। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল।

এর মধ্যে মুন্নি কখন উঠে গিয়ে দিদিভাইয়ের গা ঘেঁষে বসেছে। চিন্টু একনাগাড়ে ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে বলে ওরও মন খারাপ।

শুধু দাদাভাইয়ের মধ্যে কোনও হেলদোল দেখলাম না। আগের মতোই তেলেভাজা, মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি, দাদাভাই খুব সাহসী। দোতলার একটা ঘরে ও একা শোয়। ইদানীং ক্লাবে ডাম্বেল, বার্বেল নিয়ে এক্সারসাইজও করে। ড্রেসিং টেবিলের

গল্প

সামনে মাঝে-মাঝে যখন হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে দাঁড়ায়, দেখে আমরা হাঁ হয়ে যাই। ইয়া হাতের গুলি!

দাদাভাইকে দেখে মনে সাহস পেলাম বটে, কিন্তু একটা কথা মনে খিচখিচ করেই যাচ্ছে। ওরা লিখেছে দলবল নিয়ে আসবে। দাদাভাই একা কি অত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে?

জেঠু হঠাৎ বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের বন্দুকটা একবার নিয়ে আয় তো নরেন। হাতটা ঠিক আছে কি না দেখি।"

সত্যিই তো। আমাদের বাড়িতেও যে একটা বন্দুক আছে, একথা কারওর এতক্ষণ মনেই পড়েনি। ঠাকুরঘরে লম্বা শোকেসটার মধ্যে রাখা আছে। দিদিভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, ওটা নাকি গাদাবন্দুক। তবে আর সমস্যা কী? চিন্তার কোনও কারণই রইল না। ডাকাতগুলো এলেই সব ক'টাকে গুলি করে মেরে ফেলা যাবে।

চিন্টুকে দেখলাম ফ্যাঁসফ্যাঁসানি বন্ধ করে বড়-বড় চোখে জেঠুর দিকে তাকিয়ে আছে। জেঠুর হাতে বন্দুক, এ ছবি ও মনে হয় ঠিক কল্পনা করতে পারছে না। জেঠুর চেহারা মোটেই র‍্যাম্বো বা জেম্‌স বন্ডের মতো নয়। এমনকী ফেলুদার মতো লম্বাও নন জেঠু। জটায়ুর সঙ্গে মিললেও মিলতে পারে কিছুটা। তবে জেঠুর মাথায় টাক নেই। বাঁ দিকে সিঁথি-কাটা চুল পাট করে আঁচড়ানো।

বাবা আমতা-আমতা করে বললেন, "ওটা আর কোনও কাজে লাগবে না দাদা।"

"কেন?"

"লাইসেন্সটা ইঁদুরে ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে।"

কাকু মুখ গোমড়া করে বললেন, "তা হলে আর ওটাকে বাড়িতে রেখে কী লাভ? লোহাওলাকে বেচে দিও সামনের মাসে।"

দিদিভাইয়ের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গোয়েন্দা গল্প পড়ে-পড়ে দিদিভাইয়ের মাথাটা খুলেছে দারুণ।

দাদাভাইয়ের আঁকার হাত ভাল। দিদিভাই তাই ওকে বলল, "দাদাভাই, তুই এক কাজ কর। চিন্টুর কাছে ডেসক্রিপশন শুনে, যে লোকটা ওকে চিঠিটা দিয়েছে, তার একটা স্কেচ করার চেষ্টা কর। লোকটাকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায়, তা হলে..."

দাদাভাই এককথায় রাজি হয়ে গেল। এরকম বুদ্ধি, চিন্টু আর মুন্নির কথা ছেড়েই দিলাম, আমার মাথাতেও আসত না কোনও দিন। সত্যি, দিদিভাইয়ের কী বুদ্ধি! তখনই ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে আমিও দিদিভাইয়ের মতো গোয়েন্দা গল্প পড়ব।

ড্রয়িং খাতার কথা বলতেই চিন্টু আর মুন্নি দৌড় লাগাল। কে আগে আনতে পারে, তার যেন কম্পিটিশন হচ্ছে। জেঠু, বাবা, কাকু, কেউ কোনও কথা বললেন না। দিদিভাইয়ের আইডিয়াটা ওদেরও মনে হয় মন্দ লাগেনি। মা, কাকিমাও এগিয়ে এলেন। জেঠিমা গিয়ে বসলেন খাটের উপর। ঠিক হল, মুন্নির খাতাতেই স্কেচ করা হবে। কারণ, ও-ই আগে এনেছে ড্রয়িং খাতাটা।

চিন্টু দিনদিন সত্যিই বেশ মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে। দাদাভাই ওকে ডেসক্রিপশন দিতে বলায়, ও প্রথমেই বলল, "লোকটা বেশ লম্বামতো।"

দাদাভাই খেঁকিয়ে উঠল, "ওরে বুদ্ধু, মুখের ডেসক্রিপশন দে। লম্বা, বেঁটে জেনে আমি কী করব?"

জেঠু সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন, "না মন্টু, হাইটটাও একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর। ওটাও জানা দরকার।"

চিন্টুর কথা অনুযায়ী লোকটার মুখটা শসার মতো লম্বা। চুলগুলো খোঁচা-খোঁচা। নাকটা চ্যাপটা, চোখগুলো গর্তের মধ্যে ঢোকা আর কানগুলো কেমন, ওর মনে নেই।

দাদাভাইয়ের খচাখচ পেনসিলের খোঁচায় ভরে গেল ড্রয়িং পেপার। আমরা সকলে ঝুঁকে তাকিয়ে আছি সেদিকে। জেঠিমাও মাথা বাড়িয়ে দেখছেন খাটের উপর থেকে। সাদা কাগজে ক্রমশ ফুটে উঠছে একটা মুখের ছবি। দাদাভাই কী সুন্দর ছবি আঁকে। আমি যে কবে ওর মতো আঁকতে শিখব!

দিদিভাই হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "এটা তুই কার মুখ আঁকলি? এ তো আমাদের দুধওলা জগাদা।"

আমারও অনেকক্ষণ থেকে মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছিল। দিদিভাই ঠিকই বলেছে। একটা গোঁফ করে দিলে এটা একদম জগাদা হয়ে যাবে।

দাদাভাই রেগে গিয়ে বলল, "আমি কী করব, চিন্টু যেরকম বলেছে সেরকমই তো আঁকলাম।"

চিন্টু জগাদাকে চেনে। ও বলল, "চিঠিটা জগাদা ওকে দেয়নি।"

দাদাভাই আঁকা থামিয়ে দিল। ওর এতক্ষণের পরিশ্রমটাই বেকার। কাকু বললেন, "আমার মনে হয়, মেজদাই ঠিক কথা বলেছে। পুলিশকে জানানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। ফালতু সময় নষ্ট করা হচ্ছে।"

কাকিমা চোখ বড় করে বললেন, "পুলিশকে জানালে সত্যিই যদি হিতে বিপরীত হয়?"

বাবা বললেন, "সেই ভয়ে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না? পুলিশকে জানালে তবু একটা প্রোটেকশন পাওয়া যেতে পারে।"

এর মধ্যে আমার কানে এসেছে, মুন্নি চিন্টুকে ফিসফিস করে বলছে, "ছোটদা, লুডো খেলবি?"

ঠিক হল, পুলিশকেই খবর দেওয়া হবে। সেইমতো টেলিফোন ডিরেকটরি থেকে বহু খোঁজাখুঁজি করে থানার নম্বরটা বের করা হল। জেঠুকে এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে দেখলাম না। মনে হচ্ছে উনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যা হওয়ার হোক এরকম একটা ভাব। টেলিফোন ডায়াল করতে গিয়ে বাবার মুখ ব্যাজার হয়ে উঠল। দুম করে রিসিভারটা নামিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, "টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে এই টেলিফোনটাকে। কাজের সময় কোনও দিন ঠিক থাকে না। ডায়ালটোন অফ।"

বেশি বৃষ্টি হলে বা বিদ্যুৎ চমকালে আমাদের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রায়ই বসে যায়। আজ সারাদিন যা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে ডায়ালটোন না থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দিদিভাই কপাল কুঁচকে বলল, "আচ্ছা, ওই শয়তানগুলো আমাদের লাইনটা কেটে দেয়নি তো?"

দিদিভাইয়ের মাথায় আসেও বটে! এত লোক আছে ঘরের মধ্যে, কারওর মাথায় এল না কথাটা। গোয়েন্দা গল্প পড়লে যে বুদ্ধি খোলে, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিদিভাই। কত গভীরভাবে ভাবতে পারে সবকিছু। আমার ব্রেনটা কেন যে

দিদিভাইয়ের মতো শার্প নয়।

বাবা ঘাড় নেড়ে বললেন, "হতেও পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

মা শুকনো মুখ করে বললেন, "তা হলে এখন উপায়?"

কেউ কোনও উত্তর দিলেন না। সকলেই চুপচাপ। বাবা আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করেছেন। কিছু একটা উপায় তো বের করতেই হবে। দিদিভাইকেও দেখে মনে হচ্ছে, গভীর কিছু চিন্তা করছে। আমারও ইচ্ছে করছে কিছু একটা চিন্তা করি, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না। চিন্টু আর মুন্নির তো কোনও

মাথাব্যথাই নেই। ড্রয়িং খাতায় চুটিয়ে কাটাকুটি খেলছে দু'জনে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটার ঘণ্টা বাজতে সকলেই চমকে উঠলাম। এতক্ষণ কেউ খেয়ালই করিনি ঘড়িটার দিকে। দশটা তো বেজেই গেল। আর মোটে দু' ঘণ্টা বাকি! সে আর কতক্ষণ? দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। সকলে যেন একটু বেশিই বিচলিত হয়ে উঠেছে এবার। সময় চলে যাচ্ছে, অথচ কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে হবে ভগবান জানেন!

দাদাভাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "ক্লাবের ছেলেদের গিয়ে বলি একবার। দরকার হলে সবাই মিলে রুখে দাঁড়াব ওদের বিরুদ্ধে। রাতদুপুরে যদি অ্যাকশন হয় হোক! তবু ওদের সহজে ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না।"

আমি দাদাভাইয়ের মুখ থেকে ঠিক এরকমই একটা বিস্ফোরক মন্তব্য আশা করেছিলাম। এই না হলে দাদাভাই! ও যদি রাগে একবার, পাঁচটা লোককে একাই শায়েস্তা করতে পারে। তার সঙ্গে কালুদা, মদনদা, বাবাইদারা যদি থাকে তো কথাই নেই। ডাকাতদল পালাবার পথ পাবে না। বেশ বুঝতে পারছি, দাদাভাইয়ের কথা শুনে আমার মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা হচ্ছে। আর একটুও ভয় করছে না। এখন মা যদি না আটকান, আমিও লড়াই করব ডাকাতদের সঙ্গে।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, "বোকার মতো কথা বলিস না মন্টু। আজকালকার ডাকাতরা কেউ খালি হাতে আসে না। ওদের কাছে আর্মস থাকে। ওদের সঙ্গে লড়াই করা অত সহজ নয়। ওরা পাঁচ জন, পঞ্চাশ জনের সমান।"

আর্মস মানে কী, তা আমার জানা ছিল না। দিদিভাইকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম। দিদিভাই অবাক হয়ে বলল, "এ কী অবস্থা রে তোর পিন্টু? আর্মস মানেও জানিস না? তোর তো দেখছি 'স্টক অফ ওয়ার্ড' খুব পুওর! আর্মস মানে হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। মনে থাকবে?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। এটাও অবশ্য ভাববার বিষয়। আমাদের কাছে তো কোনও অস্ত্রশস্ত্রই নেই। খালি হাতে ওদের সঙ্গে লড়াই করব কী করে?

ঠিক এই সময় গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর আওয়াজ হল। সকলেই কান খাড়া করে শুনলাম। পরক্ষণেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ভয়ে বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল।

জেঠু চেয়ার ছেড়ে উঠে থরথর করে কাঁপছেন। বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন দরজার দিকে। কাকু উঠে দাঁড়িয়েছেন বাবার পাশে। আমাদের বুঝতে আর বাকি রইল না, ওরা এসে গিয়েছে। দিদিভাই ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ঘড়িটা স্লো নাকি! ডাকাতরা আগে এসেছে, এই নিয়ে ও মনে হয় সংশয়ে পড়েছে।

দরজার ওপার থেকে এবার অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "দয়া করে দরজাটা একবার খুলুন। আমরা থানা থেকে আসছি।"

বাবা গিয়ে খুলে দিলেন দরজাটা। দু'জন গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন খাকি পোশাক পরা এক দীর্ঘদেহী পুলিশ অফিসার। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "ভয় পাবেন না। আমি থানার মেজোবাবু।"

গার্ড দু'জনের কাঁধের উপর থেকে বন্দুকের নল দু'টো উঁকি মারছে। মেজোবাবুর কোমরের মোটা বেল্ট নেমে এসেছে ভুঁড়ির নীচে। তাতে বাদুড়-ঝোলা অবস্থায় ব্রাউন কালারের খাপে ভরা রিভলভার। কলেজে এন সি সি করার সময় দাদাভাই এরকম খাকি পোশাক পরত। টুপিতে আবার একটা লাল রঙের পালক গোঁজা থাকত।

মেজোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে হরেনবাবু কে?"

জেঠু আমতা-আমতা করে বললেন, "আমার নাম হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কেন বলুন তো?"

মেজোবাবু বললেন, "গত সোমবার আপনার নামে একটা উটকো চিঠি পাঠানো হয়েছিল, যাতে অজস্র বানান ভুল। অ্যাম আই রাইট?"

জেঠু বড়-বড় চোখ করে বললেন, "হাঁ।"

মেজোবাবু বললেন, "আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। যে দলটি এই চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই দলটি আজ সন্ধেবেলা ধরা পড়ে গিয়েছে।"

শুনে আমাদের ধড়ে প্রাণ এল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সবাই। জেঠুর কপালের ভাঁজগুলো মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কাকুর মুখে হাসি-হাসি ভাব। জেঠিমা জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে দেওয়ালে মা-কালীর দিকে তাকালেন। তাঁর দেখাদেখি মা-কাকিমাও।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "গ্যাংটা কি খুব ফিউরিয়াস ছিল?"

মেজোবাবু তুড়ি মেরে বললেন, "দুর মশাই, পাতি ছিঁচকে চোর। বানান দেখে বুঝতে পারলেন না? একটু ভাল করে দেখলে বুঝতে পারতেন, ওটা একটা জেরক্স কপি। কাউকে দিয়ে লিখিয়ে বেশ কয়েকটা কপি করে নিয়েছে। নিজেরা যে দু' কলম লিখবে, সে মুরোদও নেই।"

মেজোবাবু বেশ খানিকক্ষণ ছিলেন আমাদের বাড়িতে। এত রাতে চা-ও খেয়েছিলেন এক কাপ। জানা গেল, ছিঁচকে চোরের দলটি শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়, একই চিরকুট আরও বেশ কয়েকটি বাড়িতে পাঠিয়েছিল। পুলিশ গোপন সূত্র থেকে জানতে পেরে আজ সন্ধেবেলায় সবক'টাকে পাকড়াও করেছে। এখন তারা লকআপে। যাওয়ার সময় মেজোবাবু এও বলে গেলেন, "যে দিগ্‌গজকে দিয়ে এই চিরকুট লেখানো হয়েছে, তাকেও খোঁজা হচ্ছে। ধরতে পারলে একটা ব্যাকরণ বই কিনে দেওয়া হবে। ব্যাটা 'পয়সা' বানানও ভুল লেখে!"

দিদিভাইকে দেখলাম, এখনও হাল ছাড়েনি। সেই কাগজের টুকরোটি নিয়ে বেশ ভাল রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে বের করবেই।

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

সম্মোহন করে অপারেশন

অ্যানাস্থেসিয়া না করেই জটিল কোনও অপারেশন করছেন সার্জেন! কল্পনা করতে একটু কষ্ট হয় বইকি! কিন্তু ইতিমধ্যেই এই অসাধ্যসাধন করেছেন পৃথিবীবিখ্যাত হিপনোটিস্ট জন বাটলার। অপারেশনের সময় রোগীকে সম্মোহন করলেন তিনি। গভীর সম্মোহনে আচ্ছন্ন থেকে রোগী জানতেই পারল না যে, সার্জেনরা ছুরি-কাঁচি চালাচ্ছেন তার শরীরে। ৪৫ মিনিটের ওই অপারেশনের সময় ছিলেন মাত্র দু'জন, কেন্ট-এর প্রিন্সেস রয়াল হসপিটাল-এর কনসালট্যান্ট সার্জেন টম হেনিগান আর ওই হিপনোটিস্ট ভদ্রলোক। তাঁর সম্মোহনের প্রভাবে অপারেশনের সময় ব্যথা বা যন্ত্রণার কোনও অনুভূতিই ছিল না রোগীর শরীরে। পুরো অপারেশনটা টিভিতে দেখানোও হয়েছে। জন বাটলারের কথায়, অপারেশনের আগে আমি রোগীকে কিছু সাজেশন দিই। যার ফলে ওই রোগীর দেহে কোনওরকম অনুভূতিই থাকে না। সম্মোহনের মাধ্যমে অপারেশনকে জনপ্রিয় করতে চাইছেন জন। তাঁর ইচ্ছে, ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখানো যে, অপারেশনের সময় সম্মোহন কতটা কার্যকর!

জাপানের নতুন রোবট 'আই টি আর'

জাপানের 'স্পিসি' কোম্পানির রোবট বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছেন আশ্চর্য এক রোবট। নাম দিয়েছেন, আই টি আর। হিউম্যানয়েড এই রোবটটির গুণের কথা শুনলে অবাক না হয়ে থাকা যাবে না। আমরা যেমন ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন বিষয় ডাউনলোড করি, আই টি আরও নাকি ডাউনলোড করতে পারে বিভিন্ন খবর, তথ্য, কুইজ ও নানা প্রোগ্রাম। সম্প্রতি টোকিওর একটি প্রেস কনফারেন্সে আইটিআর দেখিয়েছে তার কেরামতি। আই টি আর-এর ওজন দেড় কেজি, আর লম্বায় ৩৩ সেন্টিমিটার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, স্পিসির একজন কর্মকর্তা তোমোয়াকি কাসুগার হাতে আই টি আর-কে।

জয় সেনগুপ্ত

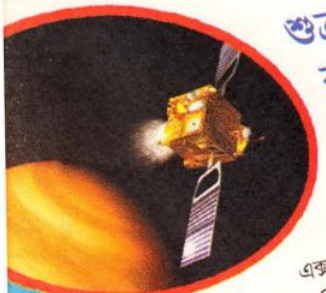

শুক্র গ্রহের রহস্য সন্ধানে

শুক্র গ্রহের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে 'ভেনাস এক্সপ্রেস প্রোব' (পাশে শিল্পীর কল্পনায় আঁকা ছবি)। একটানা পাঁচ মাস মহাকাশে ছুটে বেড়িয়ে অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছোল সে। নিঃসঙ্গ এই যাত্রাপথের সাক্ষী ছিলেন 'ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি'র বিজ্ঞানীরা। প্রায় ৫০০ দিন শুক্রের কক্ষপথে ঘুরে বেড়াবে স্পেস প্রোবটি। গবেষণা চালাবে শুক্রের বায়ুমণ্ডল নিয়ে। এই অভিযান থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন শুক্র গ্রহের না-জানা অনেক তথ্য। পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়েও অনেক নতুন খবর জানাবে এই স্পেস প্রোব।

ওয়েবসাইট-এর সাহায্যে ছুঁয়ে ফেলা যাবে মহাকাশ

সদ্য আবিষ্কৃত হওয়া দু'টো ছোট্ট গ্রহের নামকরণ হল দুই ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর নামে। শরণ্যা আর সেন্থালি। দু'জনেই পড়ে কোয়েম্বাত্তুরের অভিলা কনভেন্ট স্কুলে। হাজার-হাজার আলোকবর্ষ দূরের তারাদের নিয়ে যাদের আগ্রহ, সেই সব পড়ুয়াদের সামনে এসে গেল এক অভাবনীয় সুযোগ। নাসার বিজ্ঞানী ডঃ অমিতাভ ঘোষের উদ্যোগে ভারতে মহাকাশ গবেষণায় আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি হল নতুন ওয়েবসাইট www.tharsisindia.com । মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থার্সিসের নামে নামকরণ করা হয়েছে ওয়েবসাইটটির। ডঃ স্টিভ রাফ, ডঃ জেম্‌স রাইস, ডঃ অনুরাধা গুহ নিয়োগির মতো প্রথম সারির মহাকাশবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরাসরি ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে এই ওয়েবসাইটটির সাহায্যে। সঙ্গে রয়েছে মজাদার সব খেলা। এখানে রয়েছে বিভিন্ন মহাকাশযানের ডিজাইন, যেগুলো দেখে বাড়িতেই ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করে ফেলবে মহাকাশযানের মডেল। আছে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর একগুচ্ছ প্রশ্নাবলিও। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কারও কোনও জোরালো বক্তব্য থাকলে তা পৌঁছে দেওয়া হবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদের কাছে। রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও।

অভিজিৎ সুকুল

অমিল খোঁজো

তফাত বোঝো

উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে একজন নামী ওস্তাদের কাছে গেলেন তপনবাবু। "গান শেখাতে কত টাকা নেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন তপনবাবু।

ওস্তাদ বললেন, "প্রথম মাসে চারশো টাকা নিই, পরের মাস থেকে একশো টাকা করে।"

"তা হলে দ্বিতীয় মাস থেকেই শিখব আমি," বললেন তপনবাবু।

খুব জোর একটা আওয়াজ হতে তাতাইয়ের মা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আওয়াজ কিসের তাতাই?"

"আমার জামা আর প্যান্টটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে," গম্ভীর হয়ে বলল তাতাই।

"জামা-প্যান্ট মাটিতে পড়লে এত জোর আওয়াজ হয়?" আশ্চর্য হলেন তাতাইয়ের মা।

"আসলে জামা-প্যান্টের ভিতর আমি ছিলাম যে," তাতাইয়ের উত্তর।

নাসিরুদ্দিনের বাড়িতে এক আত্মীয় এসেছেন বেড়াতে। নাসিরুদ্দিন বললেন, "চলো, আমার বন্ধুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

আত্মীয়টি বললেন, "এই সাধারণ পোশাক পরে কোথাও যাওয়া যাবে না।"

নাসিরুদ্দিন তখন তাঁকে একটি জমকালো পোশাক দিলেন। এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললেন, "ইনি আমার আত্মীয়। এঁর পোশাকটা কিন্তু আসলে আমার।" বাইরে বেরিয়ে আত্মীয়টি বললেন, "পোশাকটি যে তোমার, সেটা কি না বললেই হত না?"

পরের বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন গৃহকর্তার সঙ্গে আত্মীয়র পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি যে পোশাকটা পরেছেন, সেটা কিন্তু ওঁর নিজেরই।"

আত্মীয়টি বললেন, "মিথ্যে কথা বললে কেন তুমি?"

"তুমি যেমন চেয়েছিলে, তেমনই তো বললাম।"

"পোশাকের কথাটা সবাইকে বলার দরকারটা কী?"

আর-এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললেন, "আমার এই আত্মীয় বহু দিন পর আমাদের বাড়ি এলেন। কিন্তু ইনি যে পোশাকটা পরেছেন, সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না।"

অর্থ শেখো

শব্দের অর্থ জানার আনন্দ, অচেনাকে জানার আনন্দের মতো। শব্দের অর্থ জানার মধ্যে একটা অদ্ভুত কৌতূহল আছে। নীচের শব্দগুলো আমাদের অপরিচিত নয়। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটা ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে।

অশন: (১) ব্রত বিশেষ। (২) আহার। (৩) কুশাসন। (৪) শাসনহীন।

ভূধর: (১) ভূখণ্ড। (২) ভূতল। (৩) পৃথিবী। (৪) পর্বত।

উষ্ণীষ: (১) তরোয়াল। (২) পাগড়ি। (৩) শিরোভূষণ। (৪) কোমরের ছোড়া।

শ্রীনাথ: (১) কৃষ্ণ। (২) শ্রীমন্ত। (৩) শ্রীফল। (৪) শ্রীবৃদ্ধি।

কপোতবৃত্তি: (১) বকবকম শব্দ করা। (২) কপোতের মতো সঞ্চয়হীন জীবিকা। (৩) শূন্যে বা মাটিতে ডিগবাজি খাওয়া। (৪) ধুলোয় লুটোপুটি খাওয়া।

গত সংখ্যার উত্তর

গো-বেড়েন: (৩) গোরুকে প্রচণ্ড ঠেঙানো। যেমন, 'শুধু এসেছেন নয়, গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে।' (বনফুল)

অলিন্দ: (২) বারান্দা। যেমন, 'বন্দি শাহজাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে ওই তাজমহলের দিকে চেয়ে থাকতেন।' (বনফুল)

ভৈরবী: (১) সঙ্গীতের ভোরের রাগিণী। 'তুমি ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই প্রভাতে।' (রবীন্দ্রনাথ)

মৃগেন্দ্র: (৩) সিংহ। 'মৃগেন্দ্র-বিক্রমে আজি বিচরিবে অজা?' মৃগ শব্দের এক অর্থ পশু, তাই মৃগেন্দ্র অর্থ পশুরাজ সিংহ।

ঈশান কোণ: দক্ষিণ-পূর্ব কোণ। যেমন, 'ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে।' (বাংলা ছড়া)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) চোরের মাথার টুপির ডিজ়াইন আলাদা। (২) চোরের হাতের চুড়ির সংখ্যা কম। (৩) চোরের প্যান্ট হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। (৪) পুলিশের লাঠির সাইজ় ছোট। (৫) পুলিশের টুপির ডিজ়াইন পালটে গিয়েছে। (৬) পুলিশের মোজার রং আলাদা। (৭) পুলিশের জামার বোতাম দেখা যাচ্ছে না। (৮) পিছনের গাছটি আয়তনে ছোট।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) এক বিখ্যাত কবির নাম। (৩) সুখ্যাতি। (৫) এ নাকি সন্দেশ খায় না। (৬) চড়কপুজোর সময় শিবের পুজো উপলক্ষ্যে নাচগান ইত্যাদি। (৭) মহাযুদ্ধ। (৮) বড় শহর। (১০) লজ্জা পেয়ে কুণ্ঠিত হয় এমন। (১২) রাবণ। (১৪) লক্ষ্য। (১৫) দয়া, কাতর। (১৭) সঙ্গীহীন। (১৯) সুন্দর। (২১) যিনি রসিকতা বা কৌতুক বোঝেন। (২২) যার দয়ামায়া আছে। (২৩) পড়ে গিয়েছে বা অধঃপাতে গিয়েছে এমন। (২৪) শেষ অবস্থা বা ফলাফল।

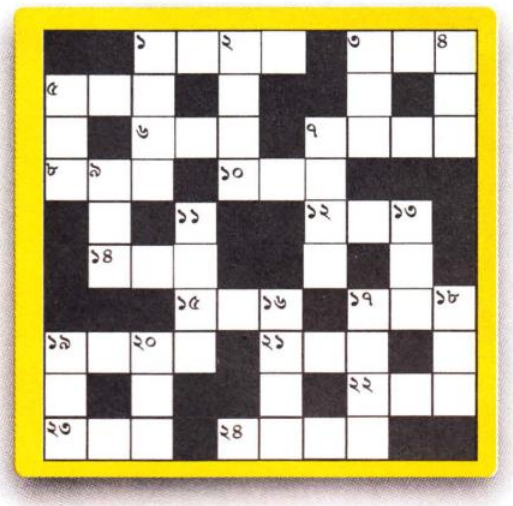

সংকেত: উপর-নীচ

(১) জেলখানা। (২) বনের আগুন যা অরণ্য ধ্বংস করে। (৩) প্রতিবিধান, সুবিধেজনক উপায়। (৪) মৃত্যু। (৫) অপরিচ্ছন্ন, ময়লা। (৭) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। (৯) গভীর, দুর্গম। (১১) সব সময়, সর্বদা। (১৩) খরগোশ। (১৬) প্রয়োজনীয়। (১৭) একেবারেই, মোটেই। (১৮) কৃষকের জমি চাষের যন্ত্রবিশেষ। (১৯) প্যান্ডেল, নাটমন্দির। (২০) যা রচনা বা সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেবসেনাপতি

গত সংখ্যার সমাধান

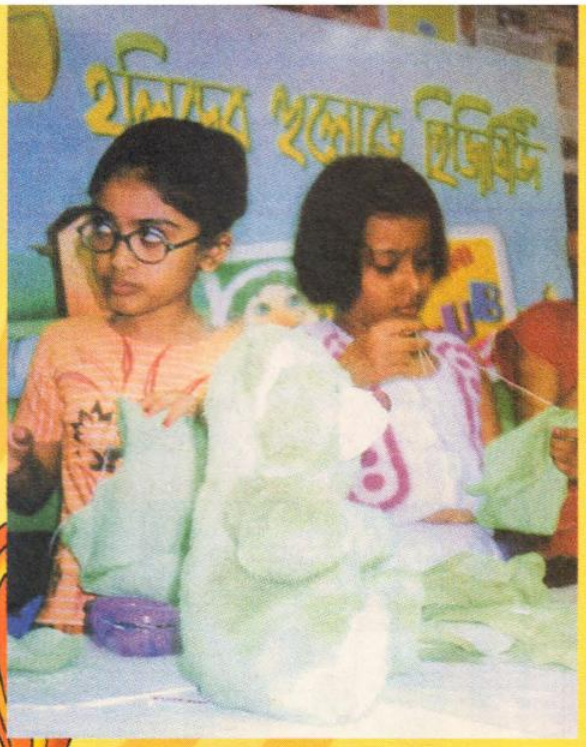

মাস্ক মেকিং, গ্লাস পেন্টিং, ডল মেকিং ইত্যাদির মতো মজাদার ওয়র্কশপ গত বছর ছিল। এবারেও থাকবে ম্যাজিক ওয়ার্কশপ, পেপার কাটিং, যোগা এবং ক্লে অথবা প্লাসটোসিন মডেলিং। থাকছে নতুন নতুন বন্ধু পাওয়ার সুযোগ। আনন্দ আর নতুন কিছু শেখা, দুই-ই জমবে ভারী!

আনন্দমেলা ক্লাব মেম্বারদের জন্য পুরো ফ্রি। যারা মেম্বার নও, আসতে পার তারাও। আর মা-বাবার জন্যও রইল ফেলে আসা ছেলেবেলার গন্ধ।

গতবার যারা মিস করেছ কিংবা যারা মেতেছিলে হুল্লোড়ে, তারা সকলেই এই হট্টমেলায় আসতে ভুলো না কিন্তু!

হুটোপাটি, হইচই, গেছোদাদা গেল কই?

বাজল ছুটির ঘণ্টা! তেড়েফুঁড়ে হুটোপাটি করার এই তো সময়। তোমাদের মতো খুদে জিনিয়াসদের জবরদস্ত মজায় মাতিয়ে তুলতে এসে গেল আনন্দমেলা সামার অ্যাক্টিভিটি ক্যাম্প।

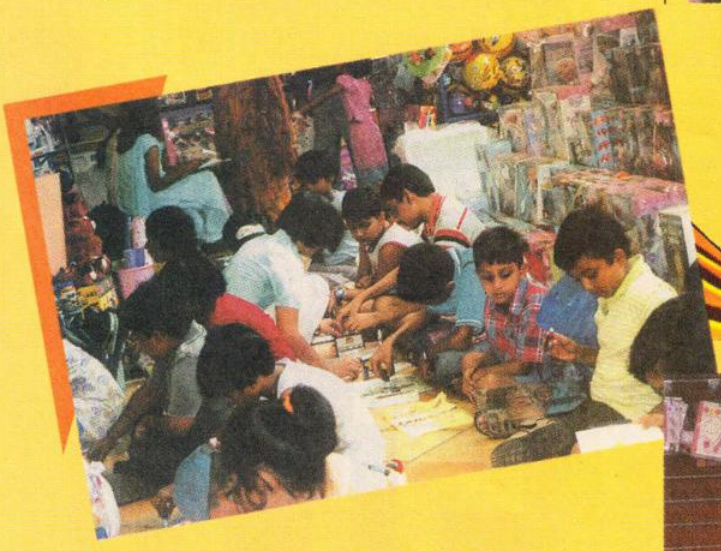

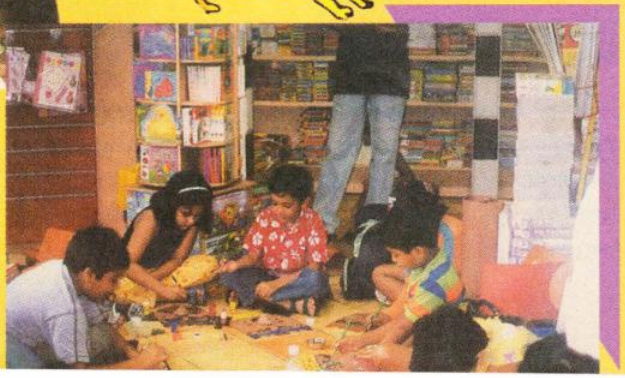

আনন্দমেলা

দেদার দস্যিপনা, জমাটি মজা।

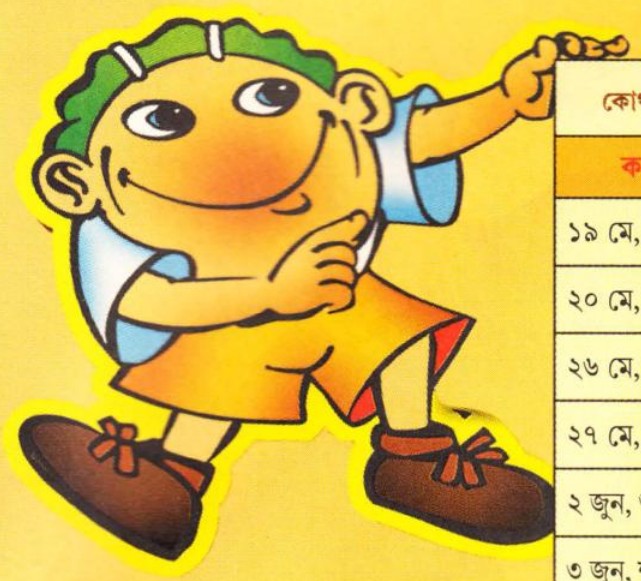

এবছরের মজাদার ওয়ার্কশপ :

কোথায় :	ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লস্, ১৬৪ শরৎ বোস রোড, কোলকাতা-৭০০০২৯ (দেশপ্রিয় পার্কের কাছে)	
কবে	কী	কখন
১৯ মে, শুক্রবার	ক্রাফ্‌ট (অরিগামি ইত্যাদি)	১১ - ১২.৩০
২০ মে, শনিবার	ক্রাফ্‌ট (অরিগামি ইত্যাদি)	১১ - ১২.৩০
২৬ মে, শুক্রবার	যোগ ওয়ার্কশপ	১১ - ১২.৩০
২৭ মে, শনিবার	ম্যাজিক ওয়ার্কশপ	১১ - ১২.৩০
২ জুন, শুক্রবার	ক্লে, প্লাসটোসিন, মডেলিং	১১ - ১২.৩০
৩ জুন, শনিবার	ক্লে, প্লাসটোসিন, মডেলিং	১১ - ১২.৩০

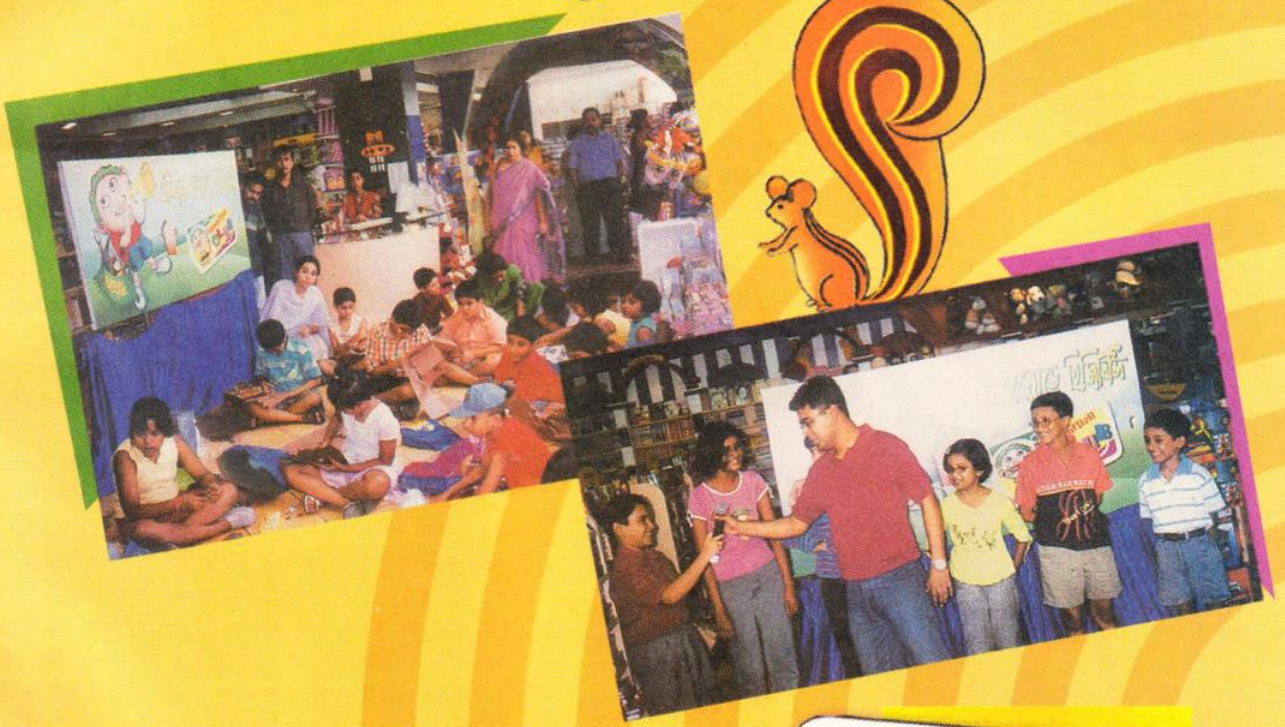

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করো
anandamelaclub@yahoo.co.in
অথবা ফোন করো : **(033) 2454-6212**
অথবা **98305 19165**

আনন্দমেলা CLUB
হিজিবিজি
"ছুটি-ছুটি"

দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান, গল্‌ফার জীব মিলখা সিংহের ঝুলিতে এবার নামী খেতাব। লিখেছেন **পরমা সেন**

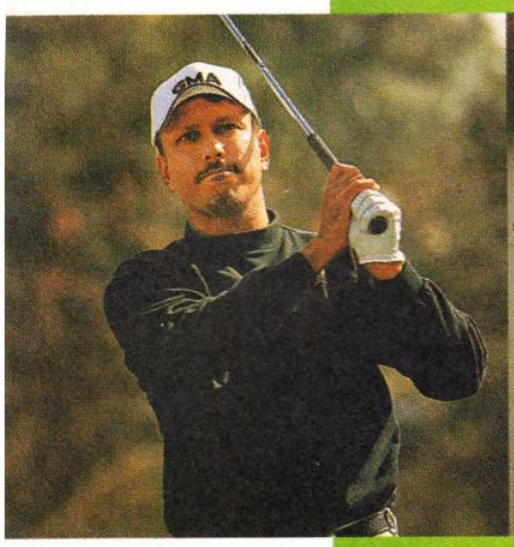

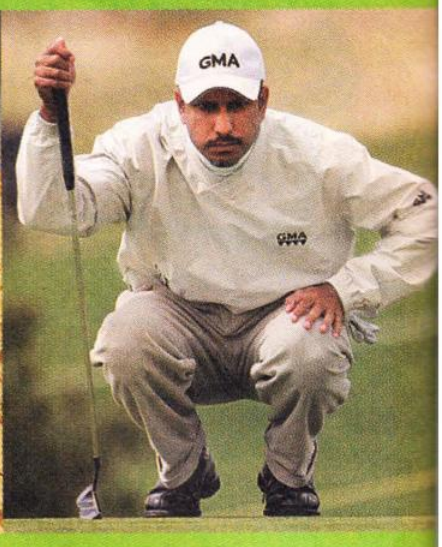

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০০ জনের মধ্যে

গ ল্ ফ

অ্যাথলিট মিলখা সিংহ অবসর সময় কাটাতেন গল্‌ফ খেলে। ছেলে জীবকে নিয়ে চণ্ডীগড়ের বাড়ির কাছাকাছি গল্‌ফ কোর্সে যেতেন তিনি। জীব তখন বাবার 'ক্যাডি' হত। কিন্তু বাবার সঙ্গে থাকতে-থাকতে ভারতে গল্‌ফের মতো কম প্রচলিত একটা মন্থর খেলাকে ভালবেসে ফেলে সে। আর পরে বড় হয়ে বাবার মতো অ্যাথলিট না হয়ে গল্‌ফ খেলাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেয় জীব। ভাগ্যিস! নইলে জ্যোতি রণধাওয়া, অর্জুন অটওয়ালদের নামের পাশে জীব মিলখা সিংহের নামটা জ্বলজ্বল করত কী করে?

'উড়ন্ত শিখ'-এর ছেলে অ্যাথলিট হল না, ট্র্যাকে নেমে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে পদক তুলে আনল না, মিলখা সিংহ রেগে যাননি? "বাবা চিরদিন আমার পছন্দটাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যখন উনি জানতে পারলেন যে, আমি গল্‌ফ খেলতে চাই, তখন একটুও রাগ করেননি। শুধু বলেছিলেন, এই খেলাতেও আমাকে এক নম্বর হতে হবে!" বলেছেন জীব। মাত্র ১৩ বছর বয়সে প্রথম খেতাবটি তাঁর ঝুলিতে ঢোকে। যদিও সেটা অপেশাদার টুর্নামেন্ট ছিল। তাঁর পেশাদার কেরিয়ারের শুরু হয় ১৯৯৩ সাল থেকে। গোড়ার দিকে বেশ তরতরিয়ে উপরে উঠছিলেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইউরোপিয়ান সার্কিটে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালের পর থেকে কিছুদিন তাঁর কেরিয়ারে একটা ব্যাড প্যাচ এসেছিল। চোট-আঘাতেও বেশ কিছুদিন ভুগেছিলেন। অবশ্য তা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশিদিন সময়ও নেননি জীব। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে শুরুটা ভাল করেও শেষ রক্ষা হচ্ছিল না। খেতাব প্রায় হাতের মুঠোয় এসেও ফস্‌কে যাচ্ছিল। সমালোচকরা বলতেও শুরু করেছিলেন যে, জীব ফুরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে সম্প্রতি ভলভো চায়না ওপেন জিতে নিয়েছেন তিনি। এই টুর্নামেন্ট জেতার ফলে তাঁর র‍্যাঙ্কিং বিশ্বের প্রথম ২০০ জনের মধ্যে চলে এসেছে।

গল্‌ফ খেলা দেখতে যতটা সহজ, খেলতে ঠিক ততটাই কঠিন। প্রচণ্ড মনঃসংযোগের দরকার হয়। নিয়মিত যোগব্যায়াম করে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কাজটা আয়ত্তে নিয়ে আসেন জীব। ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলোর পরিবেশে বড় হওয়ার জন্য স্পোর্টসম্যান স্পিরিট তাঁর মধ্যে গোড়া থেকেই ভরপুর। আস্তে-আস্তে নিজের পিক ফর্মেও পৌঁছচ্ছেন জীব। তাঁর লক্ষ্য, ব্রিটিশ ওপেন এবং ইউ এস মাস্টার্স টুর্নামেন্টে ভাল ফল করা। "মিলখা সিংহের ছেলে হিসেবে নয়, আমি চাই, দুনিয়ার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ আমাকে ভারতের সেরা গল্‌ফার হিসেবে চিনুক।" এমনটাই চান জীব মিলখা সিংহ।

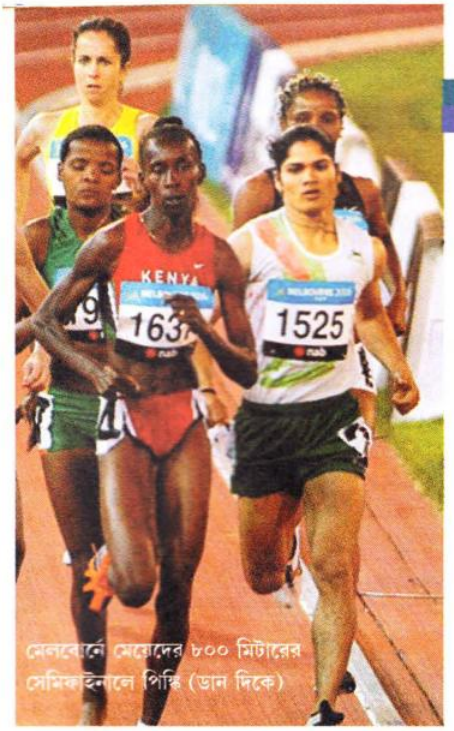

অ্যা থ লে টি ক্স

মেলবোর্নে মেয়েদের ৮০০ মিটারের সেমিফাইনালে পিঙ্কি (ডান দিকে)

সোনা জয়ের স্বপ্নে পিঙ্কি

কমনওয়েলথ গেমসে অ্যাথলেটিক্সে ৪x৪০০ মিটার রিলে রেসে রুপো জিতে শিরোনামে উঠে এসেছেন ১৯ বছরের পিঙ্কি প্রামাণিক। এ-সাফল্যে পুরুলিয়ার তিলকডি এখন বিখ্যাত গ্রাম। আপচারিতায় ধরা দিলেন এক আত্মবিশ্বাসী পিঙ্কি।

কমনওয়েলথ গেম্‌স থেকে অ্যাথলেটিক্সে বাংলার হয়ে প্রথম পদকটি জিতে এনে কেমন লাগছে?

দারুণ। কত মানুষের ভালবাসা পাচ্ছি। বাড়ি ফিরতেই দেখি অনেক মানুষ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে সুইসা স্টেশনে রাত তিনটে থেকে অপেক্ষা করছেন।

পারফরম্যান্স কি আরও ভাল হতে পারত?

সম্ভাবনা ছিল। সোনাজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলটির সঙ্গে আমাদের সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ০.২ সেকেন্ড। শেষ ল্যাপে ছিলাম আমি।

রুপো জয়ের পর বাড়ির কথা মনে পড়েনি?

পড়েনি আবার! আমরা পাঁচ বোন। আমি তৃতীয়। বাবা গাড়ি চালান। দাদা চাষের কাজ করেন। টানাটানির সংসার। সকলের উৎসাহেই তো পদক আনতে পেরেছি।

অ্যাথলিট হয়ে উঠলেন কীভাবে?

ছেলেবেলা থেকেই দৌড়তে ভালবাসতাম। স্কুলে পড়ার সময় কোথাও দৌড় প্রতিযোগিতার খবর পেলেই চলে যেতাম। পুরস্কার জিতে আনতাম। সেভাবে প্রাণের আনন্দে দৌড়তে দৌড়তেই অ্যাথলিট হয়ে উঠেছি।

প্রথম নজর কাড়া সাফল্য এল কবে?

বছর তিনেক আগে কলকাতায় এসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের রাজ্য মিটে নেমে একশো, দু'শো এবং চারশো মিটার দৌড়ে সোনা জিতে প্রথম নজর কেড়ে নিয়েছিলাম।

আসন্ন দোহা এশিয়াডে আপনার ব্যক্তিগত পদক জয়ের সম্ভাবনা কতটা?

মেলবোর্নে ৮০০ মিটারে জীবনের সেরা সময় (২ মিনিট ৩ সেকেন্ড) করেও সেমিফাইনালের বেশি এগোতে পারিনি। তবে এশিয়া স্তরের সেরা চিনা প্রতিযোগীর ঠিক পিছনেই রয়েছি। দোহায় তাই সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছি।

নিজেকে কীভাবে তৈরি করছেন?

জাতীয় ক্যাম্পে কোচ রেণু কোহেলির কাছে অনুশীলন করছি। দোষ, ত্রুটিগুলো শুধরে নিয়ে সময়টাকে আরও কমিয়ে আনার জন্য পরিশ্রম করছি।

বিদেশে ট্রেনিং নিতে যেতে চান না?

চাই তো। কিন্তু টাকা কোথায়? ভাল স্পনসরশিপ পেলে এশিয়াডের আগে দু' মাস ইংল্যান্ড থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতাম। জানিনা তেমন সুযোগ হবে কিনা!

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন চন্দন রুদ্র

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় থাকুক বা না-ই থাকুক, পরীক্ষায় বাংলায় ভালো নম্বর পেতে হলে পড়তেই হবে

বামনদেব চক্রবর্তীর বইগুলো

১। ভাষাশিক্ষায় হাতেখড়ি (V) – ব্যাকরণ ও নির্মিতি
২। অঙ্কুরে ব্যাকরণ ও রচনা (VI)
৩। বাণী-বিচিত্রা (VII-VIII) – ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০০৬ সংস্করণে নতুন সংযোজিত ১৭টি প্রবন্ধ সহ)
৪। ছাত্রবোধ বাংলা ব্যাকরণ (IX - X)
৫। ছাত্রবোধ বাণী - বিচিত্রা (IX - X) – নির্মিতি (নব-সংযোজিত ১৩টি প্রবন্ধসহ – ২০০৬ সংস্করণ)
৬। উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ (IX - X) – সম্পূর্ণ ব্যাকরণ
৭। মাধ্যমিক বাণী - বিচিত্রা (IX - X) – পূর্ণাঙ্গ নির্মিতি
৮। ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ 'ক' ভাষা (XI - XII)
৯। ব্যবহারিক বাংলা ব্যাকরণ 'খ' ভাষা (XI - XII)
১০। উচ্চ-মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রতিটি বই-ই পাওয়া যাচ্ছে

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২০০৪-এর পাঠ্যসূচী অনুসারে সুলিখিত এবং অনুমোদিত – বাংলা বিষয়ে

শ্রীমতী কেয়া রায়চৌধুরীর বইগুলো

১। সাহিত্য-মালঞ্চ (VI) পাঠ্যগ্রন্থ
২। সাহিত্য-মালঞ্চ (VII) পাঠ্যগ্রন্থ
৩। সাহিত্য-মালঞ্চ (VIII) পাঠ্যগ্রন্থ
৪। ভাষা-মালঞ্চ (VI) ব্যাকরণ ও নির্মিতি
৫। ভাষা-মালঞ্চ (VIII) ব্যাকরণ ও নির্মিতি
৬। মালঞ্চ-সংকলন (VI) সহায়কপাঠ
৭। মালঞ্চ-সংকলন (VII) সহায়কপাঠ
৮। মালঞ্চ-সংকলন (VIII) সহায়কপাঠ

গণিতে গৃহশিক্ষকের অভাব মেটাতে প্রয়োজন

কুঙ্কুম চক্রবর্তীর

গণিত - মালঞ্চ (অবজেকটিভ - IX - X)

বাংলা ভাষায় একখণ্ডে ক্যুইজের বৃহত্তম সংকলন

ক্যুইজ ১১১১১ (দাম ১৬০)

বিভিন্ন বিষয়ে ১১১১১ টি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের চমৎকার সম্ভার, অজস্র ছবিসহ বোর্ড বাঁধাই

অক্ষয় মালঞ্চ

বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা - ৭

দূরভাষ – ৫৫১০ - ৭৩৩০

মাধ্যমিকে অঙ্কে লেটার মার্কস পেতে এই বই অবশ্যই পড়তে হবে

নবম-দশম

গণিত

অমিতাভ মিত্র

১৪০/-

এখন ইংরাজীতেও পাওয়া যাচ্ছে

SCHOOL MATHEMATICS

AMITAVA MITRA

140/-

New Book Syndicate

90/3A Mahatma Gandhi Road, Kolkata 700 007

35 College Street, Kolkata 700 073

Phones : 2257 0754 • 2350 3881 • 2241 0922 • 3291 0743

পড়াশোনায় ভালো হতে হলে এবং পরীক্ষায় ভালো করতে হলে-র পর ড. রাধা নাগ-এর আরও একটি মুস্কিল আসান—

পড়া মনে রাখতে হলে

বোর্ড বাঁধাই, মূল্য : ৪৫ টাকা

পড়া-লেখা সংক্রান্ত সমস্যার উত্তর পেতে নীচের ঠিকানায় লেখ :

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

৯৩এ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩

ফোন : ২২৪৪৫৯২৪, ২২২৭২৩৩৬ • ই-মেল : iph@vsnl.net

KoroK

দাবার 'এভারেস্টে' বিশ্বনাথন আনন্দ

২০০০-র এলো রেটিং পেরিয়ে দাবা বিশ্বের এভারেস্টে উঠে পড়লেন বিশ্বনাথন আনন্দে। তিনিই প্রথম দাবাড়ু যিনি কোরাস সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার দাবায় পঞ্চমবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির গড়েছেন। ২০০০ সালকে দাবার 'এভারেস্ট' বলা হয়। আনন্দ ও তোপালভ ছাড়া দাবার ইতিহাসে এর আগে মাত্র দু'জন দাবাড়ু এই উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। ১৯৯০ সালে গ্যারি কাসপারভ এবং ২০০১ সালে ক্রামনিক। ২৮৫১ রেটিং করে গত বছরই অবসর নিয়েছেন কাসপারভ।

টেবল টেনিস আকাদেমি

সদ্য কমনওয়েলথ গেমস্ থেকে সোনা এবং ব্রোঞ্জ জিতে আনা ভারতীয় দলের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় শুভজিৎ সাহা, সৌম্যদীপ রায়, শিবাজি দত্ত, মৌমা দাস, পৌলমী ঘটক, নন্দিতা সাহাদের সংবর্ধনা দিল পশ্চিমবঙ্গ টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। ভবিষ্যতে শুভজিৎ, মৌমাদের মতো খেলোয়াড় যাতে গড়ে তোলা যায়, তাই এবার কলকাতায় একটি জাতীয় টেবল টেনিস আকাদেমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সংস্থা। সংস্থার সভাপতি প্রবীর মিত্র জানালেন যে, রবীন্দ্র সরোবর অঞ্চলে এক একর জমির জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছি। খেলোয়াড়দের মান উন্নয়নের জন্য বিদেশি কোচ, উন্নত ক্রীড়া বিজ্ঞান, যোগ সেন্টার, জিম, অডিটোরিয়াম সবই থাকবে প্রস্তাবিত এই আকাদেমিতে। জেলার স্কুলে-স্কুলে গিয়ে টেবল টেনিস শেখাবেন আকাদেমির কোচরা। এই প্রথম আগামী ২১ জুন থেকে ২৫ জুন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বসবে বিশ্ব জুনিয়র টেবল টেনিসের আসর।

মৌমা দাস

পৌলমী ঘটক

শুভজিৎ সাহা

ব্যবসায়ী বেকহ্যাম

বাড়ি কেনায় অর্থ লগ্নি করে বিশ্বকাপ ফুটবল শুরুর মুখেই দারুণ লাভের মুখ দেখেছেন ডেভিড বেকহ্যাম। ২০০২ বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড দল অনুশীলনের জন্য দুবাইয়ের সি-বিচকে বেছে নিয়েছে। ওই সময় সেখানে সমুদ্রের কোলেই ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে ওঠার খবর পেয়ে ছ'লক্ষ পাউন্ড খরচ করে একটি ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন তিনি। চার বছর আগে নির্মাণপর্বের প্রাথমিক স্তরে থাকা সেই ফ্ল্যাট এখন 'ভিলা' নামের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। সাতটি অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে আবার বেকহ্যামেরটিই সবচেয়ে সুন্দর। বোটে চড়ে সেখানে যেতে হয়। দাম ছয় থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ লক্ষ পাউন্ড। প্রখ্যাত ফর্মুলা ওয়ান কার ড্রাইভার মাইকেল শুমাখারের এখানে অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ফুটবল বুদ্ধির মতো ব্যবসায়িক বুদ্ধিতেও অনেককে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বেকহ্যাম।

শতাব্দী প্রাচীন বেটন কাপ

প্রয়াত টি ডি বেটনের দেওয়া ট্রফি নিয়ে ১৮৯৫ সালে কলকাতায় শুরু হয়েছিল আজকের শতাব্দী প্রাচীন এই হকি প্রতিযোগিতা। ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে বেটন কাপের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ থেকে শুরু করে আজকের ধনরাজ পিল্লাই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন জলন্ধরের বি এস এফ —কে হারিয়ে এবারের ১১১ তম বেটন কাপ জিতে নিল পঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক। চ্যাম্পিয়ন দল পেল ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। রানার্স বি এস এফ পেল ৫০ হাজার টাকা।

লারার চোখে স্বপ্ন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে আবার বিশ্ব ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তুলে আনার স্বপ্ন দেখছেন ব্রায়ান চার্লস লারা। একটি টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে ভারতে এসেছিলেন 'লিটিল প্রিন্স'। ডিজাইনার দীপিকা গেহানির সঙ্গে নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া ফ্যাশন উইক-এর র‍্যাম্পেও হাঁটতে দেখা গেল তাঁকে। এবার নিজের দেশে বিশ্বকাপ খেলার জন্য যে-কোনও আত্মত্যাগে প্রস্তুত তিনি। রাহুল, যুবরাজদের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে ভাল ক্রিকেট খেলতে চান লারা। লক্ষ্য, ঘরের মাঠে সিরিজ জয়।

চন্দন রুদ্র

ভাইবস্™

স্লিমিং আর বিউটি ক্লিনিকের শেষ কথা

স্লিমিং প্যাকেজ

• ওয়েট লস প্রোগ্রাম • মেইনটেনান্স প্রোগ্রাম • বডি টোনিং এবং ফার্মিং
• বডি কন্ট্যুরিং • বডি থেরাপিগুলি • বডি ডিটক্সিফিকেশন
• স্ট্রেচ মার্ক হাল্কা করা হয়

বিউটি প্যাকেজ

• ***ইয়ুথ ভাইবস্*** : অ্যান্টি রিংকল • ***ক্লিয়ার ভাইবস্*** : অ্যান্টি ট্যান
• ***হিলীং ভাইবস্*** : অ্যান্টি অ্যাকণে • ***ফ্রেস ভাইবস্*** : ডাল এবং ডিহাইড্রেট হওয়া ত্বক • ***ফেয়ার ভাইবস্*** : স্কিন লাইটেনিং ট্রীটমেন্ট
• ***মিস্টিক ভাইবস্*** : ডি-স্ট্রেস এবং রিল্যাক্স

হেয়ার ট্রীটমেন্ট প্যাকেজ

• ***শাইনিং সিল্ক*** : নিষ্প্রাণ চুলের জন্য ডীপ কন্ডিশনিং
• ***ক্লিয়ার সিল্ক*** : অ্যান্টি-ড্যানড্রফ • ***সফ্‌ট সিল্ক*** : নিষ্প্রাণ চুলের জন্য
• ***স্ট্রং সিল্ক*** : চুল বৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটায় এবং চুল ওঠা বন্ধ করে
• হেয়ার এক্সটেনশন

পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিউটি সেলুন

লেজার হেয়ার রিমুভ্যাল ট্রীটমেন্ট
বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা করানো হয় সারাজীবনের গ্যারান্টী সহ।

AN ALANKAR GROUP ENTERPRISE

Open all 7 days.

Vibes Centres:
Theatre Road: 47-A, Theatre Road, Kolkata - 700017 (Opposite Kala Mandir).
Ph: 033-22809221, 22809222, 22810976, Fax - 033-22812120.
Alipore: 5 - B, Judges Court Road, Alipore, Kolkata - 700027. Ph: 033-24488148, 24488158, 24488168.
Phoolbagan: 96, Hem Chandra Naskar Road, Kolkata - 700010. Ph: 033-23631701, 23631702, 23631703.
NEW DELHI - East Delhi: Ph: 011-22426606, 22427777, 22057766, 22460244
South Delhi: Ph: 011-26196606/77, 32621812, 41354812, 9871135956
HYDERABAD - Banjara Hills: Ph: 040-23315954/55, 30978474/75
BANGALORE - Koramangala: Ph: 9945341548, 25536606/12, 25505982
Corporate Office: D-5, Hauz Khas, New Delhi - 16. Tel. : 011-26536606/12, 41656607.
E-mail : corporate@vibes.co.in website : www.vibes.co.in

Vibes™
Look good. Feel good.
An ISO 9001:2000 Certified Company

*Conditions apply. Results may vary from person to person.

• DELHI • KOLKATA (Opening soon in Siliguri) • HYDERABAD • BANGALORE

www.armscommunications.com/1013/04/06

ANANDAMELA MAY 2006 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 INR 15.00
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06

পুশ্ । পাওয়ার । এক্সপ্লোর ।

ওয়ার্কিন' টাউন রেলওয়ে
টা. ২৯৯৯/-

GeoTrax
Rail & Road System

আপনার সোনামণি **জিওট্র্যাক্স™ রেল অ্যাণ্ড রোড সিস্টেম**-এ রোমাঞ্চকর অভিযানের জগত আবিষ্কার করবেই । এর চালনাশক্তি হ'ল কল্পনা আর সহজে ব্যবহারযোগ্য রিমোট কন্ট্রোল-যা ওকে সবকিছু প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে সাহায্য করে (পুরো সাউণ্ড এফেক্টসহ), আর সবটাই ও নিজেনিজে করতে পারে ! এই সিস্টেমে যানবাহনগুলিও কাজ করে রিমোট ছাড়াই-শুধু ট্র্যাকে ঠেলে দিলেই হ'ল । খেলার জন্যে কতরকমের উপায় আছে, কতকিছু করার আছে । যত বেশি সংগ্রহ করবেন, মজাটাও তত বাড়তে থাকবে !

কল্পনার পাখা মেলে-দেওয়া এক জগত !

Fisher-Price
play. laugh. grow.™

www.fisher-price.com

To get the 2006 Fisher-Price® magalog, write in with your name, address, pincode, telephone number and email to:
Fisher-Price® - Mattel Toys (I) Pvt. Ltd: Phoenix house, B wing, 4th floor, Lower Parel, Mumbai-400013.

You can find the entire Fisher-Price® range at: **All leading departmental and toy stores** At Fisher-Price® Flagship Stores: **Shoppers' Stop**: Mumbai **Piramyd:** Mumbai, Ahmedabad **Kemp Fort:** Bangalore **Toy park:** Delhi **Kiddieland:** Delhi **Manoj stores:** Mumbai **Little Kangaroos:** Mumbai **Junior Shoppe:** Mumbai **Odyssey**: Chennai **HunkyDory:** Chennai **Babyshop:** Trivandrum **Styleplus:** Trivandrum **Mum's Mall:** Chandigarh **Eddy's:** Ludhiana **K.K. Toys:** Jaipur **Toys town:** Jodhpur **Nirupam Store:** Bhopal **Toy Corner:** Indore Preferred Fisher-Price® Partners: **Odyssey:** Hyderabad; Coimbatore; Salem; Trichy **Agra:** Toddlers Shoppe **Ahmedabad:** Crossword; Ding Dong, Maruti Toy Land, Femina Town, Kavita Electronics; Shree Kampanwala; Toys World **Amritsar:** Ebony **Bangalore:** Always New; Baby Shoppe; Blue N Pink; Toy World; Toys N Toys; Baby Shop; Kid's & Gifts; Little Boss; Silver Spoon; Vellara Avenue **Baroda:** The Shoppee; For U **Bhubhaneshwar:** Toy Story **Chennai:** Sona Enterprises; Tunic City; Baby Lou; Atrium; Connexions; Toys'R'here **Coimbatore:** Vijay Agency **Cochin:** Paiko; Cherin; Jolly **Chandigarh:** Rama; Kap Kids;Chopra Bros; Budhiraja Stores **Delhi:** Baby Walkers; Big Jo's; Dezine; Kidz Land; Mom's Darling; Smiles; S.M. Allied; Standard's; Toy Fort; Toy Kingdom; Bibs n Cribs; Maya Toys; S.V.Shorie; Gift Palace; Maya Sports **Goa:** Baby Basics; Walkover; Poshak; Baby Needs **Gurgaon:** Maya's **Guwahati:** Sohum Shoppe; Eastrends (Hub) **Hyderabad:** Walden; Shishu; Parul Toys; Toys N Kids Planet; Kids Zone **Indore:** Crossroad; Lifetime; Sadbhavana **Jaipur:** Vishnu Store **Jallandhar:** Kapsons **Kolkata:** Little Johnie; Kidzz; Infant Shoppe; Toy Story; Wonderland Toys **Kota:** Play House **Lucknow:** Cubes; Toy Story **Ludhiana:** Khanna's Toy World; Ebony; Kiddy's; Kids n Moms; **Moga :** Kids Cave **Mumbai:** Big Tom; Kamdhenu; Crossword, Kemps Corner; Comfort-The Kidz Station; Festoons; Amarsons (Bandra); Green Bell; Just Moms; Premsons; Soham Collection; Me n Moms; Roopam; Maru (Vashi); Twinkle; Trios; Well-wisher **Noida:** Toy World; Child Junction **Patiala:** New Bies **Panchkula :** Just 4 Kids **Pune:** Crossword; Toy World; Bonsaii; Greetwell; Maitrik; The World of Toys; Millenium **Rajkot:** Bachpan **Sri Nagar :** Pick N Choose; Always New **Surat:** Sahaj superstore; Dhiral Sons -The Toy Shop; Fashion World **Shillong:** Hallmark Cards & Gift **Vizag:** Mira Collection.

Fisher-Price® also available at all CSD outlets.

Fisher-Price®, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052. USA © 2006 Mattel, Inc. All Rights Reserved.